

(বাতিকা)

756.3
.002/25—



শ্রী অরবিন্দ মন্দির

১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

১ ২৭

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বহিঃক।

(২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২)



756 3
002/25

শ্রীঅরবিন্দ পাঠ্যমন্দির

১৫ বাক্স চাটালি ষ্ট্রট : কলিকাতা—১২

— 15 —

১। চিত্রাবলি ও পুস্তাবলি	শ্রীঅরবিন্দ	১
২। পুস্তির পাঠ্য	শ্রীমলিনীকান্ত ভট্ট	৪
৩। বোগসম্বন্ধ-গ্রন্থ	অমির্বাণ	১৪
৪। যাত্রের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	২৩
৫। মহামানবের লাগরতীরে	সমৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০
৬। কবিগোলাব কাব্য	শ্রীসমীরকান্ত ভট্ট	৩২

বক্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫২ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিংবা কলিকাতা-মাথার ঠিকানায়ে প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. বোগে পাঠানো হয়।

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠ্যনিবন্ধ
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আগ্রন
পত্রিকাগার:

মূল্য—১৪০ টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠ্যনিবন্ধ, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, কলিকাতা—১২
মুদ্রক—শ্রীঅরবিন্দ আনন্দ প্রেস, পত্রিকাগার



২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

আমাদের লক্ষ্য হল অতিমানস সিদ্ধি—সে-জ্ঞান বা সে-উদ্দেশ্যে অবস্থার পর্যায়ক্রমে যখন যেমন প্রয়োজন আমাদের তাই করে যেতে হবে। বর্তমান প্রয়োজন হল শারীর চেতনাকে প্রস্তুত করা—তার জন্মে যে জিনিষ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তা হল স্থূল ও নিম্নপ্রাণে সমতা, শাস্তি আর ব্যক্তিগত কামনা-বাগনা থেকে মুক্ত পূর্ব আত্ম-নিবেদন।

অত্যাশু জিনিষ আসবে তাদের আপন সময়ে। এখন প্রয়োজন শারীর সার্বিককে প্রাধাত্য দেওয়া নয়—এটি হল ঐ অত্যাশু জিনিষের মধ্যে, প্রয়োজন শারীর চেতনায় অন্তঃপুরুষের প্রকাশ, সেখানে তার নিরন্তর স্থিতি ও নির্দেশ।

শ্রীঅরবিন্দ





চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

পূর্ণানুগুণি

ঐজয়বিন্দু

কর্ম

শাস্ত্র বেদে বরং চল, কিন্তু নিজের বেচ্ছা ও বাসনা বেদে নয়। তাহলে জোনাকি বধো হয়েছে যে কুণ্ডিত পশু তাকে দমনে রাখবার সাক্ষ্য জোনাকি বেড়ে যাবে।

শাস্ত্রকে নয় বরং ভগবানকে বেদে চল, তাহলে সকল বিধান, সকল গীতার বহু উদ্দেশ্য যে পরমপদ সেখানে গিয়ে পৌঁছবে তুমি।

★

শাস্ত্র হল বারং বহু, যাদের দৃষ্টি অল্প তাদের জ্ঞান—শাস্ত্র বেদে যদি তারা না চলে তবে পদাঙ্কন হবে তাদের। কিন্তু তুমি ত পেরেছ মুক্তি কৃষ্ণের বধো, তুমি সেপেছ তাঁর জীবন্ত আলো, তুমি চলবে জোনাকি সপার হাত ধরে, শাস্ত্রত বেদের দীপ্যনাকে।

★

বেদান্ত হল ভাগবতপ্রদীপ, জোনাকে বহুবেদে আর অহংএর প্রাতি থেকে বাহিরে নিয়ে আসবার চেষ্টা। কিন্তু বেদের আলো যখন জোনাকি অন্তরায় ফুটে উঠেছে তখন সেই ভাগবতপ্রদীপেরও জোনাকি আর প্রয়োজন নাই। কারণ এখন তুমি দ্বিগুণে বুদ্ধিভাবে চলে যেতে পার, চিরন্তন সূর্যের লোকে।

★

কেবল ভেবে ফল কি? আমি বলছি, কাম কর, দ্বিগুণ লাভ কর—এই উদ্দেশ্যেই ভগবান জোনাকে বাসুদেব তনু বধো পাঠিয়ে দিয়েছেন।

★

কেবল বিভিন্দিত করে ফল কি? আমি বলছি গতির বধো হয়ে ওঠ, এই উদ্দেশ্যেই জোনাকে জড়ের জগতে বাসুদেবের স্থাপন করা হয়েছে।

★

কর্মের পথ হল ভগবানের বে বাগ্‌দ্বয়ী তার বধো সর্বাপেক্ষা কঠিন ধারা কিন্তু তবুও, অন্ততঃ এই স্থূল জগতে, এইটাই কি সব চেয়ে সহজ, সবচেয়ে ব্যাপক, সবচেয়ে সুখকর নয়? কারণ এখানে প্রতি বহুবেদেই আনন্দের কক্ষী ভগবানের সঙ্গে যুক্ত পাই আর এই রকমে তাঁর সহায় দ্বিগুণ লাভ করে তাঁর স্বরূপে গড়ে উঠি।

★

★

কর্মসংগেণ অপ্রকৃৎ হন এই যে, তাতে ভগবানের সঙ্গে শত্রুতাও হয়ে উঠতে পারে মুক্তির উপায়। ভগবান কখন কখন তাঁর কাছে আনাদের কৈনে নেন, ধরে রাখেন সবচেয়ে কিশু যে উপায়ে তা হল আনাদের দুর্ব্বল দুর্ব্বল ঐকান্তিক শত্রু হয়ে।

নৃত্যকে বরণ করে নেবে না কিংবা বীড়ায়ে, তার সঙ্গে লড়াই করবে জয়ী হবে? ভগবান যা চান আনাব মধ্যে, তাই হোক—যদি বা বীড়ি আনি ত রয়েছেই।

নৃত্য তবে বল কাকে? ভগবানের নৃত্য হয়? যে নৃত্যভ্যর্থ: এও ত জীবনই, জোনার কাছে নীলাচ্ছন্দে এসেছে কয়েকটি মাথার প'রে ভীতির সুখোস হয়ে।

সেহগত অমর্য লাভ করবার উপায় আছে এক—নৃত্য যদিই বা হয়, তবে তা আনাদের বেচ্ছাক্রমে, প্রকৃতির স্বাভাবিক নয়। কিন্তু কে একটি জামা প'রে থাকবে একশ বছর ধরে, অথবা একই সজীর্ণ পরিবর্তনহীন কুঁড়ির মধ্যে সুশীর্ণ শাপুত কাল ধরে বসবাস করবে?

ভয় আর দুশ্চিন্তা হল ইচ্ছাশক্তির বিকৃতরূপ। যা তুমি ভয় কর, ক্রমাগত যার চিন্তা কর, সেই একটি ভাবেই উপর নামবার যা দিয়ে তাকে তুমি বাস্তবে ধাক্কা দাও। উপরের জাগ্রত চেতনায় তোমার যে ইচ্ছাশক্তি সে যদি তাকে প্রত্যাহ্বান করে, তবু তোমার অন্তঃকলের মন চলেতে তাকেই চেয়ে আর অবচেতন মন তোমার জাগ্রত সান্দ্র্য ও মুক্তির অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী, বেশি ব্যাপক এবং ফলসিদ্ধির পক্ষে বেশি তার যোগ্যতা। কিন্তু যুগপৎ এই দুটির অপেক্ষাও বলায়মান হল আশা; আশা ও আশঙ্কা দু'নে রেখে আশ্রয় গ্রহণ কর আত্মার স্বহৃদয় প্রণতি আর সার্বভৌম স্বাভাবিকতা।

ভগবান অসীম বিশ্বকে সৃষ্টি করলেন তাঁর আত্মজ্ঞানের সহায়ে—আত্মজ্ঞান সর্বাঙ্গিক যখন তখন সে হল আত্মসংস্কৃতিপ্রসারণ ইচ্ছাশক্তি। ভগবান অজ্ঞানকে কাছে লাগিয়েছেন তাঁর আনন্দকে সীমিত করবার জন্য। কিন্তু ভীতি, ক্রান্তি, অবলাদ, নিজে উপর অবিশ্বাস, দুর্ব্বলতা স্বীকার—এ সব হল নিজের স্বষ্টিকে নিজে ধ্বংস করবার উপায়। এদের যদি ঘুরিয়ে চালনা করতে পার তোমার মধ্যে অসৎ যা, অনিষ্টকর যা, অসংযত যা সে সমস্তের উপর, তবে তে ডালই; কিন্তু তাকে যদি আক্রমণ করে জীবনের ও মানবতার মূলকে, তবে তাদের ধরে বহিকার করে দিতে হবে নতুন জোয়ার নৃত্য।

মানুষ তার শক্তিকে, তাঁর আনন্দকে নষ্ট করবার জন্য দুটি প্রকৃষ্ট আধার ব্যবহার করেছে—ভুল উপভোগ, ভুল উপরতি।

আনাদের ভুল হয়ে এসেছে এবং এখনো এই যে আনন্দের প্রাপ্তি ভোগের কুফল থেকে পরিজ্ঞাপ চাই বৈরাগ্যের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে আর বৈরাগ্যের কুফল থেকে পরিজ্ঞান চাই ফিরে আবার প্রাপ্ত ভোগের মধ্যে গিয়ে। আনন্দের দুটি পরস্পর-বিরোধী বিপরীত প্রাপ্তের মধ্যে দুলে চলি।

★

খেলারও মধ্যে অতিরিক্ত সব দেলা ভাল নয়, জীবন ও কর্মের মধ্যেও তেননি আবার অতিরিক্ত গুরুগাভীর্ষ্য ঠিক নয়—উভয়টাই আনন্দের চাই খেলার মুক্তগতি আর গুরুত্বের নিরববদ্ধ।

★

চল্লিশ বৎসর ধরে আমি নিরন্তর ভোগ করেছি ছোট ও বড় সব অসুখ-বিসুখ—বাহিরে সম্পূর্ণ স্বাধীন সেখানেও, শারীরিক গঠন আবার দুর্বল—এবং ভুলকনে নবন করি যে ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করার ভারটি প্রকৃতি আমার উপর ন্যস্ত করেছেন। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি ঐশ্বর্যের সাহায্য বর্জন করলান, সেই হতেই রোগ আমার কাছে থেকে বসে পড়তে শুরু করেন, বার্ষিক পরভুকের মত। তখন আমার হৃদয়মন হল কি স্বাভাবিক স্বাস্থ্য আমার মধ্যে রয়েছে আর তাগো চেয়ে কত বেশি বলীমান রয়েছে ইচ্ছাশক্তি ও শ্রদ্ধাশক্তি—মনকে অতিক্রম করে, এবং তাকেই শারীর জীবনধারণের দিব্যধারক হিসাবে উগ্ৰমান নিশ্চিষ্ট করে রেখেছেন।

★

বহুগতি বর্তমান মানবজাতির পক্ষে প্রয়োজন, আনাদের দুঃস্বপ্নেরা যদিও অসংস্কৃতির জন্য। কিন্তু এই যত ব্যাধি স্বাধীন-স্ববিচার বিদ্রাষ্টিক উপকরণগুলি তাদের মধ্যে যদি বলী হয়ে থাকতে হয়, তবে চাক্ষুশবলকে আর তার ব্যবস্থাদিকে বিদায় দিতে হবে। সারল্যকে স্বাধীনতাকে বিদায় দেওয়া অর্থ সৌন্দর্য্যকে বিদায় দেওয়া। আনাদের পূর্বপুরুষদের বিনাশিতা ছিল প্রচুর এমন কি অভয়পূর্ণ, কিন্তু কখন তার-বিহীন ছিল না।

★

ইউরোপীয় জীবন-ধারণের যে প্রাপ্তি সুখোপভোগ, যে দুর্বল জীকলমক তাকে সভ্যতা নাম দিতে আমি রাজি নই। ব্যাধি অন্তরায়ের মুক্তিস্বাভ করে নাই, ক্রিয়া কর্মে ঘাসের নাই বহুধের সুস্থতা সভ্য নয়।

★

চাক্ষুশবল আধুনিক-যুগে এবং ইউরোপীয় সভ্যতায় হয়ে উঠেছে জীবনের উপর একটা অধিকতর উপাধি, অথবা অপ্রয়োজনীয় ভূত্বা রাজ—তার হওয়া উচিত প্রধান পরিদর্শক, অপরিহার্য ব্যবস্থাপক।

● অনুবাদক—শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্ত

স্মৃতির পাতা*

শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্ত

পড়িচেরীর *নশানে ভূত-প্রেতের পৌরাত্য ছিল বনেছি। এই ভূত-প্রেতের বিশেষ একটি সম্ভ্রমার ছিল—আমের পরিচিত নাম হল শাই (গুপ্তচর)। শাই নামটা আবার কানে এনে দেয় যত হেয় ঘৃণা অশ্রাব্য কলুষ-কলম্বের কাহিনী। কিন্তু ও-শব্দটি জান কি একেবারে খাটি সংস্কৃত? বৈদিক ভাষার ওকে বলে স্পশ—বৈদিক ঐষি বলছেন ইন্দ্র পাঠিয়ে দিলেন তাঁর চারদিকে শত্রুদের অশপত্রিদের প্রতিবিম্ব জানবার জন্য, এই সব স্পশ:। বৈদিক শেবভাস্কের চর আর আধুনিক বৃত্তিদের চর—ওনুও কিছু পার্থক্য আছে বৈ কি? চররা সংবাদ নিত আনাদের বাসায় কাগজ আসে, কাগজ আবারের সঙ্গে দেবারগাফাং করে, আনরা কোথায় চলাফেরা করি, আনাদের অভিধিরাই বা কোথায় যায় কি করে। তাই বহিঙ্গা (চন্দ্রনখর প্রবর্তকের মতিনাল রায়) যখন প্রথম এসেছিলেন, তখন টা'গ (ফিরিঙ্গি) সেজে এসেছিলেন পড়িচেরীতে এবং আনাদের বাসার চুকতেন রাত্রিতে বন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে, পিছনদরহা দিয়ে (এখনকার রাঘবন হাউস)।

পড়িচেরীতে আনরা পদার্পণ করি সকলেই ছদ্মনাম নিয়ে—এক মণি (স্বত্রেণ চন্দ্রমতী) চাড়া। কারণ, প্রথম, আনাদের বড় লাগী সে ছিল না, কোন রাজনীতিক ক্যামাদের মধ্যে ওর নাম জড়িত হয় নাই—তখনো বয়সে ছোট ছিল বলে। দ্বিতীয়ত, তার নামে বাড়ী ভাড়া নেওয়া হবে ঠিক হল, অন্যান্য সরকারি আদান-প্রদান সরকার বত করা হত তারই নামকতে—সুতরাং আইনের চোখে নির্দোষ থাকার জন্য ছদ্মনাম গ্রহণ করা বুদ্ধিযুক্ত হত না। শ্রীযতবিশেষ ছদ্মনাম হল বড়ীন্দ্রনাথ ব্রিত্ত (অবশ্য কটা দিনের জন্য ব্রিত্ত)। এই নামে তিনি ভূপুে ভাষাজ্ঞের স্বাত্রী হন কলকাতা থেকে এবং ডাক্তারের কাছে পরীকার জন্য উপস্থিত হন। বড়ার কথা এই—ডাক্তার অবশ্য সন্দেশ করেনি কা'কে সে পরীকা করছে, তবে শ্রীযতবিশেষ ইংরেজী শুনে বনে উঠেছিল, আপনি ত খুব ভাল ইংরেজী বলেন (You speak English very well)। উত্তরে শ্রীযতবিশ বলেছিলেন, "Yes, I was in England sometime"—sometime ত বটেই—১৪ বৎসর! আনার নাম হয়েছিল বনীন্দ্রনাথ ব্রিত্ত—শেষটা পরিচিত হলেন monsieur Roy নামে—এখানকার প্রাচীন বহু দু'চার জন এই নামেই আনাকে এখনো জানান ও

* শ্রীযতবিশ আনাদের বানক-বাগিকাদের উৎকৃষ্ট নির্মিত এক পট্ট।

ডাকেন। খুঁটিলেব খোঁলেতে 'সাক্রা' (Sacra অর্থাৎ চক্রবর্তী) ও 'নয়' তুলিপাত চরে উঠেছিল সহরে এবং বাইরেও। বিজয় ছিল বক্তিন বসাক—তুং বসাক, আনাদের কুটিল চিনে সুবিখ্যাত চাকর্যাক।

বৃষ্টি পুনিশ একটা রীতিনুত আত্মনা বেঁধেছিল—একদান বাশা ডাড়া করে এবং কয়েকজন দ্বারী পুনিশ বেধে। অবশ্য তারা সাধারণ পোষাকে থাকত, ফরাসী রাজ্যে তাদের পুনিশী পোষাকের অধিকার নাই। তারা আনাদের ও আনাদের অভিধিমের নজরে রাখত বলেছি। ক্রমে আনাদের বাসার কোণে রাজ্যের বোড়ে ফুটপাথের উপর তিন চার জন বসে থাকত—তারা সাধারণ দিন আড়ুতা দিত, সাথে সাথে মোটবই বলে কি সব টুকে রাখত। কি টুকে রাখত তার নবুনা আনরা পরে দেখেছি—তারত স্বাধীন হলে, ফরাসী সরকার চলে গেলে—পুনিশের এবং খোদ গবর্নমেন্টের গোপন দপ্তরখানা থেকে জোগাড় করা হয়েছিল কিছু কিছু। অসুত তথা সব—রিপোর্ট নিজেদের মন মত, যা-খুশী গল্প বানিয়ে বলে গিয়েছে। সঠিক সত্য স্বর জোগাড় করা কঠিন—তারা বলে বলে সব স্বর বানাত।

একবার একটা তুং বিকট বীভৎস ব্যাপারই ঘটেছিল। আনরা সব এসেছি বর্তমান Guest House-এ, নুতন দু'জন আনাদের সঙ্গী হয়েছেন—বিজয়ের আনরা (নগেন নাগ, এখানে থাকবে বলে, অল্পের জন্য ছাওয়া বদলাবার অজুহাতে বাড়ীতে বলে করে এসেছিল। তার সহায় সহচর হিসাবে জনৈক পরিচিত বন্ধুও ছিল (নান বীরেন্দ্র রায়)।

এক দিন এই বীরেন্দ্র বস্তক হুওন করল—হঠাৎ। দেখাশেরি মণি (স্বপ্নে চক্রবর্তী) বলল যেও তবে বস্তক হুওন করবে—অন্য কোন হেতু নেই। সেদিন কি তার পরের দিন একটা কাণ্ড ঘটে গেল। বিকেনের দিকে সোজাকার মত শ্রীশ্বরবিশ্বকে গিয়ে আনরা বলেছি টেবিলের চারিদিকে। হঠাৎ বীরেন উঠে দাঁড়ান, জোর গলায় বলে উঠল, "জান আমি কে ? বললে বিশ্বাস করবে না, আমি স্পাই, ইংরেজ পুনিশের স্পাই—বুকের ভিতর চেপে রাখতে পারছি না, কথাটা বলতেই হবে, স্বীকার করতেই হবে আপনাব কাছে"—এই বলে শ্রীশ্বরবিশ্বের পায়ের কাছে পড়ে গেল। আনরা ত স্তব্ধ বলাহত। জাবছি একি সত্য, বিখ্যা—'বাস্তব নতিমনো'। বীরেন আবার বলে উঠল, "বিশ্বাস করছেন না ? এই দেখুন" বলে পাশের ঘরে ঢুকল, তার ট্রাঙ্ক খুলল, ভিতর থেকে বের করল একশ টাকার একখানা নোট। "সেধন প্রমাণ—এত টাকার নোট আমি কোথায় পাব ? এ-টাকার আনার দুর্ভবে পুরস্কার ...আর না, একজ্ঞ আর করব না—আজ আপনাব কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, কনা চাইছি..." আনাদের মুখে কোন কথা সরল না, সবাই নির্বাক নিশান।

ব্যাপারটি ঘটেছিল এই রকবে। বীরেন সাধা হুওন করেছিল এই উদ্দেশ্যে যাতে স্পাইদল বুঝতে পারে যে আনাদের মধ্যে কে-ই তাদের লোক—ওই বুড়িত বস্তকের চির নিষে। কিন্তু বনির সাধাও বুড়িত বখন দেখা গেল তখন তারা বলে পড়ে গেল। আর বীরেনেরও

সম্পন্ন হল আনন্দের বা মণি দ্রুত জানতে পেরেছি তার গোপন কথা এবং মণি ইচ্ছা করেই মুক্তিভবক হয়েছিল। তাই কতকটা ভয়ে কতকটা আত্মরিক অনুশোচনায়—বেশির ভাগ নিশ্চয় আর কোন একটা পক্ষির চাপে—এই স্বীকারোক্তি তাকে করতে হল।

এর পরে বাসার চাওয়াটা কেনন খবরবে হয়ে গেল। আনন্দের গাভীর, চিত্তাখিত—কি করে এমন জিনিষ সম্ভব হল? অলসবহলে শত্রুর প্রবেশ? আর শত্রু আপন ছান? কি করতে হবে? বিজয়ের মাথার খুন চেপে গেল—তাকে ধারানট মুগ্ধ। যাহোক বীরের কিছু দিনের মধ্যে আপন থেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেল—আপন নাস্তি! তবুই পরে সে মহাযুদ্ধে যোগদান করে—বেসোপটেবিদায় যায় ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে।

মহাযুদ্ধের সময়ে বিজয়েও আবার এক ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। সে আর এক কাহিনী। বলেছি ইংরেজ পুলিশের একটা আফ্রানা ছিল এখানে এবং তার প্রধান কর্তা ছিলেন একজন যোদ্ধা-চোন্দা ব্যক্তি—একজন মুসলমান সুলতান। নাম বোধ হয় আব্দুল করিম—অতি বিচক্ষণ সূচকৃত ব্যক্তি—আমাদের পুরাতন বন্ধু সাকশল আলবের নত। আরতা (বিশেষত আমি) এক বন্ধুর বাড়ীতে প্রায়ই যেতাম, এই ভ্রমলোকটিকেও দেখি আবার তাদের বন্ধু ছিলেন—ইচ্ছা সাক্ষ্য হয়ে যেত তাঁর সঙ্গে ওই বাড়ীতে। কথায় বার্তায় অতি অমায়িক লক্ষ্যন। এমন কি, একবার তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন শ্রীশ্বরবিশ্বের দর্শন আকাঙ্ক্ষা করে, প্রজ্ঞা নিবেদনের জন্য। শ্রীশ্বরবিশ্ব কার্ণা করলেন না—অনুত্ত ছিলেন। ভ্রমলোক এক গোছা বিপুল মানা উপলোকন হিসাবে নিয়ে এসে শ্রীশ্বরবিশ্বের দর্শন গ্রহণ করলেন।

আনন্দের তিন ছান—মণি, আমি ও সৌরীন—চার বৎসর পরে বাংলাদেশে ফিরে যাই এবং আবার কিছুদিন আগেই ফিরে এসেছি এখানে, প্রায় এক সৌড়ে। বৃদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাওয়ায়। ভয়ের কারণ ছিল। আবার দ্রুত দাগীনের জেলে পুরবে—আনন্দের ফিরে এসে বিজয় যেতে চাইনি। সেও বুঝে আসবে একবার, আত্মীয়-স্বজনের ও দেশের সুখ দেখে ফিরবে সম্বরই—এতদিন আটকা একখানে। কিন্তু প্রশ্ন উঠল, যাওয়া উচিত হবে কি? ফরাসী সরকারের নতানত বা পরামর্শ কি? গবর্নরের সঙ্গে বন্ধুভাবে স্বর নিয়ে জানা গেল এখানের বাহিরে যাওয়াটা তিনি মুক্তিযুদ্ধ বনে করেন না—ব্রিটিশ সরকারের অভিসন্ধি যে খুব সাধু তা নয়। আব্দুল করিমকেও বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা করা হল—তাদের কুৎসন আছে কিনা। তিনি বললেন, ব্রিটিশ সরকারের কোন পরিসিদ্ধি নেই; তিনি শু জানেন আনন্দের সাধুজন—যোগ-সাধনাই করি, ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রীশ্বরবিশ্বের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল এ-বিষয়ে। কিন্তু বিজয় একরোখা নান্দ, উগ্রবীর হয়ে উঠল দেশে ফিরতে, ব্রিটিশ ভারতে পা দিতে অর্থাৎ বাড়িকাটে গলা এগিয়ে দিতে। ঘটলও তাই। কে-মুহুর্তে সে ফরাসী এলাকা ছাড়িয়ে ইংরেজ রাজ্যে পৌঁছল অবনি, তৈরী ছিল পুলিশ কোর্স, হাতে হাতকড়া এবং পাঁচটি বৎসর অর্থাৎ বৃদ্ধের শেষ পর্যায়—অন্তরীপ বাস। একবার এক বৎসর জেলবাসের উপর দিয়েই কাঁড়া কেটে গিয়েছিল, কিন্তু এবার অত সময়ে পার পাওয়া গেল না।

বাসোক, এই দণ্ডকারণ্য পূর্বের ব্রাহ্মসংস্কারদের কথা আর না-ই বলান—তাদের বাহিনী এখনো বনবান, মান করে তাদের শক্তি বাড়িতে চাই না। এখন কিছু সং কথা বলি, সাধুসন্তদের বিষয়—দণ্ডকারণ্যে এদেরও বসতি ছিল না। প্রথমেই বলি পঞ্চ সম্ভবনের কথা। ফরাসী রাজ্যে বিদেশীদের জন্য একটি নিয়ম ছিল হমত কিন্তু স্বদেশী আশ্রিত সের জন্য নিয়মটা বলবৎ করা হ'ল, বলা হ'ল যে বিদেশী (অর্থাৎ ফরাসী-সাম্রাজ্যবাসী নয় বরং) যারা এখানে এসে থাকতে চায় দীর্ঘদিন তাদের একটা দলিল (পার্টিকুলার) থাকা চাই যেখান থেকে তারা আসছে সেখানকার সরকারী কি বিশেষ পদার্থ কর্মচারীর (ইংরেজ ভাষাতে ব্যাঙ্কিট্টেট) এই মর্মে যে আগন্তুক ব্যক্তি পরিচিত এবং তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই (অর্থাৎ good conduct-এর certificate)। মৃত্যু চাই স্থানীয় পাঁচজন গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষরিত পত্র ওই একই মর্মে। বলা বাহুল্য প্রথমেই উপায় আনাদের সাধ্যাতীত এবং অসম্ভব। দ্বিতীয় পথ অনুসরণ করা হ'ল এবং যে পাঁচজন মহাজন তাঁদের নাম দিলেন তাঁরা এই (১) রাসেন্দ্রিন (আমাদের Jules Rassendrin পিতা), (২) দ' জীর নাইডু de Zir Naidu, (৩) লে কো Le Beau, (৪) শক্তর চৌটিয়ার (যার বাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দ সর্বপ্রথম উঠেছিলেন এসে), আর (৫) নুরুগেশ চৌটিয়ার। এই পঞ্চমের নাম স্বর্ণাকরে লিখে রাখা উচিত। সে-সময়ে এরা সভাসভাই বিশেষ সাহসের ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলেন—এঁদের ওই স্বাক্ষরের বলেই আমাদের এখানে স্বাধিকার সহজ হয়ে গেল।

স্থানীয় নেতৃবর্গের কথা বলতে গিয়ে আর একটি ব্যাপার মনে পড়ে গেল। আমি যখন এখানে প্রথম আসি তখন একটা ছল করে আসি—সংশোধনের হাত এড়াবার জন্য। আমি যেন আসছি চন্দ্রনগর থেকে—এক ফরাসী রাজ্য থেকে আর এক ফরাসী রাজ্যে, এক নেতার কাছে আর এক নেতার পত্রবাহক হয়ে। অর্থাৎ চন্দ্রনগরের এক রাষ্ট্র-নীতিক দলপতি পণ্ডিতের আর একজন দলপতির কাছে চিঠি ছিলেন। আমি যার কাছে চিঠি নিয়ে এলাম তাঁর নাম হ'ল সন্সুগাভেলু—চন্দ্রনগরের কোন সমাজ্য ব্যক্তির কাছে থেকে যে চিঠি নেওয়া হয়েছিল মনে নেই। চিঠির বর্ণ ছিল এই যে আনাকে যেন এখানে থাকবার সুবিধা করে দেওয়া হয়। চিঠিখানি নিয়ে আমি এলাম সন্সুগাভেলু অর্থাৎ সন্সুগ ভেলু মহাশয়ের বাড়ী ঘোঁষ করে—এই কথাটি আমি উচ্চারণ করলান সন্সুগাভেলু, জাভিলভাবীদের রোমহর্ষ জানিয়ে। সেখানান বিপুলকার গাভেলু মহাশয় ইজিচেগারে বেলান দিয়ে আছেন আর তাঁর চারদিকে বলে আছে তাঁর দলের লোক। আর শুভলান তাঁর কণ্ঠ থেকে ভাষণ বের হচ্ছে যেখানকার বড় (পরতের বৈষ নিষ্চয়—কারণ তাঁর দলের নাম হ'ল Radical Socialist অর্থাৎ আবার বাকি বলি nationalist কিন্তু moderate) পরিচিহ্ন ফরাসী ভাষায়—বলে উঠলেন তিনি, Sommes-nous des citoyens Français ou non—“আমরা কি ফরাসী নাগরিক নই তবে?” অর্থাৎ ফরাসীদের

কর্তাদের কাছে নানি—প্রতিবাদ-প্রার্থনা (protest and petition) জানান হচ্ছে—“কোথায় আমাদের অধিকার এখানে?”

পত্রিচরীতে যুবদের মধ্যে আমাদের প্রথম পরিচয় কয়েক জনের সঙ্গে। সর্বপ্রথম যিনি তিনি হলেন সন্ন্যাসী—তোমরা জান তাঁকে—শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন। তারপর বেত্তামিন রাসেন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন—রাসেন্দ্র জীবনের শেষে আমাদের সঙ্গে এসে নিলেছেন, তাঁর জীবনের প্রত্যয়ে তিনি ছিলেন আমাদের খোঁজ সাথী। তখন এদের নিয়ে একটা দল গড়ে উঠল—শ্রীঅরবিন্দের ডল। তবে আশ্চর্যের কথা এঁরা সবাই ছিলেন খৃষ্টান—হিন্দুদের থেকে তখন সাদা আঁধা পাই নি, হয়ত তারা ছিল অতিরিক্ত ধোঁয়া, পুষাতন-পটী। Cercle Sportif ছিল আমাদের নিলনের কেন্দ্র। খেলাধুলা হত, পিকনিক হত (তোমরা যেমন কর আঁধাকাল), নাটক-অভিনয় হত, এবং পড়াশোনার জন্যও অধিবেশন হত। সবই ছাত্রদের নিয়ে।

পরে শ্রীমা বরন এসেন ১৯১৪ সালে তখন তিনি এদের ভিতর থেকেই কয়েকজনকে নিয়ে স্থাপন করলেন তাঁর প্রথম কর্মসূচির উদ্যোগ—Idée Nouvelle অনুষ্ঠান। প্যারিসে থাকতেই শ্রীমাকে প্রাণুর করে একটা দল গড়ে উঠছিল—যার নাম ছিল Cosmique—সেখানে যে আলাপ-আলোচনা বিভ্রাণাবাদ হত তা নিষিদ্ধ এবং প্রকাশিত হয়েছে Words of Long Ago (Paroles d'autrefois) পুস্তকখানিতে। পত্রিচরীতেও ‘আর্য্য’ পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে মাঝের একটা অন্তরঙ্গ সাধক-গোষ্ঠির স্ফুটপুস্তক তখন থেকেই শুরু হয়েছিল।

এখানে একটি বিচিত্র ঘটনার কথা বলি—মা বললে আমাদের জীবন-কাহিনীর বৈচিত্র্যে দানি ঘটবে। আমরা তখন গেষ্ট হাউসে—শ্রীমা এসে গিয়েছেন, শেষবার পাকাপাকি হয়ে। মহাবুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে—অর্থাৎ প্রথম বারেরাটি। যুদ্ধশান্তি কলে ভারতে রাজ-বন্দীরা সকলেই প্রায় খালাস পেয়েছেন। বারীনন্দা, উপেনন্দা, রুমীশা সবাই ফিরে এসেছেন আশ্রয় থেকে—তবে তাঁরা তখনো ঠিক করতে পারেন নি, সাধনার জীবন গ্রহণ করবেন এখানে এসে, না কর্মজীবন আরো কিছু চালাবেন বাহিরে।

একদিন হল এক কাণ্ড। বাড়ীতে চুকলেন এক সন্ন্যাসী—মেথবার মত চেহারা, জুলীর্ষ, গৌরবর্ণ, কচক গোছা জটা আলবিত, মাথায় বিপুল পণ্ডা। সঙ্গে তিন চার জন শিষ্যও ছিল। তিনি শ্রীঅরবিন্দের দর্শন ভিত্তি করলেন। কিন্তু সেদর্শন হয়ে গেল এক অনৌক্তিক ব্যাপার। তিনি নিজেই অভিযুক্ত করে ধরলেন, সন্ন্যাসের বিপুল আবেশের অন্তরালে তিনি হলেন অমরনাথ—অমরেন্দ্রনাথ চৌধুরীপাখার—সুবিখ্যাত বিপ্লবী নেত্র, বাক্যে পাকড়ানর বনো ব্রিটিশরাজ বর্ণ-বর্জ্য-পাতাল (বর্ণ অর্থ বৃত্তাঙ্গাক, বর্ণ অর্থ জীবিতের লোক, আর পাতাল হল ভুব-সেওয়া, (going underground) টুঁকে বেড়াচ্ছিল, তাঁর সাধার জবা নুলাও বসিয়েছিলেন হস্ত—তিনি সশরীরে উপস্থিত। এটা উৎসাহের, বিশ্বাসের এক

কথাক্রমে আশঙ্কায় ও তরঙ্গ উঠে গেল—আশঙ্কা এজন্য যে কথাটা বাহিরে জানাজানি হয়ে গেলে ফরাসী তথা ব্রিটিশ সরকার কি করে ফেলবেন তার ঠিক নেই।

অনরদা একদিন ভুব দিয়েছিলেন, আনানের বনে মরলে ছাংলী বনে গিয়েছিলেন, পূর্ববঙ্গের ট্টনার ঘাটে ঘাটে মুননান সেজে (নুনি ফেজ পরে) মুনগী তিন বেচে ফিরেছেন—আরো কত কি, সরকারের শোনচকু এড়াবার জন্যে। সে এক বিপুল বোঝাভর ইতিহাস। সর্বশেষে তিনি সন্যাসী বনে গেলেন—হলেন গুরুজী। তাত্ত্বিকের কাছে এক আশুর দাপন করলেন—শিখাসানন্ত ছুটে গেল, বস্ত্রতর দান করে প্রতিষ্ঠাপন হয়ে উঠলেন—নাম হল (খুব সম্ভব) স্বামী কৈবল্যানন্দ। ইংরেজ সরকার একেবারে বোকা বনে গেল।

স্বামিজী অর্থাৎ অনরদা এখানে এলেন শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে নির্দেশ নিতে, অতঃপর কি করণীয়। বলেছি নুদের অস্ত্র, সেসময়ে রাজবন্দীরা প্রায় সকলেই মুক্তিনাভ করেছেন, আশ্চর্যান্বয়ীরা পর্বত ফিরে এসেছেন—এখন তিনি আত্মপ্রকাশ করতে পারেন কি না এবং তারপর কি করবেন। ঠিক হল কলিকাতার আবার ঘাবেন এবং কিছুকাল অপেক্ষা করবেন ঘটনার পরিণতির জন্যে। স্বামিজী তাঁর শিষ্য কয়েকজনকে ফিরে যেতে আদেশ করলেন এবং বললেন তিনি একাণ্ডে থাকবেন কিছুদিন।

অতঃপর স্বামী কৈবল্যানন্দের হল অন্তর্ধান বা নির্বাণপ্রাপ্তি। অন্যরকম চট্টর হল উদয়। শিবোদ্যোগ এদিকে ফিরে গিয়েছে তাঁদের আশ্রমে—অপেক্ষা করে আছে, কিন্তু নামের পর নাম চলে যায় গুরুজীর সংযোগ নাই কোন। এখানে বৌদ্ধ নিতে এল, কোথায় তাঁদের গুরুজী? কোথায়?

অনরদার সঙ্গে আনার সেই শেষ দেখা হয় আবার পণ্ডিচেরী চলে আসবার অব্যবহিত পূর্বে। তাঁদের সোকানে বাই—“শ্রবজীবী সনসার” ছিল কাপড়ের সোকান, বিপ্লবীদের আত্মনা ও মুখাবরণ। তিনি জানতেন সব কথা—পণ্ডিচেরী চলেছি। বিদায়ের সময় একখানা আনোয়ারান সোকান থেকে দিলেন আনাকে, বললেন—“payable when able”—বেশ বনে আছে সেকথা।

বর্তমান ঘটনার বহু পরে তাঁর সঙ্গে আবার সংযোগ হয়েছিল, তিনি শ্রীঅরবিন্দের ও বাড়ির ভক্ত ও শিষ্য হয়েছিলেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁদের অনুগত ছিলেন।

পণ্ডিচেরীতে আমাদের আদি-স্বীবনের শিকা-শীকার কথা কিছু এখানে অব্যাহত হবে না। পণ্ডিচেরীতে এসে প্রথমেই আমাদের প্রয়োজন বোধ হল পুস্তকাবলির—তখন ও আমাদের নাই বলতে কিছুই ছিল না। শ্রীঅরবিন্দকে দেখতান সে সময়ে শুধু ঋগ্বেদ পাঠ করতেন—দুই ধও ঋগ্বেদ মূল শুধু তাঁর জন্যে বোগাড় করে সেওয়া হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে অবশ্য ছিল দুটি কি তিনটি ট্রাক ডরা খাঁড়পত্র। ঠিক হল দশ টাকা করে নামে বইয়ের জন্য খরচ করা যেতে পারে। আনা হল প্রথম ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান প্রধান বইগুলি যাকে বলে English Classics, বিশেষভাবে Home University Library,

World Classics Series এ। এখন যে তোমরা সেব কি বৃহৎ স্থলর লাইব্রেরী আনাদের হয়েছে—তুই একটা নয়, দু'তিনটি আনুসঙ্গিক লাইব্রেরীও আছে, শারীরিক শিক্ষার একটি, জুলের একটি, ডাক্তারী একটি আর শ্রুতাত্ত্বিকের হবে বলে ত আছেই। এসময়ের গোড়া তখনই ওই যে আমরা নামে নামে দু'চার খানা করে জ্বাতে শুরু করলাম। প্রথমে বইগুলি নাট্যেই থাকত—কারণ চেয়ার টেবিল আনবারী বলতে আনাদের কিছুই ছিল না। তখনই বলি বিদ্যাপত্রও আনাদের কিছু ছিল না। শ্রুতাত্ত্বিকের ছিল একখানা করে মাদুর—খাট বন, বিছানা ত্র্যমক গদি বা বন, ফানিচার বন, সব ওই একটি মাদুরেই হয়ে যেত। আর বশারী? সে—luxury আনয়্য স্বপ্নেও দেখি নাই—বশার উৎপাত হলে বাহিরে গিয়েছি মাদুর টেনে ছাতের হাওয়ায়—যদি হাওয়া থাকে। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের জন্য কোন প্রকারে যোগাড় হয়েছিল একটি টেবিল, একটি চেয়ার আর একটি ক্যাম্প-বাট—একবারে ক্যাম্প লাইফ বেন। বলা উচিত দু'চারখানা ডাক ডাক চেয়ারও ছিল অতিথি অভ্যাগতদের জন্যে। আর আলো? এখন তোমরা দেখে ধরে ধরে বাতালার উঠানে দিমনি আলোর ছড়াছড়ি—mercury light হয়ে গিয়েছে, flash light, spot light, torch light—lime light পর্যন্ত পৌঁছেছি গিয়ে—আলোর আলোবর, সর্ববিদ্য: বিভাজিত। তখন আনাদের electric light ত প্রস্থান, ভ্রষ্টাচিত ন্যাস্য বা লণ্ঠনও ছিল না। আনান মনে আছে শুধু একটা candle stick এর কথা—শ্রীঅরবিন্দের ব্যবহারের জন্য। সাত্বিতে অন্ধকারে গনপত্তজব ছিল আনাদের—আনাপ আলোচনা, অথবা নির্বাক থাকাই যত্নাস করা হত। যেদিন প্রথম আলো এল বাড়ীতে—কি আনন্দ, আর মনে হল যেন কি revelation. আমরা গেট হাউসে থাকতাম, কিছুদিন আগে এসেছি ও-বাড়ীতে—একদিন বিকেলে বের হয়ে গিয়েছি খোলাখুলি করতে (ফুটবল), ফিরেছি বখন রাত হয়ে গিয়েছে, দহকা খুলে ঢুকেই দেখি, একি? আলোর আলোকিত, সব দিক উজ্জ্বলিত, illumination একেবারে। আনাদের অনুপস্থিতিতে electric-ওয়ানারা আলো দিয়েছে—সবত বাড়ীতে চার চারটি আলো! এই গেট হাউসে—নীচে দুটি, উপরে দুটি।

ফরাসী বই কেনা হয়েছিল খুব সস্তায়—হ'পরমা কি দু'আনা করে এক একখানা একটি series-এ। 'বাবনের বই—ফরাসী সাহিত্যের classics—তার দু'পাঁচ খানা। এখনো আছে লাইব্রেরীতে দেখেছি। তারপর আমি পড়িচেরী পুরানো বাজার থেকে ("ওকলী কাউন্ট") অনেকগুলি গ্রীক নাভিন এবং ফরাসী বইও কিনেছি। গ্রীক একটা বৃহৎ অভিধান পাই—এখনো সেটি ব্যবহার করি।

বাংলা সংস্কৃত বইও কিছু কিছু কেনে এসে গেল—আনের ও জয়ের ফলে। এরকম 'বখন কয়েকশ' বই হয়ে গেল তখন তাদের রক্ষণের সমস্যা উঠল—বাঁশের বাধারি বা খালি দিয়ে ধরের সেতাল বরাবর একটা রাক বা book stand তৈরী করা হল। আনবারীর সূত্র-

পাত দর পরে—গেটে হাউসে যতদিন ছিলাম আনবারী যে ছিল কোন মনে হয় না—তা যায়ের আগমনের পরে ঘটে, লাইব্রেরী হাউসে এসে। বাড়ীখানার মানচিত্র তাই হল লাইব্রেরী হাউস।

আমাদের তখনকার বর্ণনাত্মক স্মৃতি কিছু না বললে কাহিনীটায় খুঁজ পেতে যায়। আসবাবপত্রের কথা বলেছি—এক মাদুরই সর্বসিদ্ধিসাধক। চাকর আমাদের ছিল একটি—বাছার করে আনত। ভাষা ত জানা ছিল না, বাছার করবার নতুন চারটা কথা মুখস্থ করা হয়েছিল। চাকরকে কোন ক্রমে একটা আঁচটা কথা বলে ইস্তাফা ইমিটে বোঝান যেত। বিজ্ঞের *standing instruction* ছিল চাকরের কাছে—বীন নুন আনা (ভাসো বাছকে এটা বলে বীন—অর্থাৎ বাছ তিন আনা), ইলো ত ('ত' তালিম জানা নেই—অর্থাৎ নয় ও চার আনা) দান আনা। বর্তমানে যায়ের উচ্ছৃঙ্খল করণায় আমাদের প্রত্যেকের প্রায় হয়েছে এক একজন চাকর—শ্রীঅরবিন্দ একটু মৃদুদাসা করতেন, বনতেন—যত সাধক তত চাকর আমাদের। রান্না আনরাই করতেন—এক একজন এক এক বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। আমি নিলাম জাত রান্না—এটা সবচেয়ে সহজ বলে হরত পড়ল আমার ঘাড়; রনি নিল ডাল; আর বিজয় আমাদের মধ্যে *expert* বলে ব্যক্তমান্বিত ডার। সৌরীন যে কি করত ঠিক বলে নাই—সৌরীন হল শ্রীঅরবিন্দের শ্যালক—মৃণালিনীর ভাই—খুঁজত, কি খেঁজত—বোধ হয় সে *Home affairs*-এ ছিল না—তার হল *Foreign Ministry* অর্থাৎ বাহিরের লোকজনের সঙ্গে আলাপ-প্রদান। আমাদের প্রধান ঝাঁপুনি আসে যায়ের আগমনের পরে—যখন আমরা সংখ্যায় হয়ে উঠেছি ১০।১২ জন। এক ঝাঁপুনি এসেছিল, যে ছিল একটু বিশেষ ধরনের, যে প্যারিস পর্য্যন্ত গিয়েছিল এবং যেখানে তার খ্যাতি হয়েছিল ভবিষ্যৎটো বা স্মৃতিটো হিসাবে। তাকে দিয়ে বা কিছু পরীক্ষা করিয়েছিলেন আমাদের কয়েকজনের সম্মুখে। শ্রান করে পরিচায় পরিচয় হয়ে সে বসত আমাদের মধ্যে—বা থাকতেন পাশে চেয়ারে, একটু নিতুল থেকে বনঃসংযোগ করি আমরা, তারপর বা তাকে জিজ্ঞাসা করেন—কি দেখেছ? এখানে যাঁরা উপস্থিত তাদের মধ্যে কিছু দেখেছ? ইত্যাদি। অনেক সময়ে সে যত্নসহ চমৎকার উত্তর দিয়েছে। অথচ তার কোন লেখাপড়া জানা নেই, নিরাকর, ফরাসীভাষা শুনে শুনে কিছু ফংসাবানা বনতে পারত। এর পরে যে একজন রত্নইকার এসেছিল সে ত বিখ্যাত হয়েছে—ডুডের কাণ্ড করিয়ে। সে-কাহিনী সকলেরই জানা আছে—*classic story* হয়ে গিয়েছে, শ্রীঅরবিন্দ লিপিবদ্ধ করেছেন, শ্রীমা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বিখ্যাত ফরাসী কবি ও বনৌষী *Maurice Magre* (যিনি এখানে এসে আশ্রমে ছিলেন কিছুদিন) তাঁর পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা বা বলেছেন তা ভোমনা নিশ্চয় পড়েছ তুমিহ। নিজে আর কিছু বলবার না, কারণ আমি প্রত্যক্ষদর্শী নই। আমি তখন বাংলা-দেশে গিয়েছিলাম কিছু দিনের জন্যে।

বানুাষব ও রম্ভটকারের কথা বলতে গিয়ে নিজের সম্বন্ধে আরো বনি তবে একটু। রানুাষবের কাজ অত্যন্ত কঠোরছিল। পরেও আবার তা গ্রহণ করি। কিছুদিন পরিবেশনের কাজ করেছি, আবার সপ্তাহে এক বেলা রানুাও করেছি—যখন আমরা জন পকাশ হযো। কি রানুা ? সপ্তাহে বিকেলে আমাদের তিন দিন পায়ের, —চালের পায়ের, চিঁড়ের পায়ের, আর একদিন টাপিওকা পায়ের। আমি এই শেষের পায়েরটা করতাম। যে হাত একদিন কোনো ভেঁজী কবতে অত্যন্ত দিন তার উচিত ত পরিবেশে পায়ের তৈরী করা।

তখনকার এক সনের পঠন-পাঠনের মধ্যে প্রধান একটা বিষয় ছিল বেদপাঠ। কয়েক-মাস ধরে চলছিল সোচ্চ বিকেলে, প্রায় ঘন্টা ধানেক—গেট হাউসে। শ্রীঅরবিন্দ এসে বসতেন একটি চেয়ারে চৈনিকের সামনে, আমরা চারদিকে। আগ্রহী বিশেষভাবে ছিলাম আমি এবং তামিন কবি সুবুদ্ধিযা ভারতী। শ্রীঅরবিন্দ এক একটা, সুস্ত ধরতেন—একবার পড়তেন এবং প্রত্যেকটি বাক্যের অর্থ বলে দিতেন, তারপর সমগ্রটির অনুবাদ। আমি নোট গ্রহণ করতাম। ঋগ্বেদের অনেক শব্দের বুৎপত্তি সম্বন্ধে সংশয় ও মতানৈক্য আছে। শ্রীঅরবিন্দ এসব ক্ষেত্রে বলতেন যে তিনি একটা সাময়িকভাবে অর্থ দিয়েছেন—অন্যান্য বেশের ত্বিনে পলটি ব্যবহৃত হয়েছে, সব ভুলনা করে পাকাপাকি একটা সিদ্ধান্ত করতে হবে। ঋগ্বেদ ব্যাখ্যার এই ছিল তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি। মূল পাঠ করে, অন্তর্জ্ঞানে সাক্ষাৎভাবে তিনি প্রথমে অর্থ আবিষ্কার করতেন(ট্রিকারিকতার ফলে), পরে সে-অর্থটি বাহ্যাতর পরীক্ষা করে ত্বিন্দিহ করে ধরতেন এবং তদনুসারে প্রয়োজনমত পরিবর্তন সাধন করতেন।

শ্রীঅরবিন্দের কাছে আমি কয়েকটি ভাষা শিখেছি—তাঁর যে পদ্ধতি ছিল তা শুনে অনেকে কিংবা প্রকাশ করেছেন। তাই এ সম্বন্ধে বলি দু'একটি কথা। নূতন ভাষা শিকার জন্যে তিনি আমাকে কোম বাল্যশিক্ষা বা প্রথমপাঠ দিয়ে আরম্ভ করান নাই। একেবারে একখানা ক্লাসিক, সেই ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ের বই দিয়ে শুরু করেছিলেন। তিনি বলেছেন শিশুদের শিক্ষা আরম্ভ শিউপাঠ্য দিয়ে। কিন্তু বয়স যারা, যাদের শিক্ষা কিছু হয়েছে, তাঁদের বয়সের এবং নৃত্তিকের বিকাশ অনুসারে পাঠ ব্যবস্থা করতে হয়। তাই গ্রীক বধন আরম্ভ করতাম, ধরতাম একেবারে Euripides (Medea) ; ত্বিতীয় বই হল Sophocles-এর Antigone। আমি Antigone বাংলার অনুবাদ করতে শুরু করি—শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, আমি যদি সবটা অনুবাদ করি তবে তার একটা সুবন্ধ ত্বিনি লিখে দেবেন—জাত State vs. individual-এর সমস্যা ত্বুলবেন। আবার অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছিল কি না—ঠিক মনে নেই। নাভিন আরম্ভ করি Virgil-এর Aeneid দিয়ে, আর ইতালীয় আরম্ভ করি Dante দিয়ে। ইতিপূর্বেই বলেছি ফরাসী আরম্ভ করি Molière দিয়ে। এই পন্থার কি লাভ হয় তা বলছি, অন্ততঃ আমি বা অনুভব করেছি। মনে হয় ঙাপিয়ে পড়েছি গিয়ে ভাষার অন্তঃবনে, ভাষার বেথানে প্রাণম্পন্দন, সার সৌন্দর্য, পূর্ণগতি সেই মর্মবুলে প্রবেশ করছি, এই কোনোই হরত ফরাসী ভাষার কবিতা বা পন্থারচনা করতেও অনুপ্রাণিত হয়েছি,

যেন ভাষার আশ্রয় সহস্রের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছি। এই রীতিকেই পাশ্চাত্য আনুষ্ঠানিকতা বলেন in medias res, অর্থাৎ তিনিসের মাঝখানে প্রবেশ একেবারে। গল্প শুরু করা যেতে পারে দু'রকমে—একটা হল একেবারে গোড়া থেকে, ধীরে ধীরে ক্রমে কাহিনীটা কুটিয়ে তোলা—আদিকাণ্ড থেকে genesis থেকে—যথা রানারথ মহাভারত বাইবেল ; আর না হয় শুরু করা ঠগাং, ঘটনার মাঝখানে দিয়ে—পাশ্চাত্যে শিক্কারা এইটাই বেশি পছন্দ করতেন, হোমর শেন্সপীয়ার বেরকন।

কিন্তু এভাবে সাহিত্যিক চর্চা করা বা সাহিত্যিক চর্চার সাহায্য করা শ্রীমদ্রবিশেষ সম্ভব হয় না। কারণ, আমি পূর্বেই বলেছি যে আমাদের জীবনের জীবনধারণের বোড় ঘুরে গেল নায়েব আসার পর। কি ভাবে, তার মূল কথাটা কি ? তা হল এই—যা এসে শ্রীমদ্রবিশেষকে শ্রীমদ্রব আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন যোগেশ্বর রূপে। আমরা তাঁকে বহু হিসাবে নিজে হিসাবে সঙ্গা হিসাবে দেখেছি—মনে প্রাণে তিনি শুরু আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ডাও ঠিক ; কিন্তু আচার ব্যবহারে আমরা তাঁকে শ্রীমদ্রব আসনের সমগোত্রীয় করে দেখেছিলাম। অবশ্য তিনি নিজেও 'গুরু' 'আশ্রন' এই কথাগুলি তাঁর নিজের সম্পর্কে ব্যবহার করতে মায়াব ছিলেন—এগুলির সঙ্গে যে সব প্রাচীন সংস্কার সংযুক্ত রয়েছে তাদের দ্বানে কোথায় তাঁর স্বষ্টিতে ? তবুও শ্রীমদ্রব এসে দেখালেন তাঁর কথায় ব্যবহারে, কার্যত দেখালেন শিখা শুরু কাকে বলে—আপনি আচরি তিনি অপরে দেখান। শ্রীমদ্রবিশেষ সাননে বা সঙ্গে সবানে চেমানে না বসে, মাটিতে বসে তিনি দেখালেন শুরুকে কি রকমে সন্তান করতে হয়—আদর্শ শালীনতা কি বস্তু ? শ্রীমদ্রবিশেষ একবার একটু অনুযোগ করেই যেন বলেছিলেন আমাদের—আমি নিজেদের যত জোত করে ধরতে পারি তা করেছি, তবুও তোমরা আমার মাগাল পাও না !

শ্রীমদ্রবই আমাদের চোখ মূলে দিলেন এবং আমাদের দিলেন সেই অনুভব যাতে আমাদের অর্জনের মতই বলতে হল ;

সংকতি বস্তু প্রসঙ্গঃ যদুভঃ
হে কৃষ্ণ হে বাদস হে সংকতি।
অজানতা বহিমানঃ ভবেৎ
বস্তু প্রবাসঃ প্রণয়েন বাপি ॥

যচানবাসাঃ অসংকতোহপি
বিহারশয্যাসন ভোজনেষু।
একোহর্থবাগ্যাত্ত ভৎসনকং
ভৎ কাময়ে বাহু অহু অপ্রবেদহ ॥

তুমি লম্বা এই মনে করে প্রগল্ভ হয়ে তোমাকে যা-কিছু বলেছি, হে কৃষ্ণ, যে যদিও, হে লম্বা, এই সব নানে ডেকেছি—তোমার বহিষা না জেনে, অজ্ঞানের বশে কিম্বা প্রণয়ের বশে।

সহস্র করুণে গিয়ে তোমাকে যা-কিছু অসম্মান দেখিয়েছি—খেলার আর শয়নে আর ভোজনে—একা বধন কিম্বা তোমার সবকে বধন, হে অপ্রণয়ে, সে-সব আবার ক্ষমা কর।

•

যোগসম্বন্ধ—প্রসঙ্গ

অনির্বাণ

[দ্বিতীয় পাদ—সম্বন্ধ-জ্ঞানযোগ]

১১

লোকসংস্থান

অতিনিষ্ঠ পুরুষ স্বচ্ছন্দে প্রকৃতির উপদ্রষ্টা ভোক্তা এবং নিয়ন্তা। অতিনিষ্ঠি সম্ভব হয় পরমপুরুষের সাধুত্বে। তার জন্য ইহলোক থেকে পুরুষকে উজ্বিয়ে যেতে হয় লোকোত্তরের দিকে। এখানে পুরুষ প্রকৃতির স্ব। বনের ঐশ্বর্য তার মাঝে ফুটেছে বলে নিজেকে সে স্বাধীন বনে করতে পারে বটে, কিন্তু বস্তু তার বনের শক্তিও সীমিত। এই শক্তিতে বহিঃ-প্রকৃতিকে ধানিকট। বশে আনতে পারলেও অস্ত্র-প্রকৃতির ঐশ্বর্য হতে সে পারে না। আর তা নাহলে তার জীবন শিবহীন দক্ষয়ন্তে পরিণত হতে বাধ্য। অস্ত্র-প্রকৃতির প্রশাসন হতে পারে যোগে। যোগশক্তির উৎস বনের উজানে। তাই প্রকৃতির বধ্য অধীশ্বর হওয়ার জন্য পুরুষকে করতে হয় এই উজানের পথ, তাকে যোগী হতে হয়।

প্রচলিত যোগে চেতনার দৃষ্টি ভূমি বা লোককে মাত্র স্বীকার করা হয়েছে—একটি ইহলোক, আরেকটি লোকোত্তর। ইহলোকে পুরুষের বন্ধন, আর লোকোত্তরে তার মুক্তি। আগেও বলেছি, ইহলোকের প্রতি তীব্র বৈরাগ্যের ফলে লোকোত্তরের আকর্ষণ সাধকের মাঝে প্রবল বলে তিনি আর মাষপথে কোথাও ধায়ে চান না। ইহলোক আর লোকোত্তরের মাঝে আছে লোকসংস্থানের পরম্পরা। তাদের মাঝে দেখা দেয় চেতনার বিভিন্ন প্রকর্ষ, পরমা প্রকৃতির আনন্দ ও শক্তির উল্লাস। ইহলোকে আনন্দ ও শক্তি কৃষ্ণায় বিরক্ত হয়ে যিনি লোকোত্তরের পথ ধরেছেন, তিনি আর কোথাও তাদের উপর আস্থা রাখতে পারেন না। তাই মানসোত্তর ভূমির ভোগ আর ঐশ্বর্যকে তিনি ভাবেন মাত্রার প্রশোভন, তাঁর নিশ্চল স্বরূপাবস্থানের পক্ষে অতিসূক্ষ্ম বাধাই কেবল।

বলা বাচনা, এ হল নেতিবাচীর দৃষ্টান্ত। নেতি-নেতি বনে নিবিশেষের দিকে উজ্বিয়ে যেতে হয় সত্য, কিন্তু ইতিভাবনার আবার সেখান থেকে ভাটিয়ে না এলে সত্য-স্বরূপকে পুরাপুরি পাওয়া যায় না। লোকোত্তরে যার নিশ্চল প্রতিষ্ঠা লোক-লোকে তাঁরই আনন্দ ও শক্তির বিচ্যুতরূপ। প্রকৃতি তাঁর স্বীয়া প্রকৃতি—তাঁরই আকর্ষণ এবং আয়তন।

আত্ম পুরুষের তাকে ভয় করবার বা এড়িয়ে যাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আত্ম থেকে যেমন লোকোভবের নৈঃশল্যকে অধিগত করতে হবে, তেমনই আত্ম থেকেই লোকে-লোকে আত্মপ্রকৃতির স্বকবুর্জ্যাকেও চিরোন্মিত করতে হবে—তবেই যোগের পূণ্যতা।

মানসচেতনতার উর্ধ্বে যেসব লোক আছে, রহস্যবিদ্যার তাদের খবর নেমে। এতদূর তাকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেও প্রাচীনকালে পুণিবীর সবদেপেই তার কবর ছিল। বিদ্যাটা উপেক্ষণীয় নয়। জড়বিদ্যার বড়ই তারও ভিত্তি তথা আর প্রাকৃতিক নিয়মের উপর। তবে কিনা এ-বিদ্যার প্রধান সাধন হচ্ছে যোগ, যার প্রতিষ্ঠা চেতনার অন্তরাবৃত্তির উপর। পতঞ্জলির যোগসূত্রের একটি পাদ হল বিভূতিপাদ, যাতে জ্ঞান ও ক্রিয়া দু'দিক থেকেই রহস্যবিদ্যার গোপপন্থিক আলোচনা আছে। রহস্যবিদ্যার বিমুক্ত ব্যাখ্যা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু জ্ঞানযোগের সাধনার তার প্রসঙ্গ একেবারে এড়িয়ে যাওয়াও চলে না। কেননা পুরুষের কৈবলাই শুধু জ্ঞানের বিষয় নয়, প্রকৃতির বিভূতিবিজ্ঞানও তার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের আলোচনার পটভূমিকে অনুসরণ না করে আমরা উপনিষদের ধারাকে অনুসরণ করব, কেননা তাতে বিষয়টা প্রাসঙ্গিক এবং সহজবোধ্য হবে।

যা বাইরে আছে তা ভিতরেও আছে, যা বিশুদ্ধচেতন্যে তাই আছে আত্মচেতন্যে—এটি উপনিষৎ-বিজ্ঞানের একটি মূলসূত্র। আগের ভাবনাকে বলা হত অদিদৈবত, পরেরটিকে অধ্যাত্ম। অদিদৈবত দৃষ্টিতে যা 'লোক' অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা হল চেতনার 'ভূমি'। প্রাকৃত চেতনার তিনটি ভূমির সঙ্গে আমরা পরিচিত—অনুর (বা দৈহ্য), প্রাণবর এবং মনোবর। এই তিনটি হল জীবচেতন্যের বসিগাথ। কিন্তু জীব শুধু এই তিনটি ভূমিতেই আবদ্ধ থাকে না, বরকে চাপিয়ে মানসোত্তর ভূমিতে নিজেকে লে প্রসারিত করতে পারে—চলতি কথায় জীব ব্রহ্ম হতে পারে। ব্রহ্ম সং-চিৎ-আনন্দ। সূত্রাং সত্তা চিৎ-তপঃ আর আনন্দ হল অপ্ৰাকৃত চেতনার আর তিনটি ভূমি। এটিকে বলা হয় পরার্থ, আর আধৈর্য্যিক অপার্থ। দুয়ের মাঝে সেতু হল 'বিজ্ঞান' বা ব্রহ্মের অভিমানস। যেমন আমাদের মাঝে অথবা পিণ্ডে চেতনার সাতটি ভূমি, তেমন ব্রহ্মাণ্ডে সাতটি লোক—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জল তপঃ এবং সত্তা।

পুণ্ড্রাকটি লোকে বা ভূমিতে পুরুষ আর প্রকৃতি বা চেতন্য আর বজ্র যুগল হয়ে আছে। এই যুগলত্বের তিনটি বিভাজ (mode) আছে, যা পূর্বোন্নিখিত ব্রহ্মব্রহ্মণের সঙ্গে অবিনাভূত। বিশেষত্ব-কিছু, তার মূল অধিষ্ঠান হল সত্তা। তাকে আমরা উপনিষদে কয়েক পারি আকাশের সঙ্গে। আকাশকে আশ্রয় করে যা ফোটে তা হল প্রকাশ এবং তাপ—যেমন বেশি আগিতির মাঝে। এই হল সমুদ্রের চিৎ-তপঃের নিত্য স্করণ; অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে আমাদের নিয়ন্ত্রণ আত্মচেতন্য প্রজ্ঞা-বীর্ষের অনপলাপ্য স্ফুটি। তারপর আদিত্যের তেজ বিচিত্র বর্ণে এবং ক্রিয়ার রূপায়িত হয়। তার সঙ্গে তুলনা করে উপনিষদে বিশেষ বিভাজিক বসেছেন ব্রহ্মের আনন্দব্রহ্মণ। অভিনুষ্করণ চেতনার তার অধ্যাত্ম প্রতিভা শুধে পাণ্ডা কিছু কঠিন নয়।

বলা বেতে পারে, পুরুষের সত্তা চৈতন্য শক্তি আর আনন্দকে লোকে-লোকে চৈতন্য ভূমিতে-ভূমিতে রূপায়িত করাই প্রকৃতির কাজ। এই দৃষ্টি নিয়ে এইবার আনন্দের আধ-পরিচিতির পালা শুরু হক।

*

*

*

সত্তার পৃথক পাই জড়লোক। জড় বেন চৈতন্যের একেবারে বিপরীত বস্তু। চৈতন্যের যাকিছু ঐশ্বর্য বনে অমর্য আনি, তা এখানে নিগূহিত, সুসুপ্ত। অথচ জড় নিশ্শক্তি নয়। শক্তিতে জড়ের পরিণাম হচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রথমটার দেখি, কে-পরিণাম বেন লক্ষ্যহীন, নিরর্থক। কিন্তু চৈতন্যের উন্মেষে তার মাঝে একটা লক্ষ্য দেখা দেয়। শক্তি তখন হয় প্রাণ। প্রাণ রূপ পড়ে—চৈতন্যের উন্মেষের আধাররূপে। জড় সে-রূপায়ণের আধার। অস্তিত্বের গভীরে নিসৃষ্টিত চৈতন্যকে ধীরে-ধীরে উন্মেষিত করাতেই তার সার্থকতা।

রূপ অব্যবহী অর্থাৎ বহ অব্যবহের সন্যাস। অব্যবহের চরম পর্ববসান পরমাপূর্ণরূপে। পরমাপূর্ণে পরিকীর্ণ হওয়া জড়ের একটি বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি পরমাপূর্ণ বিশিষ্ট। এই বিশিষ্টতা হল বাহ্যবের তিস্তি।

জড় যেমন বহ পরমাপূর্ণে পরিকীর্ণ, তেমনি আবার পরমাপূর্ণ সন্যাসে পুতিতও। এই পুতিতাবই হল রূপ বা বিগ্রহ। বিশ্বে এক রূপ নয়, বহ রূপ। আনন্দের দেহ এমনি একটি রূপ।

সেহ সপ্রাণ। প্রাণ চৈতন্যের শক্তি। পরিকীর্ণতা বা বহুতা যেমন জড়ের ধর্ম, তেমনি চৈতন্যের ধর্ম হল অথও পরিব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিভাব প্রাণেও আছে, সে চার সর্ককিছুকে আয়ত্ব করে বৃহৎ হতে। কিন্তু সেহের মাঝে জড়ের আধিন পরিকীর্ণতা অনুসৃত্য থাকার একটি সেহ আরেকটি সেহ হতে পৃথক। সেহের মাঝে বন্দী প্রাণও তাই বিচ্ছিন্ন। অথও প্রাণ আধারে-আধারে আলাদা হয়ে কাজ করছে জড়ের সীমায় সঙ্কুচিত হয়ে, এই হল আনন্দের সত্তার আধিরূপ।

সেহের মাঝে চিৎ-শক্তির প্রকাশ বনে। কিন্তু প্রাণেরই বহ সে-প্রকাশ সেহবর্ন দ্বারা আচ্ছন্ন অতএব সঙ্কুচিত। প্রতি জীবের যেমন সেহ আলাদা তেমনি প্রাণ ও বনের জিহাও আলাদা। তাইতে জীব-জীবের সেহে বেনন ভেদ, তেমনি সন্যাস প্রাণ ও বনের সন্যেও ব্যক্তি প্রাণ ও বনের ভেদ। অথচ চৈতন্য চায় এই ভেদ পূর করে সবার সঙ্গে সবার যোগ সাধতে। কিন্তু জড়ের বাধ্যকে সম্পূর্ণভাবে তা পেরে ওঠে না।

একই কারণে সেহের মাঝে অবরুদ্ধ জীবের আনন্দানুভূতিও সঙ্কুচিত। বনের নির্ভর ইন্দ্রিয়ের উপর, ইন্দ্রিয়ের পুসর সেহের জড়-বর্ষের দ্বারা ব্যাহত। তাই জীবের ভোগ অপূর্ণ। সর্ককিছুতে নিরুদ্ধ আনন্দ আনন্দনের অধিকার তার নাই, তার সীমিত হবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে পুঃখ আর অসাড়তার অভিলাপ।

চরিত্রি কথার বলে, 'পকভূতের খাঁজে, ব্রহ্ম পাড়ে কাঁড়ে।' ব্যাবহিক জড়লোক বা দেহাচ্চেতনার ভূমিতে তাঁরই এই বশ। প্রকৃতি এখানে পুরুষকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। অসংচেতন হয়ে পুরুষ চরিত্রি তা বুঝতে পারে, কিন্তু এই ভগবান পায়ের চাপ সরিয়ে অনিবার্য সত্তার চৈতন্য এবং আনন্দকে বিস্তারিত করা তার যাবো কল্যাণ না। অথচ তার সাধ আছে। তাই তার এই কান্না।

সাধনার দ্বারা জড়বস্তুর বাধা পুরুষকে কাছিরে উঠতেই হবে—চৈতন্যের শক্তিতে। ইচ্ছার মাঝে অগ্নিস্থলিষের মত এখন চৈতন্যের যে ক্ষীণ প্রকাশ, ঐ ইচ্ছাকে আগ্রহ করেই তাকে উজ্জীর্ণ করে তুলতে হবে। হুতরাং দেহের প্রতি অনান্য বা তার কর্ণ কখনও যোগদিক্খির অনুকূল নয়। ওতে যে মৃত্যু বা কোম প্রকাশ পায়, তা চিত্তের ভাঙ্গল ও স্নান বিকার মাত্র। চিত্ত জড়সত্তা না হলে যোগের দর না।

*

*

*

ভুলোক বা দেহাচ্চেতনার উর্ধ্বে রয়েছে ভূবর্নোক বা প্রাণচেতনা। উর্ধ্বে বলতে যোগ্য চেতনার প্রকাশ। দেহের চাইতে প্রাণের মাঝে চেতনার প্রকাশ আরও স্বচ্ছল। দেহে বা আচ্ছন্ন বা দ্বিষ্ট, প্রাণে তা চকল এবং উদার। ওপের দিক দিয়ে বলা যেতে পারে, দেহচেতনা ভাঙ্গল আর প্রাণচেতনা স্নান।

প্রাণ রূপক। বিশ্বজোতা পরিকীর্ণ জড়াপুকে পুড়ে-পুড়ে সংহত করে বিচিত্র আধারে সে কটি করে চলে। স্বপ্নের মেনা। কিন্তু তার এই আধারকটি বসন্ত চৈতন্যের বা পুরুষের সন্তোষণে চকল। তাই সেখি, ভোগ আর ঐশ্বর্যের বাসনা আনাদের প্রাণের ধর্ম। প্রাণলোক বসন্ত কামলোক—উপনিষদের ভাষায় পঙ্কর্বলোক। এটা অবশ্য প্রাণলোকের জ্যোতির্ভাণ—বাসনার পরিতর্পণ বোঝানে স্বচ্ছল, কিংবা চিৎপ্রকর্ষের অনুকূল। নিঃ বাসনার ব্যাঘাত বা বিকারও আছে। তা হল দুঃখ এবং দুঃখের চেত। তাই প্রাণলোকের ভ্রমোভাণ, বাগতে ব্রহ্মাবিন্যা এসেছে নরক অবীচী পাতাল প্রভৃতির কল্পনা।

এইখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, লোককল্পনার প্রমাণ আছে কিন্তু আনাদের আধারেই। আনাদের স্তে প্রাণ বসন্ত-কিছুই একটা স্ব-তন্ত্র বৃহত্তর উৎস রয়েছে। তাকেই বলা যেতে পারে 'লোক'। সংজ্ঞাটির প্রাচীন অর্থ ছিল 'বিশ্বচৈতন্যের দীপ্তি'। এই দীপ্তি আনাদের ব্যাধি আধারে পরম্পরাক্রমে রয়েছে চেতনার বিভিন্ন 'ভূমি', আধার সবলীতে তেনি 'লোক'। সেনন আনার মাঝে দেহচেতনার ভূমি, তেনি বিশ্বে ভুলোক—যেখানে চৈতন্য জড়বস্তুর মাঝে সংযুক্ত (involved) সেনন এই পৃথিবীতে। হুতরাং আনার চেতনার স্বর্ণ-নরক দিয়েই বুঝতে পারি, জাণের উৎসক্কে স্ব-তন্ত্র স্বর্ণ-নরক আছে। আনার স্বর্ণ-নরকের প্রমাণ আনার আন্তর-প্রত্যাক। তেনি স্ব-তন্ত্র স্বর্ণ-নরকের প্রমাণ যোগ্য-প্রত্যাকে—যা বসন্ত আনার অনবিন্যাস নয়। এখন আনার মাঝে হল ইঞ্জিরপকিই প্রকট, যা জড় জড়কেই সেনে—সে-সেবারও আনার ব্যাধি বাধা। তার বাইরে যা-কিছু, নিজের

বেদায় তা প্রত্যক্ষ 'অনুভব' করি আর অন্যত্র 'অনুমান' করি নাহি। কিন্তু অনুভবে আর অনুমানে ব্যবধানটা বৃহত্তর নয়। চেতনাকে অন্তরাবৃত্ত করলেই 'অনুমান' অনুভবে পর্যবসিত হতে পারে—যেমন হয় কারও সঙ্গে কারও মন মিললে। চেতনার অন্তরাবৃত্তি যোগের মূলে, আর তাতে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়শক্তির প্রকটন এবং আরও গভীর সাযুজ্যবোধের উদ্দেশ্য অসম্ভব কিছুই নয়। তখন দেখা যায়, তুলনাকে যেমন অড় পুঞ্জিত হয়ে জীবের কষ্ট হচ্ছে, তুলনাকেও তেমনি হচ্ছে প্রাণের পুঞ্জন। রহস্যবিদ্যার তাদের একটা সাধারণ শাস্ত্রা হচ্ছে 'সেবজন'। এগানকার জীবের সঙ্গে যেমন অপরোক্ষে আনাদের কারবার চলছে, তেমনি তাদের সঙ্গেও চলছে—পরোক্ষে।

বস্তুত, এই আধারে যেমন দেখতে পাচ্ছি সেহে আর প্রাণে কোনও বিচ্ছেদ নাই, তেমনি অড়লোক আর প্রাণ-লোকেও কোনও বিচ্ছেদ নাই। অড়ের চাইতে প্রাণে চেতনার উদ্দেশ্য স্ফূটন; আর অড় প্রাণ ও চেতনার প্রকাশের আধার হলেও বস্তুত চেতনাই তার নিরঞ্জা। অন্তত জীবের মাঝে সেখতে পাচ্ছি এই বীতি। এই সূত্র ধরে বসতে পারি, অড়লোক বাস্তবিক প্রাণলোকেরই একটা পূরঃক্ষেপ (projection)। ভোগ এবং ঐশ্বর্যের বিভিন্ন পরম্পরার ভিতর দিয়ে চেতনাকে স্ফূর্ত করবার জন্য প্রাণটো তার আয়তনরূপে অড়কে সৃষ্টি করেছে। অড়ের মাঝে প্রাণ যেমন গুহ্যপ্রাপ্ত হয়ে আছে, তেমনি আবার সূক্ষ্ম-তার তর বলে অড়ের উর্ধ্বে তার সাবলীল এবং স্ব-স্তর একটা সত্তাও আছে—চেতনার অন্তরাবৃত্তির দ্বারা আবার যার সন্ধান পেতে পারি।

*

*

*

এনি কবে অড় আর প্রাণকে জাগ্রিত করে যথচ তাদেরও উর্ধ্বে আছে মন। তাকে উপাসান করে আনাদের আধারে যেমন আছে মনোচেতনার ভূমি, তেমনি বিশ্বে আছে বিজ্ঞান মনোবর লোক, অথবা রহস্যবিদ্যার ভাষায় বর্লোক। গুপের দিক দিয়ে দেখলে এখানে সর্বের প্রাধান্য। ভোরের আলোর মত সব প্রকাশধর্মী, যেমন বস্তু: প্রকৃতিধর্মী আর তন: স্বত্বধর্মী। তিনটি গুপের বিশ্বে আনাদের প্রাকৃত চেতনার ভূমি, আর বিশ্বের ত্রিলোকী। এই ত্রিলোকীর মাঝেই চলছে আনাদের প্রাকৃত জীবন আর জন্ম-পরম্পরার আবর্তন। পাশ্বে আবর্তনের আরেক নাম হল সংসার। সংসারেই বহন—ত্রিগুপের বহন। বহনের বেত্রে গুপের বিশ্রুভাব, যার জন্য বিশেষ করে লাগী সাক্ষিক চাক্ষুষ আর তানসিক বৃত্ততা। বিজ্ঞান সর্বের প্রকাশকে তারাই বাহত করছে। প্রাকৃত মন সাবিক, কিন্তু শুদ্ধসর নয়। সব রসজ্ঞানোন্মেষণ্য হয়ে শুদ্ধ হয় বিজ্ঞানে। বিজ্ঞান থেকেই মানসোত্তর যোগভূমিসমূহের উন্ম।

আনাদের মাঝে যা বিজ্ঞান, বিশ্বে তা রহনোক। তার উর্ধ্বে আর তিনটি লোক—জন্ম তপ: এবং সত্তা। তাদের মাঝে ব্রহ্মের আনন্দ চিত্র আর সংসারের প্রকাশ, যা নিয়ে সত্তার পরার্থ। ত্রিলোকী নিয়ে অপরাধ, বিজ্ঞান যা অভিবাসন পূয়ের মাঝে সেতু। অতি-

মানসী শক্তিই প্রকৃত স্বরূপশক্তি এবং আমাদের চিত্তপ্রকর্ষের সাধনায় এই শক্তিই যোগেশ্বরী।
 প্রকৃত সত্তা চৈতন্য (চিত্ত-তপস্) এবং আনন্দ আনন্দের মাঝে নিগূহিত আছে।
 তাদের স্ফুটিত কণাই আমাদের পবন পুরুষার্থ। স্ফুটনের সাধন হল বিজ্ঞান। সাতনহন্য
 রাজবাড়ী, তার নাচের তিনটি বহনই এখন আমাদের আনাগোনা। ভূনে বেছি যে আমরা
 রাজার ঘেরে, সাতনহনের চাষিই আমাদের দেওয়া আছে। চাষিরা হারিয়ে গেছে, তাকে
 খুঁজে বার করতে হবে।

লোকসংস্রান সম্পর্কে অবেকটা কথা শটে করে নিতে হবে। ছড় প্রাণ নন বিজ্ঞান
 আনন্দ চিত্ত এবং সং—এই সাতটি তব দিয়ে সাতটি লোক। প্রথম তিনটি লোক নিয়ে
 অপরাধ। তার মাঝে তবগুলির কে-পরিচয় আমরা পাই তা অবিস্তৃত। কিন্তু তাদের
 শুদ্ধরূপও আছে। শুদ্ধ দেহ প্রাণ নবের পিছনেই আছে শুদ্ধ দেহ প্রাণ নন। তাই
 হল শুদ্ধ, বার মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশের বাধা নাই। তখন প্রকৃতিক বলা হয় পরা-প্রকৃতি।
 তার সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক বিবেকের নয়, সাবুজের। অবিস্তৃত প্রকৃতি হল অপরা-প্রকৃতি,
 তারই সঙ্গে পুরুষের মত বিরোধ। অপরাধের উর্ধ্বে আর অবিস্তৃতি নাই, আনন্দ-আনন্দের
 স্বয়ং নাই—আছে শুধু আলোর খেলা। অপরাধেরও যে পুরুষ-প্রকৃতির শুদ্ধ সম্পর্ক সম্ভব,
 তা যোগ্যতার জন্য উপনিষদে আছে বিস্তৃত অগ্নির প্রাণের নবোদয় পুরুষের কথা।

২০

অপরাধের ত্রিপুরা

দেখান, লোকসংস্রানের আধিতে জুলোক অস্তে সত্যলোক। প্রথম তিনটি লোক
 নিয়ে অপরাধ, পরের তিনটিতে পরাধ। প্রাকৃত চৈতন্য অপরাধকেই চেনে, পরাধ তার
 কাছে রহস্য। অপরাধে তিনটি তবের প্রকাশ—অড় প্রাণ আর নন। অড় চৈতন্যবৃত্ত
 হল হয় দেহ। সেহকে আশ্রয় করে ফোটে প্রাণ আর নন। চৈতন্য তিনটিতেই অনুসৃত
 বলে তাদের ক্রিয়াও গুতপ্রাপ্ত।

দেহ-প্রাণ-নবের সবচায়ে জীব। জীবের মধ্যে মানুষের মাঝে দেখা দিয়েছে নবের
 উৎকর্ষ। এই উৎকর্ষ সূচিত হয় দুটি ব্যাপারে—কল্পনায় আর অহং-চৈতন্য। কল্পনায়
 অতীন্দ্రిয় বোধের প্রথম উদ্বেগ। ইন্দ্రిয়বোধ সব জীবেরই আছে, তার সংস্কারও তাদের
 মাঝে উৎপন্ন হয়; কিন্তু ইন্দ্రిয়সংযোগ থেকে আচ্ছিন্ন করে বোধকে জীবের মত ভিতরে
 কুটিরে ভোনার সাবর্থা দেখা দিয়েছে মানুষের। এই অতীন্দ্రిয় বোধ থেকে দেখা দেয়
 সাবান্যজ্ঞান (*conceptional knowledge*)। সাবান্যজ্ঞান সবরকম বৈজ্ঞানিক
 জ্ঞানভার ভিত্তি। বিজ্ঞান বাহ্যপ্রকৃতিকে বলে আনবার সাধনায় নিবৃত্ত।

২০

বাহ্যপ্রকৃতির বাস্তব সার্থকতা অস্তরের মধ্যে। বাইরের মাধ্যমে তিষ্ঠিব্যাকে (will to live) আশ্রয় করে অস্তরে ভাগে স্বশব্দে ইচ্ছা-বোধ প্রকৃতির দৃশ্য। স্বশব্দে ক্রমে সংঘত হয় অহংচেতনায়। এটি স্থলটি হয় মানুষের নাকে। মানুষই প্রকৃতির সামনে ধাঁড়িয়ে বলতে পারে 'অহংহং ভোঃ'। কল্পনা যেমন ইন্দ্রিয়সৌখ্য থেকে আচ্ছিন্ন হয়ে বাহ্যপ্রকৃতির উপরে অধিকার বিস্তার করে, অহংচেতনাও তেমনী জীবের জীবনযোনি-প্রবাহ (life-function) হতে আচ্ছিন্ন হয়ে অস্তঃপ্রকৃতির প্রভু হতে পারে। অস্তঃপ্রকৃতির উপরে প্রভুত্ব এবং তার উৎকর্ষ সাধনই হল অধ্যাক্ষভাবনার লক্ষ্য। অধ্যাক্ষভাবনার বৌদ্ধিক রূপ হল মর্শন। বিজ্ঞান আর মর্শন দুয়ের সমাহারে মানুষের চিৎপ্রকর্ষের সাধনার সার্থকতা।

বিজ্ঞান জোর দেয় বস্তুর উপর, মর্শন ভাবের উপর। বস্তু ছাড়া ভাব পাঁজাতে পারে না গতা, কিন্তু বস্তুতে ভাবের অনুপ্রবেশেই বস্তু সার্থক হয়। সেহ যাচ্ছে বলেই চৈতন্য আছে বানানব; কিন্তু চৈতন্য যদি সেহের ঈশ্বর না হতে পারে, তাহলে? জিভীব্যাবার সার্থকতা হস্তাঃ চিৎপ্রকর্ষে, তার ব্লাধার যা-ই দক না কেন। অধ্যাক্ষভাবনার অপরিণীত দ্ব্য এইখানে।

অধ্যাক্ষভাবনার প্রথম সূচনা মানুষের স্বর্ষবোধে। স্বর্ষবোধের আধিনরূপে অনেক মুক্তা আছে। কিন্তু তার মূল হল চেতনার স্বোত্তরণ (self-transcendence)। অহংচেতনার নাখেই তার প্রথম উদেঘ। বীজ যেমন বনম্পতিতে বিস্ফারিত হতে চায়, তেমনি অহং বিস্ফারিত হতে চায় ব্রহ্মে বা বৃহত্তের চেতনায়। এই আধবিস্ফারণের প্রথম আশ্রয় হয় বস্তু। নিরত্মুপ ভোগ আর ঐশ্বর্য তখন মানুষের পুরুষার্থ। মানিকতা ভোগৈশ্বর্য সে আধস্ত করে লৌকিক উপায়ে। লৌকিক উপায় যেখানে ব্যর্থ হত, সেখানে সে ধরে অলৌকিকের পথ। তার বিশ্বাস, নিরত্মুপ ভোগৈশ্বর্য কোথাও আছে—আছে সেনলোকে। ত্ত্ব হয় সেবস্তার উপাসনা—যা সকলধর্মেরই গোড়ার কথা। তারও মূলে ঐ একই ব্যাপার : সেবস্তাকে বা সেবকল্পনাকে ধরে আধবিস্ফারণ।

এই নখে কারও-কারও চেতনা অস্তরাবৃত্ত হয়ে সেখে, কোনও বাইরের নিবিত্তকে আশ্রয় না করেও আধবিস্ফারণ সম্ভব। সেবস্তা বাইরে মন, আধিই সেবস্তা। এই পরিভ্রম রূপ হল 'অয়নায়া ব্রহ্ম'। এ-বোধের স্বরূপ হল আধচৈতন্যের অনন্তে বিস্ফারণ। আকাশের বস্ত যা কোনও-কিছুর আশ্রিত নয়, তা-ই অনন্ত; এবং একই কারণে তা অন্ত। আকাশও তেমনি অনন্ত এবং অন্ত।

আশ্রা অন্ত—এই নিগূঢ় মর্শনকে আশ্রয় করে সব ধর্মেই নানা কল্পনা আছে—আছে জীবের উৎকৃষ্ট লোকান্তর সন্মাত্তর ইত্যাদির শ্রুত। তা নিয়ে বিচার করবার আনাদের এখন কোনও প্রয়োজন নাই। এইখানেই এই আধারে থেকেই অহংচেতনাকে বা আধ-বোধকে কি করে ব্রহ্মবোধে বিস্ফারিত করা যায়, এখন আনাদের তা-ই দেখতে হবে।

লোক-সংস্থানের কথা তাতে আসবে, কিন্তু আসবে বাইরের সত্তা হয়ে নহে—অন্তরের সত্তা অনুভবের সত্তা হয়ে। চেতনার প্রকর্ষের দ্বারা এই পিও ব্রহ্মাণ্ডের অনুভব হবে আমাদের সাধ্য।

*

*

*

চিৎপ্রকর্ষের ধাপ আছে। উপনিষদে পাই পাঁচটি কোশে পাঁচটি পুরুষের কথা : অনুবর প্রাণবর মনোবর বিজ্ঞানবর আর আনন্দবর পুরুষ। কোশগুলি চেতন্যের আধার বা প্রকৃতি। যেমন পিওকোশ আছে, তেমন আছে ব্রহ্মাণ্ডকোশ। একটিকে বলা যায় ভূমি, আরেকটিকে লোক—একথা আগেই বলেছি। চিৎপ্রকর্ষ দুই উপায়ে ঘটে—ভূমি হতে লোকে ব্যাটী হতে সমষ্টিতে ছড়িয়ে পড়ে, আবার এক ভূমি হতে আরেক ভূমিতে এক লোক হতে আরেক লোকে উত্তীর্ণ হয়ে। চরম লোক সত্যলোক, উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে হিরণ্যম পরম কোশ যাতে আছেন 'বিরম্ভো ব্রহ্ম নিকলন্'। অনুবর চেতনার ভূমি হতে আবারের পৌঁছতে হবে তাঁর মাঝে।

অনুবর কোশে চেতনার প্রধান উদ্দেশ্য—যেমন পিও, তেমন ব্রহ্মাণ্ডে। আবার যাকে নিম্নাণ ভড় বনি, তারও মাঝে চেতনা অনুসৃত আছে—বেদের ভাষায় 'তুতপতি' বা নিত্যবিন্দা শক্তি হয়ে। সমস্ত কোশেই চেতনা সমভাবে অনুসৃত বলে তারা ওতপ্রোত। স্তম্ভাঃ অনুবর কোশেও প্রাণ ও মন অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে, কিন্তু অনু বা ভড়ের অধীন হয়ে। প্রাকৃত অনুবর পুরুষের মাঝে তার পরিচয় পাই। সে একান্তভাবে দেহাসক্ত, তনুসচ্ছনু, মূঢ়। তার জীবন বহুনাশে প্রতানুগতিকতা এবং দুঃস্বপ্নের জীবন। এর বোধ কাটিয়ে ওঠা তার পক্ষে বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠিন।

কিন্তু চেতন্যের মাঝে প্রকৃতির উর্ধ্বপরিণামের একটা প্রেরণা নিহিত আছে, বৈদিক ঋষিরা যাকে তুতনা করতেন অগ্নিশিখার সঙ্গে। কাঠের মাঝে আগুন নিগুঢ় হয়ে আছে; নহলে যখন তা প্রকাশ পায়, তখন তার শিখা স্বভাবতই উজ্জ্বল হয় অগ্নিতোর পানে যা তাপ ও আলোর উৎস। অনুবর পুরুষেরও তেমন একটা প্রবণতা আছে প্রাণলোক হতে আরও তাপ এবং মনোলোক হতে আরও আলো আহরণ করার দিকে।

কিন্তু ভড়ের আনরণ সমস্তে বুঝতে চায় না। অনুবর পুরুষ প্রাণোচ্ছল এবং বনদ্বী হরেও বিভক্ত প্রাণলোক ও মনোলোকের সম্মান পায় না—বিনা যোগে। যোগ হচ্ছে চেতন্যের স্বাতন্ত্র্য উত্তরণ এবং সম্ভারনের স্বাভাবিক শক্তি। আবার যতকণ অযোগী ততকণ অপরা প্রকৃতির বশ। তারও মাঝে উর্ধ্বারনের বেগ আছে, কিন্তু তা বহর—ঘাটে-ঘাটে খেমে-খেমে পাক দিয়ে-দিয়ে সে উপরপানে উঠে যায়।

এই বেগকে কিণু এবং ষ্ণু করা যায় যোগে। যোগের প্রধান সাধনাই হল অস্ত্রাবৃদ্ধি এবং বিবেক। দেহচেতনার ভড়িয়ে যাছি, চিত্ত কেবল বাইরে ছুটছে। শক্তির ক্রিয়া হচ্ছে কেন্দ্রাতিগ। তার বোড় কিরিয়ে দেহেরই মাঝে কোনও একটা কেন্দ্রে—যেমন

ক্ষমের—প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কেজানুণ শক্তি স্বভাবত তখন পট্টিবৃত্তি চতে বিবিক্ত হয়ে পড়বে। তাকে ধরে রাখতে পারলে ক্রমে সেখা যাবে স্বেচ্ছচেতনার খাতারে আরেকটা চেতনা সেখা দিয়েছে থাকে বলতে পারি শাস আর সেহটা জান যোগা। ই শাসটি হল অনুর পুরুষের অন্তরে প্রাণের পুরুষ, যিনি অনুর পুরুষের প্রাণাণ বা দেহ। বিবেক থেকে শক্তি ছাড়ে, প্রাণের পুরুষের সাক্ষ্য প্রশাসনে তখন অনুর কোশের ক্রিয়াকে পতি-চালিত করা সম্ভব হয়। কায়দশ্য (sublimation of the physical being) এবং বিজ্ঞ প্রাণবোধের সংস্পর্শ হেতু অন্যান্য সিদ্ধিও আবির্ভাব হয় আধারে। চেতনার সম্ভার্যেণে বিশ্বপ্রাণ এবং তার বিভূতির অপরাধ অনুভবও যোগীর আয়ত্তে আসে।

এনি করে আরও ভিতরে ঢুকে গিয়ে প্রাণের পুরুষের অন্তরে আবিষ্কার করা যায় বনোনের পুরুষকে। উপনিষদে তাঁকে বলা হয়েছে 'প্রাণ-পরীক্ষ-নেতা'। এই পুরুষকে অধিগত করার ফলশ্রুতিও পূর্ণানুভূতি—বনোনের পুরুষ প্রথমত প্রাণের আর অনুর পুরুষের উপস্থিতি এবং অনুর, তারপর তার ভর্তা এবং ভোক্তা। সেহ আর প্রাণের ক্রিয়া তখন তার স্বপ্নে, উপরত তার স্নায়ুচেতনার সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মের বিচিত্র ভরসের আশোচন।

এনি করে আধারে এই তিনটি পুরুষের প্রস্তুতিতে প্রজ্ঞা এবং শক্তির অধিকার ব্যাপ্ত হয় সত্ত্বোক্তের অপরাধে বা ত্রৈলোক্যে। কিন্তু এইখানেই উত্তরণের শেষ নয়।

১১

স্বোত্তরণের সোপান

অপর্যায় চতে যেতে হবে পরার্থে, অনু-প্রাণ-বনোনের প্রাকৃত পুরুষকে চতে হবে বিজ্ঞানানন্দ-চিন্ময় দিবা পুরুষ। যেতে হবে অন্তরাবৃত্তি এবং বিরোধের পথ ধরে। তার পর উর্ধ্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আবার নেনে আসতে হবে অপরভূমিতে, ওখানকার আনন্দ জ্যোতি এবং শক্তিকে নানিরে আনতে হবে। অপরাধে এবং পরার্থে অনুভূত আছে একই চেতনা, স্তম্ভাঃ দুয়ের মাঝে স্বরূপের ভেদ নাই। তাইতে অপরাধে-পরার্থে আনাগোনারও স্বভাব কোনও বাধা নাই। পরার্থে বা এক এবং সবরস, অপরাধে তাই নত এবং বিচিত্র। এই বৈচিত্র্য একেরই স্বগতভেদের উদ্ভাস—যেমন একই সেহের অক-প্রত্যয়, একট প্রাণ বা বনের মাঝে বৃত্তির ভেদ। এখানকার ভেদ ওখানকার অভেদকেই আরও উচ্চন এবং নিবিড়ভাবে আশ্বাস করবার সাধনমাত্র।

পরার্থের চেতনা অসীম, অপরাধের চেতনা আগাত সসীম। কিন্তু এই সসীমের মাঝেই রয়েছে অসীমের আকৃতি। অন্যত প্রজ্ঞা আনন্দ এবং শক্তির একটি অভাস এই প্রাকৃত চেতনাতেও ফোটে, যখন সে অন্তরাবৃত্ত হয়। অভাসযোগের দ্বারা সে-অভাসকে

প্রত্যক্ষ উপস্থাপিত করাও যায়। পরার্থ-চেতনার অচল প্রতিষ্ঠাও সাধকের পক্ষে অসম্ভব নয়, যদিও তা অসামান্য। কিন্তু সেহে প্রাণে মনে এবং বাহ্যারে সত্তা চৈতন্য এবং আনন্দকে উল্লসিত করা আরও অসামান্য, যদিও তা-ই আমাদের পরম পুরুষার্থ। কি করে তা সিদ্ধহতে পারে তা বোধবার জন্য লোক বা ভূমির পরম্পরাকে ত্রিযাযোণের দিক আরও থেকে তলিয়ে দেখা দরকার।

*

*

*

চৈতন্যই বিশ্বমূল তত্ত্ব—অধ্যাত্মসাধনার এই হল প্রধান স্বীকার। একই চৈতন্য, কিন্তু আরতনভেদে তার প্রকাশ এবং প্রবৃত্তির ভঙ্গি হর স্বতন্ত্র। চৈতন্য পুরুষ আর আরতন (medium) প্রকৃতি। সত্তার আদি হতে অস্ত্য পর্যন্ত পুরুষ আর প্রকৃতি স্বগুনত্ব হয়ে আছে, একথা আগেই বলেছি। একটি আরতন হতে আরেকটি আরতন উদ্ভূত হতে বলে পুরুষকে প্রধান প্রকৃতি হতে বিবিক্ত হয়ে তারপর আত্মস্বাতন্ত্র্যের সাবলীনতায় প্রকৃতিকে অধিকার করতে হয়—এই হল সাধনার মূলমন্ত্র।

চৈতন্যের প্রধান ব্রিতি জড়ের আরতন। বিশ্বচৈতন্য বিশ্বজড়ে তখন নিগূহিত। অনুভব ভন্যাসচ্ছন্দ, সর্বত্র এক নিবিড় অচ্ছকার, কিন্তু স্রুও তা নিশ্পন্ন নয়। বাষ্ট্রী আধারে এই তমসাসচ্ছন্দ পুরুষই হন অনুবর পুরুষ। তাঁর ভুবনে অগ্নি বা জড় হল মূল তত্ত্ব। প্রাণ আর মনের উন্মেষ তার মাঝে হয়েছে—একান্তই জড়ের বশীভূত হয়ে। জড় প্রাণ আর মন ত্রিনেব মাঝে চৈতন্যের প্রকাশের তারতন্য আছে। জড়ে চৈতন্য হুমুগ্ধ, প্রাণে স্বপ্নাবিষ্ট, মনে জাগ্রৎ। কিন্তু অনুবর ভুবনে ননকে এবং প্রাণকে কাল করতে হয় জড়নির্ভর হয়ে। তাইতে দেহাশ্রিত নাড়ীতন্ত্র (nervous system) এবং ইন্দ্রিয়সংবিৎ হয় মনের প্রবৃত্তির (function) সাধন। স্বতরাং অনুবর পুরুষের প্রকৃত পরিচয় পাই দেহাসক্ত ইন্দ্রিয়নির্ভর মানুষ্যের জীবনে, যার মাঝে অধ্যাত্মচেতনার প্রকাশ যদি বা কখনও হয়, তা হয় নৃচ কীর্ণ এবং গতানুগতিক।

এই অনুবর পুরুষেরও একটা জীবন-এবং জগৎ-বর্ণন আছে। তাঁর কাছে, উপনিষদের ভাষায় 'অনুই ব্রহ্ম' অর্থাৎ জড়ই বিশ্বমূল তত্ত্ব। সগীমের উৎস অগীনে—বর্ণনের এই অভ্যুপ-পনকে (postulate) তিনিও মানেন; কিন্তু তাঁর কাছে অগীন চিন্ময় নয়, নিত্যতাই সূক্ষ্ম। যেহেতু উপরেই বর্ণন প্রাণ আর মনের নির্ভর, তখন জীবন জগৎ আর বৃত্তার বহনীরতেই গীর্ণিত। যে নিশ্চেতন অবাক্সের আনন্দ্য হতে জীব এখানে এসেছিল, বৃত্তাতে আবার সে তারই মাঝে কিহে রাখে।

কিন্তু এই অনুবর পুরুষের মাঝেও কখনও কখনও স্বোত্তরণের (Self-transcendence) পিপাসা থাকে। নৃচ দেহচেতনার চাইতে জীবন্ত ও জাগ্রৎ বনশ্চেতনার উৎকর্ষ তিনি বুঝতে পারেন এবং যৌগিক উপারে তাঁর আরও উৎকর্ষসাধনে তৎপর হন। ক্রমে তাঁর মনে লোকোত্তরের আলো এসে পড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রেও জড়বের প্রাচীন সংস্কার তাঁকে

ছেড়ে যায় না। একদিন চৈতন্যকে ছাড়ের উপসর্গ (by-product) মনে করে তিনি মূরের মাঝে একটা বিভাজনের রেখা টেনেছিলেন। আর চৈতন্যের উপর থোকা পড়লেও সেই ডেমগুড়িই তাঁকে এখন বিপরীতমুখে ঠেলে দেয় : তিনি প্রাণকে আর মনকে ভাবতে শুরু করেন ছাড়ের বিরোধী তব এবং ছড়কে প্রত্যাখ্যান করে ওদের দিকেই ঝুঁকে পড়েন। তাই তাঁর ধারণা হয়, তাঁর সত্যকার স্বরূপ অপ্রাণিক এবং ছড়োত্তর, বিভক্ত প্রাণ বা মনের জুনিতে স্থিতিই তাঁর পুরুষাৰ্থ, প্রাণিক জীবন মূঃখের এবং অব্যাহতজীবনের পক্ষে একটা বাধা। জীবনের এই বাধা অনুসরণের চরম ফল হল প্রশ্নবকেই (quiescence) অধ্যাহবিসিদ্ধি চরম বলে মনে করা, যার আরেক নাম জড়সনানি। অবশ্য স্বভাবের নিয়মে তাঁরও মাঝে চিন্ম-বিভূড়ির স্ফুটি হয় ; কিন্তু তিনি তাকে আনল দেন না। জড়াসক্তি তাঁকে যেন নতুন করে পেয়ে বলে : শিব হতে গিয়ে শক্তির উদ্ভাস আর ভাল লাগে না, ভাল লাগে নব হয়ে যাওয়া।

*

*

*

ছাড়ের চাইতে উৎকৃষ্টতর তব হল প্রাণ—যেমন স্বাতন্ত্র্যের স্বত্বকারের উৎকৃষ্টতর পরিধান হল উষার অস্ত্রবিদ্যা। প্রাণের মাঝে চৈতন্যের একটা সহজ স্ফুটি আছে, মূরের মাঝে একটা ওতপ্রোত নিবিড়তার সম্পর্ক। যেখানে চৈতন্য আছে সেখানেই প্রাণ আছে, যেখানে প্রাণ আছে সেখানেই চৈতন্য আছে—এটা আনন্ড ধরে নিতে পারি। বস্তুত জড় প্রাণ চৈতন্য ত্রিনেরই সম্পর্ক ওতপ্রোত। চৈতন্যকে মূল তব মনে আনন্ড ছড়কে বলতে পারি তার প্রকাশের আধার, আর প্রাণকে তার শক্তি। সর্বত্র চৈতন্যের প্রকাশ হচ্ছে কোনও-একটা আধারে শক্তির স্বতঃস্ফূর্তিত। জীবের মাঝে এই ত্রীটির পেলার স্থান্য পরিচয় পাই : তার মাঝে সেখানে পাই সেই প্রাণ ও চৈতন্যের অন্যান্যনির্ভরতা অনুপ্রবেশ এবং সমন্বয়। চৈতন্য বতই ছাড়ের দিকে যাচ্ছে, ততই আনন্ডের দৃষ্টিতে তার প্রকাশ জ্বলিত হয়ে আসছে, যার ফলে সত্তার অবন (lowest) পর্বে তাকে আর আনন্ড মূঃজে পাই না। বলতে পারি, সে তবন অসং (non-existent) নয়, কিন্তু অব্যক্ত। তেননি সত্তার পরম পর্বেও চৈতন্য আনন্ডের কাছে অব্যক্ত। এই দুটি পর্বের মাঝে অভিব্যক্তির যে-মূর্ছনা, তাকে বলতে পারি প্রাণ বা চৈতন্যের শক্তিরূপ। মনে রাখতে হবে, শক্তির যেময় চৈতন্য যেমন নিবিস্ত (efficient cause), জড় তেননি উপাদান (material cause)। অতএব অভিব্যক্তির প্রত্যেক পর্বে জড়ও আছে প্রাণশব্দনের উপবৃত্ত বাহন হয়ে মূল বা সূক্ষ্মরূপে। ছাড়ের সাবলীনতার এই কম্পনা ভারতীয় দর্শনের একটা বৈশিষ্ট্য। এর ফলে জড় প্রাণ আর চৈতন্যের মাঝে বনঃকল্পিত কৃত্রিম ভেদের রেখা মুছে গিয়ে সবটাই একটা অজ্ঞ সত্তার বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টই সবাক্ষানের অনুকূল।

সুতরাং যেমন আনন্ডের এই নিত্যদৃষ্ট জড়লোক, তেননি ভূতাসূক্ষ্মকে উপাদান করে আছে

একটা অদৃষ্ট প্রাণলোক। আনন্দের যেমন এই জড়লোকের তেমন প্রাণলোকেরও বাসিন্দা। উপনিষদের ভাষায়, পুরুষ তখন প্রাণময় পুরুষ। প্রাণময় পুরুষের দুটি রূপ আছে—একটি অপরাধে অবিভক্ত, আরেকটি পরাধে বিভক্ত। অপরাধের অবিভক্ত রূপটি গুণময়, হুতরাঃ তার সাত্বিক রাজসিক আর তামসিক এই তিনটি বিভাব। তামসিক ভাব যেখানে প্রবল, প্রাণময় পুরুষের প্রকৃতি সেখানে রাক্ষসী। প্রাণের একটা সাধারণ নক্ষণ হচ্ছে বুদ্ধি। অপরকে আকর্ষণ করে নিজের উপচয় ঘটানো। রাক্ষসের মাঝে এই বুদ্ধি। মূঢ়, সব-কিছু সে ‘নিজের জন্য রাখে’, দেবতাকে কিছুই দিতে চায় না। আবার রাজসিক ভাব যেখানে প্রবল, প্রাণময় পুরুষের প্রকৃতি সেখানে আত্মীয়। অত্মের মাঝে যেমন বুদ্ধি। আছে, তেমনি আছে শিক্ষাও—যা প্রাণের আরেকটি নক্ষণ। অত্মের প্রবল প্রচণ্ড এবং উচ্চান, অধিকতর সে সেবতার প্রতিশ্রুতি—বৈদিক ঋষির ভাষায় সে কখনও-কখনও সেবতার নুসান-পরা ‘গুহবৃত্ত’। আবার সাত্বিক ভাব যেখানে প্রবল, প্রাণময় পুরুষের প্রকৃতি সেখানে দৈবী (godlike, কিন্তু দিবা বা divine নয়)। পরাধের প্রাণের আলো-কে সে সচলভাবে স্বীকার করে, নিজের মাঝে তাকে ফুটিয়েও তোলে; কিন্তু তবুও ছায়ার নামা হতে সে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পায় না। হয় তখন সত্বের মাঝে রজস্তনের খাঁস বেশানো থাকে, নয়তো গুহসত্বের অবিভাব হলেও তা স্বামী বা স্বভাবগত হয় না।

পরার্থের প্রাণের স্বরূপ হল চিত্ত-তপস্বী বা ব্রহ্মের চিন্ময় তপঃশক্তি। পরার্থ অপরাধকে আবিষ্ট করে রয়েছে, হুতরাঃ অপরাধেও এই তপঃশক্তি প্রাণের সকল লীনাতেই অল্পা-বিক পদ্মিনী প্রকাশ পায়। তপস্যার শক্তি সংহত হওয়ার তার বেধ আর সামর্থ্য বাড়়ে। প্রাণের প্রেরণায় রাক্ষস অস্তর আর সেবানব সবাই নিজের ইষ্টমিচ্ছির জন্য তপস্যায় লেগে যায়। যোগ-যার ইষ্ট নিরূপিত হয় তার প্রকৃতি অনুসারে। রাক্ষস আর অত্মের তপস্যার পরিণাম কি হয়, আনন্দের পুরাণে তার বর্ণনা চিত্র আছে। মনে রাখতে হবে, এই রাক্ষস আর অত্ম আনন্দের মাঝেও আছে এবং তারাও তপস্যা শুরু করে সময়-সময়।

সেবানবের মাঝে যে প্রাণের তপস্যা তা ব্রহ্মের চৈতন্য এবং আনন্দকে অধিগত করার জন্য। প্রাণময় প্রেরণার স্বভাবতই প্রশনের দিকে তাঁর ঝোক থাকে না—চিন্ময় সন্তোষের বৈচিত্র্য এবং শক্তি উন্মাদই তাঁকে বিশেষ করে তৃপ্তি দেয়। কিন্তু অপরাধের ন্যূনতা তাঁর সাধনা এবং শিক্ষকে জড়িয়ে থাকে বলে বিভক্ত প্রাণময় পুরুষের বৈভব পুরাপুরি তাঁর মাঝে ফুটে উঠতে পারে না।

*

*

*

জড় আর প্রাণের চাইতে বৃহত্তর তত্ত্ব হল মন। তার মাঝে সবগুণের শ্রাণাদ। সবগুণের বিশিষ্ট বর্ণ হল প্রকাশ। এবার অন্ধকার গেল, উষার অরুণিমা স্বলম্বিয়ে উঠল দ্বিগুণমুগ্ধিত। চেতনার যা অংশটি ছিল অংশট হল, যা দেখা বাচ্ছিল না তা দেখা গেল। স্বষ্টীর সঙ্গে মূল হল দুটি। আগেও প্রবৃত্তির আবর্তন ছিল, কেননা প্রকৃতি কখনও নিষ্কিন

ধাকতে পারে না। কিন্তু সে-যাবর্তনের লক্ষ্য সুগোচর ছিল না, এইবার হল। আর তাইতে প্রকাশ এসে প্রবৃত্তির রাস ধরন, তাকে নিয়ে চলন অর্থাৎ নক্সাল গিকে।

এই হল মনোলোকের ছবি। মন দেখছে : যা আছে শুধু তাকেই নয়, যা এখনও হয়নি তাকেও দেখছে। এই হল মনের প্রাতিভঙ্গি, যার জন্য উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে 'দৈবঃ চকুঃ'। এই প্রাতিভঙ্গির বলেই মন ভূত-ভবোর ঈশান। বাস্তি আধারে মনকে আশ্রয় করে কৃটলেন মনোবর পুরুষ, যিনি 'প্রাণ-শরীর-নেত্র'। অনুর পুরুষের অন্তরে প্রাণের পুরুষ, তারও অন্তরে এই মনোবর পুরুষ—সেহ আর প্রাণের অন্তরীণী।

প্রাকৃতভূমিতে মনোবর পুরুষকে আনন্ডা সাধারণত দেখি দেহের জড়র আর প্রাণের চাক্ষুস্যের অধীন। কিন্তু তারই মাঝে তাঁর স্বাতন্ত্র্য যে নানাতাবে কৃটে উঠতে চাইছে, আনন্ডা তাঁর আভাস পাই। বহির্ভূত মন ইন্দ্রিয়নির্ভর হলেও এই মনই আবার অন্তর্ভূত হয়ে ইন্দ্রিয়ান্তির হতে পারে। তখন তার মাঝে কোটে বিবেক সাক্ষির রূপনা সামান্যজ্ঞান প্রাতিভঙ্গিঃ সহবেদন বোঝি ভাবাবেগ ইত্যাদি অনৌকিক ধর্ম। এদের প্রত্যেকটির উপর এই অনু-প্রাণের লোকের উত্তানে। যোগ বা অন্তরাবৃত্ত একাগ্রতার ফলে এদের পত্তি বাড়ি, মনের মাঝে জন্মে কৃটে ওঠে উত্তরানন্য প্রভাসনানন্য বোধিবানন্য এবং অধিবাননের উত্তরজ্যোতিঃ। মানুষ তখন সত্তা সেবানন্য ; আধারের আবেষ্টন থাকলেও তাঁর মাঝে আর আরণ্য নাই তখন। প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মন তখন যেন কাচের ঘর, যার বাইরে-ভিতরে আনন্ডের অব্যাহত গুরুত্ব। অতীন্দ্রিয় সর্বাধিগাহী ভাবনা ও বেদনায় (feeling) মনোবর পুরুষের চেতনা ভাষার তখন।

মন হতে পারে, এই সিদ্ধিই বুদ্ধি আমাদের পুরুষার্থের চরন। কিন্তু তা নয়। মন আমাদের অনেক উঁচুতে নিয়ে গেলেও তার নিছক পত্তিতে সে কখনও পরম পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারে না, পর্যায়ে আভাস তার মাঝে কখনও রূপকং প্রভাস হয়ে ওঠে না। উপনিষদের ভাষায় : সূর্যরশ্মির সাধককে তখন সূর্যমণ্ডলে নিয়ে যায় ; সেখান থেকে তিনি আবার এখানে ফিরে আসেন, কিংবা সূর্যহার ভেদ করে চলে গেলে আর ফিরে আসেন না। সুতরাং লোকোত্তরে পৌঁছে সেখানকার রূপকং জ্যোতিঃ-পত্তিকে আবার এখানে নানিয়ে আনা মনের সাধা নয়। সারথীর এই সৈন্য ছাড়া মনের মাঝে আছে তার স্বভাবগত ভেদভাবনার সংস্কার। মন কে-কোনও একটা ভাবকে একান্ত (exclusive) বেনে সাধনা শুরু করে। সেই ভাবকে আনন্ডো উত্তীর্ণ করে সে যা পায়, তা তার কাছে চরন পাওয়া হলেও সব পাওয়া কখনও নয়। এইজন্য দেখা যায়, সিদ্ধচেতনাও সবসময় একসম্পদসিতা হতে মুক্ত নয়। দৃষ্টির এই সৈন্য থেকে আসে স্বষ্টিরও সৈন্য। তাই মনোনির্ভর সিদ্ধি কখনও রূপায়নের সাধন হতে পারে না। অথচ পূর্বযোগের লক্ষ্য তা-ই।

*

*

*

মন হল অপরাধের শেষ ধাপ। তারও ওপারে পদার্থ। আগেই বলেছি, দুয়ের মাঝে সেতু হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মনের উত্থে। পর্যাধের তরকে স্বভাবগত করতে হলে আশ্রয় করতে হবে বিজ্ঞানকে।

বিজ্ঞান মনের উত্থে থাকলেও মনকে সে জারিত করে বয়েছে। প্রত্যেক উত্থে-উত্থেই এমনি করে নিম্নতরের মাঝে অনুপ্রাণিত হয়ে আছে। ইন্ড্রিয়নির্ভর মনের মাঝে যে অজীভ্রির সামান্যজ্ঞান (conceptual knowledge) আর প্রাতিভাঃবিঃ (intuitive perceptions), তাই হল বিজ্ঞানের ছাটা। এদের আশ্রয় করে যোগের পথ ধরে মন অধিনামদ পর্যন্ত উঠতে পারে—এই হল তার শেষ গীতা। তারপর অতিমানসের অবিকার, বিজ্ঞান যার অনবচ্ছিন্ন স্বরূপপঞ্জি।

মন যদি সবপ্ৰধান, বিজ্ঞান তাহলে শুদ্ধস্ব। তার মাঝে কোনও ভাবনিক আবরণ বা স্বাভাবিক বিকল্পের খাদ নাই। অথচ আছে প্রাকৃতিক্তের বোগগুণে ত্র্যাপত্ত। তমঃ সেখানে স্থিতি এবং রমঃ বীর্ষ। দুইই সর্বের প্রকাশধর্মের দ্বারা অনুবিদ্ধ। ত্তে-ত্তে সেখানে বিরোধ নাই প্রাকৃতিক্তির মত—আছে সান্য। কিন্তু সে-সান্য প্রত্যয়ে পর্যবসান নহ, তা স্বষ্টির উত্থ—যেমন স্থিতিপ্রক্কে মনে (গীতা)। সে-মন সান্যে বিভ, স্বষ্টির বীর্ষে অব্যুহা, প্রজায় তাবর।

বিজ্ঞানের পরিচয় আবার নেওয়া যেতে পারে দেহের দিক থেকে। পুরুষের স্বরূপ যেমন চৈতন্য, তেমনই দেহ প্রকৃতির স্বরূপ। পাঁচটি কোশ নিয়ে তিনটি দেহ। অনুবর কোশ হল স্কুলেড, প্রাণবর আর মনোবর কোশ নিয়ে সূক্ষ্মদেহ, বিজ্ঞানবর আর আনন্দবর কোশ নিয়ে কাঃবদেহ। স্কুলে রূপ, সূক্ষ্মে ভাব, আর কাঃব পঞ্জি। পঞ্জিই ভাব আর জ্ঞপের নিয়ামক। গাঃের যেমন বীজ, বীজের যেমন উৎপন্নপঞ্জি। আনন্দ আর বিজ্ঞান তেমন স্বষ্টির মূলে, জীবনের মূলে। এরা ব্রহ্মের বা অভিস্কৃত ধূঃ চৈতন্যের স্বরূপপঞ্জি।

এই আবারেরই গভীরে কারপক্ষরীয়ে আছেন বিজ্ঞানবর পুরুষ। পর্যাধের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগ, অপরাধের বিভূতির অর্থাৎ দেহ-প্রাণ-মনের তিনি অন্তর্ধানী এবং প্রশাস্তা। আছেন তিনি স্ফাঃ হয়ে। তাঁকে প্রকট করাই হল যোগের ভ্র্যাপর্ষ। প্রকট করতে হবে এইখানে, এই দেহ-প্রাণ-মনের মাঝে।

বিজ্ঞানের প্রকটতায় আনন্দের অভিযাজি। বিজ্ঞান আর আনন্দ ওতপ্রোত। এই পর্যন্ত জীবের উত্তরায়ণের গীতা।

[ত্র্যপ]

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রস্তোত্তর]

প্রশ্ন : (পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি) একটি কথা জানতে চাই যে, অভিনানন্দ শক্তি এখানে সেবে এলে তখন প্রথমে এখানকার কোন কোন জিনিসকে অপ্রয়োজনীয় বলে সরিয়ে দেবে বা দূর ক'রে দিতে চেষ্টা করবে, যাতে বাকী সব প্রয়োজনীয় জিনিস সর্জনস্বত্বভাবে তাদের বখাওয়ানে ফিরে যেতে পারে ? (এই প্রশ্নটি পূর্বে করা হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের ৬৬ সংখ্যার "aphorism" সম্পর্কে, যাতে তিনি বলেছিলেন যে পাপ বলে কিছু নেই, কেবল সব কিছুই স্বানুভূতি ঘটতে প্রকৃত দেখায়। গত ২৪ নভেম্বর ১৯৬১ সংখ্যার "বক্তব্য" পত্রের ৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

উত্তর : কোনো কিছুকে সরিয়ে দেওয়া, দূর করে দেওয়া ? অভিনানন্দ শক্তি এসে কোনো কিছুকে "সরাতে" যাবে কেন ? শ্রীঅরবিন্দ তা জ্ঞা বলেন নি, তিনি শুধু বলেছেন যে সকল কিছুই তার বখাওয়ানে ফিরে যাবে, এই পর্যন্ত।

তবে একটা জিনিস নিশ্চয় দূর হয়ে যাবে, তা হলো এই বিকার, অর্থাৎ সত্যকে আড়ান করে রাখা নিপায়ার আবরণ। যেমন অবস্থা এখন আমরা দেখছি তার সকল কিছুই অন্য এক-মাত্র সেটাই হলো দায়ী। সেই আবরণের পর্যাট বেবনি সরে যাবে এমন সকল কিছুই আবার সম্পূর্ণ অন্য রকমের দেখাবে ; যখনই আমরা এই বর্তমান চেতনা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি তখন যেমন ভাবটি যেন ঠিক সেইরকম দেখাবে। বর্তমান চেতনা থেকে বেরিয়ে যখন তুমি সত্যচেতনার মধ্যে প্রবেশ করো, তখন এমন এক স্থানে গিয়ে পৌঁছও যেখানে আশ্চর্য হয়ে সহজেই ভাবতে থাকো যে দুঃখ দুর্ভোগ আর ভূত্ব প্রভৃতি জিনিসগুলো টুক্রে হয়েছ কেন ক'রে ; চেতনার এ-পার ছেড়ে যখন ঐ পারে গিয়ে ওঠো তখন আশ্চর্য হও এই কারণে যে ওগুলোর কোনো অর্থ নুচ্ছে পাওনা। অবস্থা এমন অনুভবটি তখনই আসতে পারে যখন জগৎটাকে অসম্ভব মনে হবে প্রতীকমান হয়,—কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে অভিনানন্দ চেতনা লাভ করতে জগৎকে অসম্ভব মনে করার কোনো প্রয়োজন নেই,—বস্তুত জগৎ অসম্ভব নয়, কেবল তার বিখ্যাতাই অসম্ভব। অর্থাৎ এই বিখ্যাকে বাদ দিলে দেখা যাবে যে জগতের নিজস্ব বাস্তবতা ঠিকই রয়েছে।

অভিনানন্দ চেতনা এনে তার প্রথম ফলাফল প্রকটই হ্রান হবে, এবং তা হবে ব্যক্তির মধ্যে, কারণ ব্যক্তির ভিতর দিয়েই তার কাজ শুরু হবে।

সেই নবচেতনার অবস্থানটি কারো মধ্যে এসে পড়িলে তা সম্ভবত সর্বকণের জন্যই থাকবে, কিন্তু এখানে আসে একটা প্রশ্ন এসে পড়ছে : এখানকার এই বিকাশমুদ্র তাড়াতাড়ি সঙ্গে সেই বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্ক কেনন দাঁড়াবে ? কারণ একটা ভিনিস আনি নিজেই টের পাচ্ছি ; ঐক্য অবস্থা যখন আমার মধ্যে প্রবলতর হয়ে ওঠে, অর্থাৎ তা এতই প্রবল যে বাইরের সকল কিছু স্বাভাবিকভাবেই তা নাশাৎ করে দিলে, তখন সেই অবস্থার মধ্যে থেকে আনি যে সব কথা বনি তার বিশৃঙ্খলিত ও কেউ বুঝতে পারে না, তাই তখন তাতে কার্যকরীভাবে কিছু সংশ্লিষ্ট হয় না ।

যদি কেবল অল্প একটুখানি অতিমানসের সৃষ্টি হয়ে পৃথিবীর নির্দিষ্ট কোনো একটি কারণকে ক্রিয়াকেন্দ্র করে তার আলোকচ্ছটা কেবল সেখানেই বিকীর্ণ হতে থাকে, তাহলে সে ব্যাপারটা কেননতরো দাঁড়াবে ? আর জাই কি সম্ভব হবে ?...নবন কল্প যাক যে তেমনই একটি কেন্দ্রে অতিমানসের সৃষ্টি হলো, অর্থাৎ তারা আগে জানুই ছিল কিন্তু বিবর্তনের ধাপে উঠে ও প্রকৃত রূপান্তরের ফলে তারা অতিমানস শক্তিকে অভিব্যক্ত করতে সক্ষম হলো ; কিন্তু তাপাশি যেহেতু তাদের উৎপত্তি হয়েছে সাধারণ মানব থেকে সেই হেতু মানবের কিছু জোঁতা তাদের মধ্যে থাকবেই ; এমন কি যখন তাদের সমস্তই রূপান্তরিত হয়ে গেছে, শরীরস্থ যন্ত্রগুলি পর্যন্ত অতিমানস শক্তির কেন্দ্ররূপ হয়েছে, তখনও তাদের মধ্যে মানবের কিছু ছাপ বেগে থাকবে । তারপর পূর্ব ধারার নিয়ম অনুযায়ী তারা আর প্রকৃতির সৃষ্টিকার্যের গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে প্রত্যেক অতিমানসিক পদ্ধতিতে সৃষ্টি করবার গুহ্য তর আবিষ্কার করবে, এবং তার ফলে ওদের দ্বারা এমন বাঁটি অতিমানস সত্তার ও জন্ম নেবে যারা বর্ধা অতিমানস রূপান্তরই বাসিন্দা হবে । কিন্তু এদের সঙ্গে সাধারণ অগণবাসীদের সম্পর্ক কেনন দাঁড়াবে ? এর বদলে সমগ্র প্রকৃতির আয়ুল রূপান্তর, যাতে সমগ্র পৃথিবীতেই অতিমানস সৃষ্টির অবতারণা ঘটে, তা কিরূপে করণনা করা যায় ? সে কথা বলতে পারি না ।

তার জন্য নিশ্চয়ই প্রচুর সময়ের দরকার, হতস্র পরিশ্রম আরও জানি, হয়তো সে অবস্থা আসবে ধাপে ধাপে এবং তরো তরো, এমন সব জিনিস দেখা দিতে থাকবে যার কথা এখনও আমরা জানিনা কিংবা করণনাও করি না, তার দ্বারা পৃথিবীর অবস্থাও রূপান্তর বদলে যেতে থাকবে—অর্থাৎ তা হবে কয়েক সহস্র বছরের ব্যাপার ।

আজো এক সমস্যা এই যে আমাদের এই পার্থিব গোলকে স্থান সহজে যেমন ধারণা রয়েছে তার সম্পর্কে কিন্তু বাবস্থা হবে ? একথা বলছি এখানকার স্থান সম্বন্ধীয় বিচার নিয়ে । (না পরে বলছেন যে স্থানের হিসাবে যেখানে এমন সাপাতোপা নেই সেই অন্যত্র অগণের দিকে চেয়েই কথাটা বলা হয়েছিল) এখানে কি এমন কোনো নির্দিষ্ট স্থানকেন্দ্র বলবে যেখানে ভবিষ্যৎ অতিমানস অগণের প্রথম বীজগুলি রোপিত হবে ? তার পরিকল্পনা জো সম্পষ্টভাবেই এসে গেছে, কিন্তু তা শুধু তাঁর ও চৈতন্যের দিক দিয়ে, পৃথিবীর বর্তমান দায়ব অবস্থার সঙ্গে তার এখনও মিল হচ্ছে না ; অর্থাৎ সে পরিকল্পনা এই অবস্থার ভিত্তিতেই

রচিত হয়েছে। এমন কোনো আদর্শ জনপদ থাকবে যা নাকি দলে এক আদর্শ প্রদেশের কেন্দ্রবিন্দু এবং পাঠকের জগতের সঙ্গে তার যা কিছু আদানপ্রদান ঘটবে তা নিতান্ত বাহ্য ও সীমাবদ্ধভাবে। সেখানে তখন এমন এক শক্তির উপস্থিতি ঘটবে—এ কথা ধারণাতে আনা খুবই সম্ভব—যা সকল সকল বিরুদ্ধ যন্ত্রণাকে ও অশুভ ইচ্ছাকে অন্যায়নে ঠেকাতে পারবে, সেখানে কোনো কিছুর অধিকার প্রবেশ ও বিশৃণু ঘটতে দেবে না। নিতান্ত ভক্তরী অক-
 স্বাভাবিক ভেদন ধারণা অবশ্যই করা যেতে পারে। সামাজিক দৃষ্টির দিক দিয়ে যা সত্যি ও আভ্যন্তরীণ জীবনের দিক দিয়ে এটা বিশেষ সমস্যার কথা নয়। সমস্যা হলো এই যে অভিমানস বেগানে প্রবেশ করেনি তার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে, কেমন করে তার থেকে নানা জিনিসের অস্ত্রপ্রবেশ ও সংশ্লিষ্ট নিষারণ করা যাবে, অর্থাৎ সেই অভিমানসম্মুখ কেন্দ্র আবার যাতে নিরুৎসাহিত হয়ে ফিরে না যায়—এই হলো মধ্যবর্তী কালের প্রশ্ন। বাজা এ ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করেছে তারা কেবল এমন কিছুইই কল্পনা করেছে যা মানুষের অজ্ঞাত, হিবানসের অতল গভীর খালের নতো এমন কোনো অগম্য স্থান যার রহস্য জগতের কেউই জানেনা। কিন্তু এ কোনো সমাধান হলো না, একেবারেই নয়।

না, ওর একমাত্র সমাধান হবে কোনো গুহাশক্তি, কিন্তু তা কার্যকরী হবার আগে চাই অশুভ জনকদের ব্যক্তির পক্ষে উপলব্ধির চূড়ান্ত গিরে পৌঁছনো। তা যখন হবে তখন এমন কোনো স্থানের সম্বন্ধ ধারণা করা যেতে পারবে যা এই বাহ্য জগতের মধ্যেই পৃথক-
 রূপে অবস্থান করছে (এবং তার মধ্যে হাইরের কোনো সংশ্লিষ্ট ঘটতে দেবে না), আর সেখানে যথাযথরূপে পূর্ণ সত্যপ্রকাশ একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যেতে পারবে। তার সকল বস্তু ও সকল মানুষ ও সকল কাজই থাকবে আপন আপন যথাযোগ্য স্থানে—সমস্তই চলতে থাকবে উপরের দিকে অগ্রসর হয়ে এবং নীচের দিকে না বেনে (অর্থাৎ সাধারণ জীবনে যা হয়ে থাকে তেমন নয়)। অবশ্য বিশেষ এক ধরনের পূর্ণতা এবং ঐক্য সেখানে থাকবেই, পূর্ণ প্রকৃতির নানাতরুণ বৈচিত্র্য সবই সেখানে অভিব্যক্ত হতে পারবে, তাতে প্রতিভাত হবে এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ও ভ্রমসত্যি আর এমন এক শক্তি আবির্ভূত হবে যা প্রকৃতির সকল ক্রিয়াকেই শাসনের মধ্যে রাখতে পারে। ধরো যদি তাকে কোনো ধ্বংসশক্তি দিয়ে কোনে তবুও তা কার্যকরী হতে পারবে না, তার বস্তুবদ্ধ তার মধ্যেই থাকবে। কিন্তু এর জন্য চাই ঐ বিশেষ কয়েকজনের পূর্ণপরিণতি, তাইই এক্স জিনিসের স্থাপনা করতে পারবে।

(নীরব থেকে)

বস্তুত কেউই বলতে পারে না যে প্রথম মানুষ কেমনভাবে গড়ে উঠেছিল, প্রথম মনের উপলব্ধি কেমন ক'রে এসেছিল। কেউই জানেনা যে সেই অভ্যুত্থান পৃথক পৃথক ব্যক্তির ভিতর দিয়ে ঘটেছিল কিংবা এক একটা দলগতভাবে ঘটেছিল, বহু মনের মধ্যে ঘটেছিল বা একটির মধ্যে ঘটেছিল। আনি তা জানি না। কিন্তু এবার যে অভিমানসের স্বর্গ আসছে তাতে পূর্বদ্বারার সঙ্গে একটা মিল থাকতে পারে। এমনও কল্পনা করা যায় যে কোনো

এক ব্যক্তিবিশেষ এসে হিমাচলেন নির্ভম নিভূতে কিংবা জনহীন অরণ্যের মধ্যে নিজের চারি পাশে জোটে এক অতিমানস ভগৎ গড়ে তুললে। এমন করুণা করা কঠিন নয়। কিন্তু তার জন্য সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে এমন পূর্ণশক্তি আসা দরকার যাতে সে আপনা হতেই সকল রকমের অবাস্তব অনুপ্রবেশকে নিবারণ করতে পারে, অর্থাৎ কোনো বিভ্রাট বা বিভ্রান্তির প্রভাবকে সেখানে সে চুকতেই দেবে না।

এমন অনেক গল্প শোনা যায় যে কেউ কেউ কোনোখানে থেকে নিজের এক আদর্শ নিঃসঙ্গতার মধ্যে অবস্থান করছে। এটা ধারণা করা অসম্ভব নয়। যদি তুমি উচ্চশক্তির সংস্পর্শ পেয়ে যাও তাহলে ঐভাবে অবস্থান করা তোমার পক্ষে হেলেনেবার মতোই সহজ হবে; এমন কি সে অবস্থায় থেকে তুমি অগত্রে কিছু পরিবর্তনও আনতে পারো। অতিমানস জ্যোতির বহ্নিভরঙ্গকে আশেপাশে সজ্জরিত করতে পারো। এগুলি সবই সম্ভব, কিন্তু তা হবে ব্যক্তিগত ক্রিয়া। কিন্তু তার বদলে যদি সে কাজ এমনভাবে হয় যেমন এখানে হচ্ছে, যদি সেই ব্যক্তিকে এমনি এলোমনো পরিবেশের মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়, তাহলেই মুশকিল হয়ে পড়ে। এর থেকেই তো বোঝা যাবে যে তার মধ্যে পূর্ণ উপলব্ধি আনা কতখানি অসম্ভব! কোনো বিভ্রম বনবাসী সাধকের সিঁড়িলাত থেকে প্রমাণ হয় না যে অবশিষ্ট মানব-জাতি তাকে অনুসরণ করতে পারবে; তার চেয়ে এখানে যে কাজ হচ্ছে তাতে ওর চেয়ে অনেক বেশী আলোকসন্ধান করা হচ্ছে। এটাই দরকার, আর যোগসমন্বয়ে তা সম্পূর্ণও হবে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে এই যে তা কি ঐক্লপ সিঁড়ি আসার আগেই ঘটবে, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি-বিশেষের পূর্ণ অতিমানসপ্রাপ্তির আগেই হতে শুরু করবে? ব্যক্তিসিঁড়ি নাহয় অপেক্ষাকৃত বাহ্য ও সংস্কার, কারণ তা সহ্যরই একটা স্বল্পপাত্র, অভিব্যক্তির একটা হ্রাঁপ যাতে আপু-বীক্ষণিক দ্রুত তরঙ্গ নাহয় স্পষ্ট হতে পারে। তার চেয়ে দলগত গুচ্ছ বা উপলব্ধি নিঃসৃতই হবে অনেক পরিপক্ব ও পাকা রকমের।

সহজ ক্রিয়ার হিসাবে দেখলে দুই জিনিসের মধ্যে তুলনাই হয় না।

(নীরব থেকে)

প্ৰগতি থেকেই গেল। বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেই আগে সিঁড়িলাত ক'রে তার পরে অগতের সংস্পর্শে নেন এসেছেন; এটা বুঝই সহজ। কিন্তু আমি যে জিনিসের সম্বন্ধে বলছি, অর্থাৎ সামগ্রিক গুচ্ছ, সে জিনিস আনতে হলে বরাবরই অগতের সংস্পর্শে নেগে থাকা কি অনিবার্য নয়?*

* Bulletin of S. A. I. C. E. থেকে। অনুবাদ—পদ্মশ্রী ভট্টাচার্য

মহামানবের সাগরতীরে

(ঐশ্বরকিষ্ণ অবলম্বনে)

সমগ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(৭)

গেল যাবে আনন্দের নৈমিক সংহিতা-মুগ্ধের রাজনীতি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করেছি। এবারে তার পরবর্তী যুগ, অর্থাৎ কৈ-কালের কিছু কিছু ধরন নিয়ে গেছে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে, সে বিষয়ে দু'একটা কথা বলব।

ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ্ প্রায় একই সময়ের লেখা বলে মনে হয়, কারণ তাদের বিশেষ পার্থক্য নেই। অন্ততঃ পক্ষে বৃহস্পতিয়ক, ছানোগা ইত্যাদি প্রাচীন উপনিষদ্ এবং শতপথ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষা প্রায় একই, যদিও শেষের দিকে, যেমন কঠ উপনিষদে, ভাষাটা অনেক সহজ হয়ে আসছে আমাদের কাছে, ব্যাকরণ শব্দরূপ অনেকটা নবোদারভীত বলা যায়। প্রাচীন উপনিষদে যে সব বড় বড় ঋষিদের নাম পাওয়া যায়, যেমন যজ্ঞবল্ক্য, উদালক আরুণি, জনকরাজা ইত্যাদি, শতপথব্রাহ্মণেও তাঁদের উল্লেখ আছে, এমন ভাবে যাতে মনে হয় সবাই তাঁদের চেনে।

যেমন, একটা মজার গল্প আছে শতপথে, ছানোগা বৃহস্পতিয়কের যজ্ঞবল্ক্যের বিষয়ে। প্রশ্ন উঠল (শতপথ ৩।১।২।২১) যজ্ঞ করতে বলে দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে গরুর মাংস চলাতে পারে কি না। অনেকেই বোধ হয় জানেন বৈদিক যুগে গরুর মাংস খেলে জাহান্নামে যাবার ব্যবস্থা ছিল না। কারণ মাঠের কচি ঘাস তখন ভেঁসল দু'হুঁলা হয়ে ওঠে নি, জন্তু-জানোয়াররা খেত ভাল, গরুরাও গায়ে বেশ গন্ধি লাগত নিশ্চয় আজকালকার বিলিতি গরুর মতন; তাছাড়া যজ্ঞে পশুবলি তো হরদর হতো—তখনও বৃহস্পতির তুষ্টি স্বর্গে—জন্তুএব গরুর মাংসতে কি আপত্তি থাকতে পারে? বাই হোক, কি খেঁয়াল হল জানি না, ব্রাহ্মণের কোনো এক নাম না করা ঋষি বলে বসলেন দীক্ষা নিয়ে অন্ততঃ গরুরা না খেলেই ভাল। কিন্তু যজ্ঞবল্ক্যের সেখি ভাতে বেজায় আপত্তি। তিনি বললেন, ব্রাহ্মণের ভাষায়, “অশ্বানি এব অহঃ, অংসলং চেৎ ভবতি,”—আনি কিন্তু দিবিা খেয়ে যাই, তবে কিনা মাংসটা যদি বেশ নরম হয়। যজ্ঞবল্ক্য চিরদিনই হালিক লোক, উপনিষদে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে।

যাই হোক, আপাততঃ বক্তব্য এই যে উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ প্রায় একই সময়ের লেখা, যদিও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। উপনিষদ্ হলো গুপ্তত্ব, যা গুরু "কাছে বসে" আদৃত করতে হয়। ব্রাহ্মণের বিধবনস্ব ও "ব্রহ্ম", কিন্তু এ ব্রহ্ম উপনিষদের "সর্বঃ পশু ইন্দ্ৰঃ ব্রহ্ম" নয়। ব্রহ্ম কথানি একটি প্রধান মানে বেদে "বহু", ব্রাহ্মণ হলো সেই মস্তের ব্যাখ্যা। ঠিক সামান্যচার্যের মতন ব্যাখ্যা নয়। নানা যজ্ঞে যে-সব বৈদিক মন্ত্র চলে আসছে শুধু সেইগুলো গম্ভীরে বানিকী আনোচ্চনা। কেন মন্ত্রটা ব্যবহার হয়, কি তার তাৎপর্য এই নিয়ে, এই কারণেই বোধ হয় ব্রাহ্মণগ্রন্থকে শ্রুতি* বলে বলা হয়।

এ থেকে অবশ্য কেউ যেন না মনে করেন যে উপনিষদ্ পড়ে যেনন ব্রহ্মজ্ঞানের সুবিধে হতে পারে তেমনি ব্রাহ্মণ পড়ে বৈদিক মন্ত্রও বুঝি বা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তা বোটেই নয়। কারণ ব্রাহ্মণ যুগের পণ্ডিতেরা নিজেই জানতেন না মন্ত্রের আসল মানে কি। ততদিনে ভাষার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, লোকের মনবোঝাও বেশ বানিকী বললে গেছে। বেদের ঋষিরা যে যজ্ঞের কথা বলেছেন, যে সব ঠাকুরসেবতার উপাসনা করেছেন, তা ছিল তাঁদের গভীর সাধনার অঙ্গ। সে-সাধনা বচসিন লুপ্তপ্রায়, ভগ্নাবশেষ যা ছিল তা থেকে ব্রাহ্মণ-কারের কমডায় কুলোয়নি মন্ত্রের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করা। তাঁরা প্রচুর অসম্ভাবহার করেছেন নিছক কর্পনার। কোণায় এবং কি ভাবে, সে আলোচনা এখানে করব না, কারণ তা করতে বঙ্গের মহাজ্ঞানীরাও হতাশ হয়ে পড়েন। এ সম্বন্ধে শুধু দু'একটা কথা বলে রাখি, যাতে ব্রাহ্মণকারদের মতিপ্রতি একটু বোঝা যায়।

এটা তাঁরা অবশ্যই বুঝেছিলেন যে যজ্ঞই হলো বেদের প্রাণ। আর এটাও তাঁরা জানতেন যে যজ্ঞ না চলে এক পা চলে না—না মানুষের না দেবতাদের। "সর্বেষাং বৈ এষ ভূতানাং, সর্বেষাং দেবনাং যাক্ষা যৎ যজ্ঞঃ" (মতপথ ১৪।২।১৩।১৪)। কথানি আর একটু তলিয়ে দেখা যাক, ব্রাহ্মণকারের নিজেদের ভাষায়।

প্রথম প্রশ্ন, যজ্ঞ এল কোথা থেকে। উত্তর হচ্ছে, স্বয়ং প্রজাপতি হলেন যজ্ঞের স্রষ্টাকর্তা। বৈদিক মন্ত্রে প্রজাপতির বিশেষ উল্লেখ নেই, তাঁর মাধ্যম্য আছে ব্রহ্মণস্পতি—পরে যিনি দব্যের পিতামহ ব্রহ্মরূপে পরিচিত। প্রজাপতি সেই ব্রহ্মা। উপনিষদে যেনন সেমি, ব্রাহ্মণেও তেমনি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন, "প্রজাপতিঃ অকাষরত, প্রজারয়ে, ভূয়ান্ স্যাং ইতি" (৫।৩২)। অর্থাৎ (লৌকিক ভাষায়) প্রজাপতির আর একলা একলা ভাল লাগছে না, তাঁর বেয়াল হলো প্রজা স্রষ্টা করবো, "বহু" হব। তাই থেকে স্রষ্টার উৎপত্তি। তিনি ক্রমে ক্রমে অনেক কিছু স্রষ্টা করলেন—পৃথিবী, অগ্নিরিক, ঘোঁ (একটা লক্ষ্য করবার বিষয় পৃথিবীর নাম নিষ্টের একেবারে গোড়ার কারণ তারনও

* এহ যাক! যে মন্ত্রের ঋষিরা যদিও গুরুত্বপূর্ণ একজন—অপৌত্রিকের মতো তা, কোনো মানুষের কর্তৃত্ব কণা তা নয়, তাই আর এক নাম দ্রুতি।—সম্পাদক

যাত্রাবাদনার তেনন চল হয় নি) । তার পরে অগ্নি বায়ু আদি—গন্ধেপ যত্বেদে মানবেদ
(অর্ধ বাদ পড়ে গেল—হরত পদ্য হয় নি)—আকার উকার নকার, যা থেকে ঔএর
উৎপত্তি—এবং সব শেষে তিনি তৈরী করলেন যজ্ঞ । সেই যজ্ঞকে দান করলেন দেবতাদের
হাতে ।

তখনকার দিনে দেবতারা বোধহয় মানুষের বেশ কাছাকাছি থাকতেন, নর্ত্যলোক
তখনও তাঁরা ছাড়েন নি, অন্ততঃ ব্রাহ্মণকারের তাই ধারণা । ঐতরেয় আর এক জায়গায়
(১৮) বলছেন “যং বৈ তং দেবাঃ যজ্ঞঃ প্রাজানন্, অস্যাং বাব তং প্রাজানন্,
অস্যাং সৰভরন্, অসৈ বৈ যজ্ঞঃ ভায়তে, অসৌ ক্রিরতে, অসৌ সংক্রিরতে”—দেবতারা
বেহেতু এই পৃথিবীতে প্রথন যজ্ঞের কথা জানলেন, এইখানেই তার আয়োজন করলেন,
অতএব এই পৃথিবীর জন্যই এই যজ্ঞের প্রচার, এর জন্যই যজ্ঞ-সামগ্ৰী ।

কিন্তু এদিকে আবার পিতানহ মানুষ স্বষ্টী করে বসে আছেন এবং তাদের থাকবার
ব্যবস্থাও করেছে এই পৃথিবীতে । দেবতাদের সঙ্গেই তারা থাকবে, শুধু ঋগ্‌য়া সাওয়ার
নিরমকানুন তাদের জন্যে একটু অন্যরকম । শতপথ ব্রাহ্মণের মতে (২।৩।৪) এই
ধরনের ব্যবস্থা হলো শেষ পর্যন্ত : দেবতারা থাকেন যজ্ঞের হবিষ্, পাবেন তা থেকে অনরহ—
তাঁদের বলা হল, “যজ্ঞঃ বঃ অনুঃ অনুতবঃ বঃ উথ্ৰঃ” । মানুষদের কিন্তু শুধু যজ্ঞের হবিষ্যানু
থেকে পেট ভরে না, তাই তাদের জন্যে ব্যবস্থা দুবেলা পেট ভরে আহার—“সায়ঃপ্রাতঃ
বঃ অশনঃ” । দেবতারা এইতেই সন্তুষ্ট, কিন্তু মানুষের লোভের সীমা নেই । তারা প্রজা-
পতির কথামত না চলে দুবেলার বেশী খেতে আরম্ভ করল । তাই তে এত বোটা লোক
দেখতে পাওয়া যায়, তাদের শেষ পর্যন্ত কিন্তু ভাল হয় না—“মৈন দেবাঃ যত্‌ক্রানন্তি, ন
পিতরঃ ন পশবঃ । বনুধ্যাঃ এব একে অতিক্রান্তি, তস্মাৎ যঃ বনুধ্যাণাঃ বেনাতি অত্তে
বেদ্যতি...অনুতঃ দি ক্ৰা বেদ্যতি” । শতপথ ২।৩।৪।৬) । অতএব দুবেলার
বেশী ঋগ্‌য়া উচিত নয় যদি শেষ অধি কেউ বাঁচতে চায়—“তস্মাৎ উ সায়ঃপ্রাতঃসায়ী
এব সায়ঃ । স যঃ হ এবঃ বিদ্যানু সায়ঃপ্রাতঃসায়ী ভবতি সর্বঃ হ এব আহুঃ এতি” ।*

সে যাই হোক, কথা হচ্ছিল যজ্ঞের বিষয় ।

প্রথন প্রথন দেবতারা এই পৃথিবীতেই থাকতেন মানুষদের সঙ্গে । শেষ পর্যন্ত
কিন্তু মানুষরাই তাঁদের টিকতে দিল না, কেবল “এটা চাই ওটা চাই” করে তাঁদের প্রাণ
বধ আর কি । তাই শতপথ বলছেন (২।৩।৪) “উভরে বৈ ইদং অগ্রে সহ আহুঃ,
দেবাঃ চ বনুধ্যাঃ চ । তং যং হ স্ম বনুধ্যাণাঃ ন ভবতি তং হ স্ম দেবানু বাচন্তে, ইদং বৈ
নঃ নাস্তি ইদং নঃ অন্ত ইতি । তে তস্যাঃ এব বাচন্তাঃ যেষাং দেবাঃ তিরোভূতাঃ” ।

* এ কাহিনীর বিদূর্ভাব কিন্তু পরিচায় হয়ে যদি সন্তান যদি ঐশ্বর্যবিশিষ্ট এবং বিশেষভাবে ঈশ্বা তি কলছেন
শ্রীতে পৃথিবী ও মানুষের বর্ষ ও এম কি । —সম্পাদক

সেবতাসের ত্রিগোধান হো হলে, কিন্তু যাবার সময়ে তাঁরা* একটু সন্ধ্যায় করে গেলেন। তাঁরা থাকতেন বটে এই পুণ্ড্রীতে কিন্তু তাঁদের গতিবিধি ছিল স্বর্গের অবধি। যজ্ঞের ফলেই অবশ্য তাঁরা স্বর্গের জয় করেছিলেন, তাই তাঁদের একটু ভয় ছিল এই ছোটলোক মানুষগুলো না কোনোদিন যজ্ঞ করে স্বর্গে যেতে চায়। তাই পুণ্ড্রী থেকে যাবার সময়ে তাঁরা যজ্ঞের চিত্রটি পর্যন্ত মুছে দিয়ে চলে গেলেন, যাতে মানুষরা তার কোনো রকম দর্শন পর্যন্ত না পায়। ব্রাহ্মণকাণ্ডের নিশ্চয় খুব স্বাক্ষর দেখেছিল। শতপথে আছে (১০।১।১-৪) বৌদাহিরা যেনন কুলের নবু চুষে দেয় ঠিক তেনি করে সেবতাসা যজ্ঞের সাধ-পদার্থটি খেয়ে নিলেন, তার পর ধূপকাঠ দিয়ে ঢেকে ফেলেন যেখানে যজ্ঞ হতো (তাই থেকেই তো “ধূপ” শব্দের উৎপত্তি, ধূপ ধাতুর অর্থ ঢাকা)।—“যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ ইমাঃ জিতিঃ জিহ্যঃ যা এবাঃ ইয়ঃ জিতি। তে হ উচুঃ কথং ন ইদং বনুযোঃ অনভ্যারোহাঃ স্যাৎ ইতি। তে যজ্ঞস্য ভসঃ ধীবা বধা নবু নবুতঃ নির্ধরেতুঃ, বিমূহা যজ্ঞং, বৃপেন বোপরিবা তিরো অভবন্।”

কিন্তু মানুষের হাত এড়ান এত সহজ নয়। ঐতিহ্য সেবতাসের বরণ শুনে ফেলেছেন, “তং বৈ ধীবাঃ অনুশ্রুতঃ আস।” তাঁরা ঠিক করলেন সেবতাসা যান তো যান, যজ্ঞটাকে বুজে বার করতেই হবে—“তং অনুষ্টুঃ পত্নিরে”। তাঁরা নয় উচ্চারণ করতে করতে পলম্ব্যব হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন যজ্ঞের ঘোঁরে, কারণ সেবতাসা যা কিছু জয় করেছেন রীতিনীতি পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁদের তার জন্য—“তে অর্চন্তঃ শ্রামান্তঃ চেষ্টঃ। শ্রবেণ হ স বৈ তং দেবাঃ ভবন্তি যৎ এবাঃ জয়াঃ আস।” প্রাচীন ভারতে কীকির স্থান ছিল না দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত পরিশ্রমের ফল ফলন। যুরতে যুরতে তাঁরা এক কচুপের সন্ধান পেলেন। আছে আছে পাল্যচ্ছে ঘেঁষে ঠিক করলেন, এই নিশ্চয় যজ্ঞ। তাকে ঠাকুরদেবতার নাম করে বললেন, “অশ্বিত্যঃ তিষ্ঠ, সরস্বতী তিষ্ঠ, ইন্দ্রা তিষ্ঠ।” কে কার কথা শোনে। শেষে যেই বলেছেন “অগ্নিরে তিষ্ঠ”, অবনি সে দাঁড়িয়ে গেল। তাকে ধরে আঙনে আহুতি দেওয়া হলো, তার ফলে মানুষ আবার ফিরে পেল যজ্ঞ।

একটা প্রশ্ন সহজেই মনে আসে—এত কলাও করে যজ্ঞ উদ্ধার করার কোনো দরকার ছিল কি? এখানে বলে রাখা ভাল যজ্ঞ বলতে ব্রাহ্মণকার কি বুঝতেন। শুধুই ভবেন ধী চালা, না অন্য আরও কিছু? শতপথ বলেছেন (১।১।১।১-১), “পঞ্চ এব বহাযজ্ঞাঃ, জসি এব বহাশ্রাবি, জুতযজ্ঞঃ, বনুদ্যযজ্ঞঃ, পিতৃযজ্ঞঃ, দেবযজ্ঞঃ, ব্রহ্মযজ্ঞঃ ইতি।” আবার সবাই জানি বর্ষশাস্ত্রে এই পঞ্চবহাযজ্ঞের বিধান আছে। কিন্তু তার ইতিহাস দেখা যাচ্ছে

* এঁরা ব্রাহ্মণদের দেবতা হবেন—সত্যকারের দেবতাদের স্থান অবিকার করেছেন—যেমন সত্যকার জ্ঞানদের স্থান অবিকার করেছেন সোতী বস্তুত্ব। —সম্পাদক

† যজ্ঞের যজ্ঞ আকিয়ারের এই প্রকৃতি তার মত না পুণ্ড্রীতেই পুণ্ড্রীকায়ের প্রথম ইতিহাস। —সম্পাদক

বেশ প্রাচীন। কি এই পকনহাণ্ডের স্বরূপ? “অহরহঃ ভূতেভ্যঃ ননিঃ চরেৎ” — যাতে মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণী মানুষের হাতে কিছু খেতে পায়। “অহরহঃ পশ্যাৎ বা উদক-পাত্ৰাৎ” — অর্থাৎ মানুষের ঘরন সেবে তখন পাত্র ভরে নিও। পিতৃপুরুষদের বেনাতেও একই নিয়ম—“অহরহঃ স্বগা কুর্যাৎ বা উদপাত্ৰাৎ”। আগুন আহুতি সেবে দেবতাদের জন্যে সেখানেও যেন কনতি না হয়—“অহরহঃ স্বাহা কুর্যাৎ বা কাটাৎ”। আর ব্রহ্মবজ্র হলো বেদনয়ের চর্চা রাখা—“স্বাধ্যায়ে বৈ ব্রহ্মবজ্রঃ।”

এই কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে বলছেন শতপথ ব্রাহ্মণ অন্য এক ব্যাখ্যায় (১৭।২। ১-৫)। মানুষ অন্নগ্রহণ করা নাত্র ঐশ্বর্য হই, অন্ততঃ তার স্বকনের ঐশ্বর্য—“সেবেভ্যঃ, ঐশ্বিত্যঃ, পিতৃভ্যঃ, ননুদোভ্যঃ”। দেবতাদের ঐশ্বর্যে করবার জন্যে তাঁদের পূজা করতে হয়, সৈবৈশ্য দিতে হয়—“তং হি এভ্যঃ এতৎ কুরোতি যৎ এনান্ বসতে, যৎ এভ্যঃ ভূহোতি।” ঐশ্বিত্যের কাছে থেকে বেদনয়ের মত অনুলা নিধি পাওয়া গেছে, তাঁদের ঐশ্বর্যে হয় সেই নিধি স্বয়ং করে বেদপাঠের দ্বারা রক্ষা করলে—“তং হি এভ্যঃ এতৎ কুরোতি, ঐশ্বিনাঃ নিধি-গোপঃ, ইতি হি অনুচানঃ আহঃ।” সন্তান সন্ততির ইচ্ছা হওয়া মানেই পিতৃপুরুষের ঐশ্বর্যে জড়িয়ে পড়া—“তং হি এভ্যঃ এতৎ কুরোতি যৎ এনান্ সন্ততৌ অস্বাচিহ্ন্য পূজা ভবতি।” আর পৃথিবীতে বসবাস করা মানেই অন্য মানুষের কাছে ঐশ্বর্য হওয়া; ধার শোধের উপায় হলো তাঁদের সাহায্য করা, থাকতে দেওয়া, খেতে দেওয়া—“তং হি এভ্যঃ এতৎ কুরোতি যৎ এনান্ বাসতে, যৎ এভ্যঃ অশনং দদাতি।”

এইসব ঐশ্বর্যে করলে তবে “কৃতকর্মী” হওয়া যায়, আর অপ্রাণী কিছু থাকে না —“ভয়া সর্বঃ আশঃ সর্বঃ ভিত্ত্ৱঃ।”

কি চাইবার ছিল তখনকার যুগে? কি ধরনের জয়ের প্রত্যাশা যত্ন করা হতো? সাধারণ মানুষের কথা বলছি, উপনিষদে কে-সব ব্রহ্মবাদী বা ব্রহ্মবাদিনীর উল্লেখ আছে তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তখনকার চাহিদায় সঙ্গে এখনকার বেশ বানিকীটা মিল আছে। মূলতঃ খুঁটিয়ে সেখানে বোঝা যায়। তফাৎ কেবল এইটুকু যে তখনকার দিনে স্বত্তিটা ছিল ঠাকুরদেবতাদের একরকম একচেটে, এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত যাদের হাতে থাকতো যজ্ঞশালার চাবিকাঠি, ইচ্ছে করলে যজ্ঞ উচ্চারণের হেরফেরে অনেক কিছু ভেঙে দিতে পারতো, অন্ততঃ সেইরকম ধারণা ছিল সে-যুগের লোকদের।

অন্যরকমের আশা করা বুধা মানুষের পক্ষে—“অবুভাঃ সেবাঃ, ন অনুতরন্য আশা অস্তি,” লোভা কথা বলে দেওয়া হইবে (শতপথ ২।১।১।৪)। অন্যরকম ছাড়া আর যা কিছু মানুষ চার সব পাওয়া যায় যজ্ঞের মৌলতে। শতবর্ষের ওপর মানুষের স্বাভাবিক পরবাস্য কাছেই তার জন্যে বিশেষ করে চাইবার দরকার ছিল না—“অপি হি ভূয়ঃশি শতাং বর্ষেভ্যঃ পুঙ্খঃ জীবতি, তনবাং অপি এতৎ ক্রবন্ ন আশ্রিয়েত” (শতপথ ১।১।১।১২)। কিন্তু ভাল ভাবে বাঁচা চাই। অতএব প্রয়োজন ব্রহ্মবর্চন, হওয়া দরকার “অনুপতি”, “পত্তমান্”

(ঐতরেয় ১।৮) । কিন্তু শুধু পয়সা কড়ি থাকলেই চলবে না, সন্তানসন্ততি পাকা চাই প্রচুর, আর চাই বান-বাতির, “প্রতিষ্ঠা” (ঐ ১।৬) ।

এই তো গেল জীবদ্দশায় । তার পর পরলোক । শতপথের ভাষায়, স্বর্গ নরকের মাঝখানেই রাস্তাটা খুব নিরাপদ কিছু নয় (২।৪।৩৭), কিন্তু অগ্নি আছেন ভাবনা নেই— “অগ্নিঃ বৈ পথঃ কর্তা” (১১।১।৪।৬) তাঁরই হাতে স্বর্গলোকের চাবি— “বঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারঃ অব্যোহঃ, অগ্নিঃ বৈ স্বর্গস্য লোকস্য অধিপতিঃ” (ঐতরেয় ১।৪২) । দেবতার বচন অম্লস্বাদের ভয়ে স্বর্গে আশ্রয় নেবার ব্যবস্থা করছিলেন তাঁদেরও রীতিমত ষোণানোদ করতে হয়েছিল, তবে অগ্নি দরজা খোলেন । তবে এখন আর মানুষদের কোনো ভয় নেই, দেবতাদের মত স্তব করতে পারলেই স্বর্গদ্বার খুলে যাবে । অবশ্য তার জন্য পুরোহিতদের হুণী রাখতে হবে বিবিধত নক্ষিণা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে । নয়তো কিন্তু বিপদ ।

[অমলঃ]

কবিওয়ালার কাব্য

ঐসমীরকান্ত গুপ্ত

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালাদের* সর্বথক হলেন দীনেশচন্দ্র সেন—প্রথম না হলেও প্রধানতম নিশ্চয়। আর বিরুদ্ধপক্ষে ধাঁড়িয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সূত্রাং পাঠক বা শ্রবকদের কাছে একটা কৌতুহলোদ্দীপক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। দীনেশচন্দ্র কবিওয়ালাদের কাব্যে রসানুভূতির বোধ্য যথেষ্ট উপাদান লক্ষ্য করে প্রীত হয়েছেন এবং প্রবৃত্ত সাধুবাদ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এসে বললেন, এখানে যথার্থ কাব্যশ্রীর পরিবর্তে আছে কোলাহল, শিল্পের আসনে অধিষ্ঠিত স্বরবিক্রম।† এই কবিওয়ালাদের বাংলাকাব্য-মঞ্চে আবির্ভাব হয়ত ন্যায়কে পল্লপালের অভ্যাসের মতো সম্পূর্ণই অতিক্রান্ত ও অহেতুক নয়, শত্রুবৃত্ত সমসাময়িক কালের সনাক্ত দেখে ও সবলিগত মনে তার আত্মপ্রকাশের কারণ যথেষ্ট ছিল; তবে একথা প্রায় অবিসংবাদীরূপে মত যে প্রাক্ক-কবিওয়ালাবৃন্দের শ্রোতা এই অন্তরঙ্গেরই অপেক্ষার ছিল না কিংবা বিংশ শতাব্দীর কবিগুণগ্রাহী এই ইংরাজীর প্রভাবশূন্য দূরপাৰ্বজিত বাংলাকাব্যের দিকে লুকুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। পরবর্তীকালের কবি এর থেকে কি প্রেরণা, কি প্রাণরস আকর্ষণ করেছেন, অতীত আর আগামীর মধ্যে এ কোন যোগসূত্র তার আলোচনা স্বগিত পাক। আপাতত দেখতে চেষ্টা করব এই প্রায় শতবৎসরব্যাপী প্রয়াসের মধ্যে কিছু কাব্য হিসাবে, কিছু নিছক কবিত্বের নিদর্শন হিসাবে বিখ্যাতনবননে প্রবেশ করতে পারছে না।

কয়েকটি নৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাক। তাদের কেন্দ্র করে মন্তব্য ও আলোচনা সহজ-বোধ্য হবে।

১। চন্দ্র চনকে চনিতে চরণ, নখরো ছটার।

(হক ঠাকুর)

২। প্রতিপদের চাঁদো, হরিষে বিখানো,

নয়নে না দেখে, উদয়ে দেখে।

(জি)

* "The Kabi-poetry, therefore, covers roughly the long stretch of a century from 1760 to 1860....."—Dr. S. K. De.

† "কবিত্বের সেইরূপ একমাত্র বঙ্গসাহিত্যের ক্ষমতাস্বায়ী সৌমুখি-আকাশে অকস্মৎ দেখা গিয়াছিল, তৎপূর্ববর্ত অস্বাভাবিক কোন পরিণতি ছিল না, এবংও তাহারই কোন সাক্ষ্যই পাওয়া যায় না।"

- ১। কোন্‌ বস্তু পুনে ধ্বনি রাখায় কর উদাসিনী
(৩)
- ৪। এমন শোভা এনোকেশে কেউ দেখে নাই কোন কালে
(পরাণচন্দ্র)
- ৫। শ্যামল কবল ফুটেছে বুঝি
নির্বল বদনা-জলোত্তে ।
(গৌরবোধন সেন)
- ৬। বুকুরে আপন মুখ, দেখায় বেবন লেখ,
নগের বুকুর মন, নিরখ অস্তরে ।
(অজ্ঞাত)
- ৭। একি গুনি বংশীধ্বনি রাবে, বাজে গহন কাননে,
(বলহরি দাস)
- ৮। আমার মানব জনম সফল হবে, যদি সাত্তা চরণ পাই
(এনটনি গিরিজি)
- ৯। তোরে ভালবেসেছিলেন বলে প্রেম,
আমার দু'কুল মজালি ।
(গোরকনাথ)
- ১০। শ্যামল কেহেত কেউ উঠিয়ে কালী কানের কেউ মেঘায় ।
(ক'বেল কারিনী)
- ১১। তার মূল রয়েছে আকাশের পর, এ কুলের তলাস কলে কে বল ।
(৩)
- ১২। হোনারো হেরিরে আরো বনেরো তিনিসো বিনাশে ।
(নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী)

এই কয়টি সংগ্রহ নিপুল কবিগানের আয়তনের তুলনায় নিতান্তই সামান্যগ্রন্থ । তবে এরই মধ্যে যদি দেখতে পাওয়া যায় কিছু বর্ণার্থ কবিত্বের স্বর ফুটে উঠেছে, একটা সৌন্দর্যের পরিচয় গড়ে উঠেছে, কোথাও একটা অব্যক্তির আবেশ দেখা দিয়েছে তাহলে তা কবি-গানেরই গৌরবের বিষয় । বলা বাহুল্য, কবিওয়ালার এক মন পূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদাবলী কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত । এই প্রভাব অবশ্য অল্পবিস্তর ভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ভাষা অর্থাৎ কবিওয়ালার কাব্যের বা গানের ভাষা তাঁর একান্তই নিজস্ব—এখানে সারসীর প্রভাব যেমন প্রায় মূল্য বহনই চলে তেমনি ইংরাজীর প্রভাবও সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত । এই কবি-ওয়ালার ভাষা একান্তই বাংলার জনপদ সম্পন্ন—লোককবির অকৃত্রিম প্রকাশপ্রণালী ।

ইংরেজের সংস্পর্শ—ইংরাজী সাহিত্য বাংলাকে দিয়েছে আধুনিকের স্বরূপ ।

এরপর থেকে বাংলা সাহিত্যে জনৈক যুক্তিসংবদ্ধ মূলবস্তু রূপ পরিগ্রহ করেছে, তবে ও ভিত্তিতে যুক্তিনির্ভর—rationalised—হয়ে উঠেছে। ভাষার কাঙ্ক্ষাকর্ষের মধ্যে স্বল্প যুক্তির খেলা, পরিচিহ্ন চিত্রণ প্রয়োগ, একটা অবলোকিত দৃষ্টি সৃষ্টির কণ্ঠ—এই জন্য ইংরাজী অনেকখানি দায়ী। কবিগান এই বাংলার রেনেসাঁর অবস্থার আগে। বঙ্গবন্ধুরা আত্ম-বিবিক্তি নিরাসক্ত যুক্তি (objective reason) সৃষ্টির নিয়তা নয়, কবিগানেও নয়। তবে উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। বঙ্গবন্ধুরা ধর্মসংক্রান্ত উপদেশমূলক উপাখ্যান বা উদ্দেশ্যমূলক কাহিনী প্রকাশ করেছেন; কবিগানে আত্মকৃত অনুভূতির প্রাদল্য—নিগ্রিকের মতো প্রবলতা নুহা। এই স্বাধীন বিষয়বোধেরসঙ্গে—subjective emotion—কে—কবি ভাবভূক্তির সৃষ্টিপাথরে ঘাটাই করে বেননি, বেনন গদ্যে করলেন বাননোহন এবং কাব্যে বার্ষিক আধুনিকতার প্রবর্তক মনুসুন্দর। কলকাতা অবশ্য বাঁটির সঙ্গে চুকে পড়েছে প্রচুর বেকী, আগনের সঙ্গে ভেদান—শিল্প প্রয়োজনীয় গ্রাহ্য উপাদানের সঙ্গে নিগ্রিকের অন্তর্নিহিত অগ্রাহ্য উপচারও স্থান পেয়েছে। এই রকমে কবিগান অনেকের হাতে অবলম্ব্য হতে হতে খেমে গিয়েছে। তবে রহস্য একটা। বিশেষত্বের অপ্রয়োগে, সংঘর্ষ ও পরি-বার্জন্যের অভাবে, প্রাণোত্তর শাসকের অনুপস্থিতিতে কবিগানে স্রষ্টার মূলত্ব প্রাণাত্যের কোমল প্রকট হয়ে উঠে বলে দেখা দিয়েছে সেই প্রাণাত্যের অকৃত্রিমতার স্রষ্টা আবার তার স্ববর্ণ স্বভাবগে হয়ে দাঁড়িয়েছে যার কল্যাণে অস্বস্ত প্রকৃতি—elemental Nature—তার স্বল্পপের একটুখানি প্রকাশ করে ধরেছে, একটা বিশ্বস্ততার কণিক পরিচর আভাসে আপনাকে ঘোষণা করেছে—বহনিলিখিত অর্থাৎ বহু সাহিত্যের প্রত্যয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত অনুপ্রাসের বাধা সরেও।

যেখানে পাণিত যুক্তির পরাকাষ্ঠা সেই সেখানেও সৌন্দর্যের স্রষ্টা একটা প্রতিলিকা নয় কি? মহা রহস্য তবে এই—সকল স্রষ্টা—সাহিত্য-স্রষ্টারও—গুন মনের উৎসর্গ; বন অবলম্বন মাত্র, যেমন প্রাণ এবং প্রাণিক বোধ (instinct)। বন হো স্রষ্টা করে না, সে উপাখ্যান সাজিয়ে ওড়িয়ে পথ স্থপন করে দেয় মাত্র—‘অশিক্ষিত’ instinct ও এক মহাপ্রকৃতির অঙ্গ, তার ভিত্তি দিয়েও বিশ্বস্ততার পরন ঐশ্বর্যের সোনা ভাণ্ডা সত্ত্ব। কবিগানে এই স্পন্দন প্রচুর না হলেও একেবারে অনুপস্থিত নয়। কাব্য-সরসভীর কাছে জ্ঞানভেদে সেই—বিলম্বন এবং শৈল্পীয়ের যে-ভাবনোক্তের যে-ভাবনেরই অধিবাসী হোন উভয়ে সবার গ্রাহ্য, মাইকেল ও নবাই বয়রা (১৭৯২) একত্রে বাণীর স্বসত্ত্বের প্রবেশাধিকার পান।

শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্তের

কবির্মনীষী

রবীন্দ্রনাথ

(রবীন্দ্র শতবার্ষিকী স্মারক)

★

শ্রীমৎ অনিবার্ণের

দিব্যজীবন প্রসঙ্গ

প্রাপ্তিস্থান

শ্রী অরবিন্দ পাঠমন্দির—১৫ বঙ্কিম চাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা-১১

শ্রী অরবিন্দ আশ্রম—পশ্চিমবঙ্গ

সুশ্রীমশচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রণীত

স্মৃতি-কথা

(দ্বিতীয় প্রকাশিতব্য)

শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পশ্চিমবঙ্গ—২

*"For not by Reason was creation made
And not by Reason can the Truth be seen."*

—SRI AUROBINDO.



Mahalaksmi Constructions
ARCHITECTS, ENGINEERS & CONTRACTORS
8, 9, BENTINCK STREET
CALCUTTA-I.

*"It is in a sincere consecration to the Divine
that we can find relief from our too human sufferings."*

—THE MOTHER

NATIONAL GENERAL TRADING
19, STRAND ROAD
CALCUTTA-I.

GRAM: DONWEL

PHONE: { 22-3577
35-3314

Telegrams: 'Vessel' Cal

Codes { Scotts 10th. Ed.,
A. B. C. 5th. Ed.,
Bentley's

Telephones { Office : 23-1393
Dock Office:
Residence: { 55-6464
55-3724
55- 503

SARAT CHATTERJEE & Co., (Private) Ltd.

STEVEDORES, SHIP CHANDLERS & CONTRACTORS

3, Mangoe Lane, CALCUTTA-1.

Regular Services:

AMERICAN EXPORT LINES INC.
ELLERMAN & BUCKNALL STEAMSHIP CO.,
THE EAST ASIATIC CO., LTD.
INDIA STEAMSHIP COMPANY LTD.

Under Distinguished Patronage of:

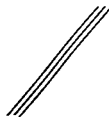
LIONEL EDWARDS LTD.
GLADSTONE LYALL & Co., LTD.
POLISH OCEAN LINES
UNITED LINER AGENCIES (P) LTD.

Branch: VIZAGAPATAM

Telegrams: VESSEL

PHONE: 47-2639

**FAMOUS GROCER AND SPICES DEALER
OF
SOUTH CALCUTTA**



ASWINI KUMAR NANDI & SONS

**JADU BABU'S BAZAR
BHOWANIPORE**

CALCUTTA - 25

শ্রীঅরবিন্দ যন্ত্র

বহিঃ

(২৪শে এপ্রিল, ১৯৬২)



শ্রীঅরবিন্দ পাঠ্যমন্ত্র

১৫ বর্ষ চ্যাপ্টা দ্বিতী : কলিকাতা—১২

১। চিত্তাবলি ও পুস্তাবলি	ঐশ্বরবিন্দু	১
২। দ্বিসির পাঠ্য	ঐশ্বরবিন্দু	৫
৩। মহামানবের সাগরতীরে	সমৎ বন্দোপাধ্যায়	২
৪। যোগসম্বন্ধ-প্রসঙ্গ	অমির্বাণ	১৫
৫। মায়েই সবে কথা	ঐশ্বর	৩০
৬। প্রবোধ	"	৪৬
৭। যোগের প্রথম পাঠ	ঐশ্বরবিন্দু	৫৩
৮। চিঠিপত্র (সাহিত্য)	"	৫৮

বক্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আলিস কিংবা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নতুন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

শাখা :
ঐশ্বরবিন্দু পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ট্রাষ্ট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
ঐশ্বরবিন্দু আশ্রম
পত্রিকার

মূল্য—১৫ টাকা

প্রকাশক—ঐশ্বরবিন্দু পাঠমন্দির, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ট্রাষ্ট, কলিকাতা—১২

মুদ্রক—ঐশ্বরবিন্দু আশ্রম প্রেস, পত্রিকার



২৪শে এপ্রিল, ১৯৬২

বিস্ময় নিশ্চিত, অধাবসারী হই যদি আমরা—আর এ হেন
বিস্ময়ের ক্ষুদ্র কি কঠোরতা কি প্রযত্ন এমন আছে যাকে
হুগ্ধতা বলা যায় ?

শ্রীঅরবিন্দ

চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

পূৰ্ণাহুৰিণি

শ্ৰীঅন্নবিন্দু

ৰোগ ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান

ৰোগ যে নিশ্চয়গোছনে দীৰ্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে ও পৰিণামে হয় যে মৃত্যু তা অনিবার্য নহ—এর হেতু রোগীরা মন রোগে লায় দেয়, সৰ্বদা নিৰিষ্ট থাকে শরীরের রোগের উপর।

*

চিকিৎসা-বিজ্ঞান মানুষের কাছে আশীৰ্বাদের চেয়ে বেশি হয়েছে অভিষাপ। মহা-নাগীর প্রকোপ যে ভেঙ্গে দিয়েছে আর যত্নযুক্ত শল্যবিদ্যা আবিষ্কার করে ধরেছে, সত্য বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের যে স্বাভাবিক শাস্ত্য তাকে দুর্বল করেছে আর ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্মহত্যা রোগ বচনকে বৃদ্ধি করেছে, মনে ও দেহে ভয় আর পর-নির্ভরতায় আসন করে দিয়েছে, স্বাস্থ্যকে শিক্ষা দিয়েছে স্বাভাবিক স্বস্থতার উপর নয়, কতকগুলি বনাম ও বনিম পদার্থের বিশুদ্ধে তৈরী এক বিদ্যাপাচনরূপ ভীষণ জীবনযষ্টির উপর নির্ভর করে চলতে।

*

কোন রোগকে নকা করে চিকিৎসক ছুঁড়ে মারে একটা ওষুধ—কখন লেগে যায়, কখন লাগে না। লাগে না যতগুলি সে-সব গণনার মধ্যে আনা হয় না আর কে-ক'টি লাগে তাদেরই সমস্ত তুলে রাখা হয়, হিসেব করা হয় সাক্ষিকে-ওঁহিরে বিজ্ঞান পরিণত করা হয়।

*

হাতুড়ে বৈদ্যের উপর অসত্যসত্যদের বিশ্বাস দেখে আমরা হাস্য করি। কিন্তু ডাক্তারের উপর হুস্তাদের যে বিশ্বাস তা কি কম কুসংস্কার? অসত্যের দেখে কোন একটা বস্তু বিশেষ অঙ্গ করলে একটা রোগ তাদের সেরে যায়; হুস্তরাঃ তার বিশ্বাস হয়। হুস্তাঃ রোগী দেখে একটা নিখিত ব্যবস্থাপত্র অনুসারে সে যদি ওষুধ সেবন করে তা হলে একটা বিশেষ রোগ থেকে মুক্তি পায়। হুস্তরাঃ তার বিশ্বাস হয়। কোথায় পার্থক্য?

*

উত্তর-ভারতের বাখাল ঘরে আক্রান্ত হয়ে নদীর ঠাণ্ডা জলের মধ্যে বলে থাকে ঘণ্টা বানেক কি তারো বেশি, উঠে আসে রোগবৃত্ত হয়ে মুক্ত হয়ে। শিক্ত মানুষে যদি তা করে, তবে তার শেষ হয়ে যায়—কারণ এ নয় যে একই প্রতিকার তার স্বাভাবিক গুণে এক জনের মৃত্যু দেয়, আর এক জনের শেষ স্বাস্থ্য, না, তার কারণ নয় আনন্দের ভোল করে শরীরকে শিথিলেছে কতক এলি ভুল অত্যাশ নারাত্তকভাবে অর্জন করতে।

*

রোগ যে সারে তা ওষুধের গুণে ততখানি নয়, যতখানি রোগীর যে বিশ্বাস চিকিৎসকের উপর আর ওষুধের উপর তার ফলে। তবে এ দুটি বস্তুই হল মানুষের আপন আরশক্তি উপর যে স্বাভাবিক বিশ্বাস তার অপটু প্রতিনিধি।

*

মানবজাতি সেই সব যুগেই ছিল সব চেয়ে বেশি স্বাস্থ্যবান যখন ছিল তার সবচেয়ে কম স্থল ভেদে।

*

এখানে পুণিনীর উপর সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও সুস্থ যে জাতি হয়ে গিয়েছে তা হল আফ্রিকার অসভ্যো। কিন্তু কতদিন সেনাকন থাকবে তারা, সভ্যদের মানস-নিকৃতিসমূহের সংস্পর্শে এসে তাদের বাহ্য নন দূষিত হয়ে যাবার পরে ?

*

আনন্দের অস্তরে রয়েছে যে দিবা স্বাস্থ্য তাই দিয়ে আনন্দের রোগ লারাতে হবে, সরিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু চরক আর সুশ্রুত আর তাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠি ও-স্বস্তর পরিবর্তে দিয়েছে ভেদকের অস্ত্র-শস্ত্রাণার আর শরীর শাস্ত্রের পতিতী বাপাঙ্কর।

*

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সং, চিকিৎসকেরাও প্রায়শ: পরোপকারী এবং বহুলশ: আরত্যাগী। কিন্তু অজ্ঞানীর সদুদ্দেশ্য তাকে অপকর্ষ থেকে কবে রক্ষা করতে পেরেছে ?

*

সব ঔষধ যদি বস্তুতই এবং নিম্নেরই গুণে ফলপ্রসূ হয়, আর চিকিৎসাশাস্ত্রের সকল প্রতিপাদ্যই অস্বাস্থ্য হয়, তবুও তাতে আমরা হারিয়েছি যে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তি তার সাহায্য কোথায় ? বিদ্য-বৃক্ষ সর্বাস্থ্যে নিম্নে মুক্ত হলেও তা বিদ্য-বৃক্ষ।

*

অন্তরে আনন্দের যে অস্ত:পুরুষ সেই হল সর্বার্থসাধক ভিতক। শরীরকে তারই অনুগত করে ধরা হল সর্বরোগপ্রহার ভেদক।

*

অস্তরঙ্গ ভগবান হলেন অনন্ত স্বয়ং-স্বাধিকার চিত্তশক্তি। মৃত্যুভয়ে বিচলিত না হয়ে তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে পার না জোবার বস্ত রোগ—পরীক্ষা করে দেববার জন্য নয়, ধীরস্থির

পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে : তবে তুমি আবিষ্কার করবে অন্ত্রিমে যে লক্ষ লক্ষ ভিষকের বৈপুণ্য তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

★

হাজার হাজার সতর্কতায় ঘিরে স্বাস্থ্যকে রক্ষা করা চল চিকিৎসকের ব্যবস্থাপনায়। শরীরের জন্য এ শাস্ত্র ভগবানের নয়, প্রকৃতির ও নয়।

★

মানুষ এক সময়ে স্বভাবতই ছিল স্বাস্থ্যবান—সেই আদি-অবস্থায় ফিরে যেতে পারত সে, যদি তাকে ছেড়ে যেওয়া হত। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞান আনাদের শরীরের দিচ্ছনে ভুটেছে তার সংখ্যাভীত ঔষধের পেটিকা নিয়ে, আনাদের কল্পনাকে আক্রমণ করেছে বীজাণুর বৃত্তকে অকৌটিলী দিয়ে।

★

বৃত্তকে বরং বরণ করবে, সব শেষ হয়ে থাকে বরং—কিন্তু তবু জীবন বাপন করবে না জীবাণুদের ভুতুড়ে অবরোধ থেকে দল্লক্ষণ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে। এর অর্থ যদি হয় বর্ষের হয়ে অনালোকিত হয়ে পড়া, তবে গানন্দে আমি আনন্দন করব এই ব্রহ্মাণ্ডীয় তনিত্রা।

★

অস্ত্র-চিকিৎসক বাঁচিয়ে তোলেন, আরোগ্য করেন কেটে-কুটে, অঙ্গহীন করে—তার চেয়ে বরং চেষ্টা কর না যাতে প্রকৃতির লাক্ষ্য সর্বশক্তির প্রতিকার সব আবিষ্কার করতে পার।

★

স্বাস্থ্য-আরোগ্য যে ঔষধের স্থান গ্রহণ করবে তার এখনো বচ নিলম্ব—হেতু হল, ভীতি, নিষেধ উপন অনিশ্চয় আর ঔষধের উপর যে নির্ভরতা আনাদের দ্বিতীয় প্রকৃতি হয়ে পড়েছে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কাছে আনাদের শেহ-প্রাণের নিকার ফলে।

★

রোগে আনাদের শরীরের পক্ষে ঔষধ প্রয়োজন হয় এই জন্যে যে শরীর নিকা করেছে ওষুধ ছাড়া ভাল না হওয়ার কারণশক্তি। তবুও, প্রায়ই দেখা যায় যে-বৃদ্ধের জীবনেব আশা নাই বলে ডাক্তারেরা ছেড়ে দিয়েছে, ঠিক তখনই প্রকৃতি আরোগ্যের পথ ধরেছে।

★

অস্ত্রের আরোগ্যশক্তির উপর আশা হারান—এই হল শরীরের পক্ষে স্বর্গ হতে অধঃপতন। চিকিৎসা-বিজ্ঞান আর বংশগত সোধ এই দুটি দৌবারিক-সেব স্বর্গের দুয়ার আগলে রয়েছে, ফিরে পুনেশ করতে আনাদের সেবে না।

★

চিকিৎসা-বিজ্ঞান শরীরের পক্ষে হল বেন বৃহৎ একটা রাষ্ট্রশক্তি ক্ষমতর দেশকে রক্ষা

করতে গিয়ে যে তাকে দুর্বল করে ফেলে অথবা যেন সদাশয় দল্লা এক যে তার শীকারকে প্রহারে প্রহারে ভূতলশায়ী ক'রে, তাকে কঠ-বিকৃত ক'রে দেয়, পরে যাতে গারাজীবন ধ'রে সেই উগ্রচূর্ণ হেটকে গারাত্রে সেবা করতে ব্যাপৃত থাকতে পারে।

*

ঐশ্বর্য শরীরকে কেবল উছাড় না করে, বিঘাঙ্ক না করে নিরানয় করে তুলতে পারে তখনই যখন সোপেন উপর তানের যে স্থল অক্রবণ তা সনপিত হয় অধ্যাত্মের শক্তির দ্বারা— আর সে শক্তি গতি বিনা বাহ্যক কাল করতে পারে তবে ঐশ্বর্য ত নিশ্চয়োজন হয়ে পড়ে।*

• অনুবাদক—ঐনলিনীকান্ত গুপ্ত



স্মৃতির পাতা*

ঝড়-বজা

ঐনলিনীকান্ত গুপ্ত

ভূমিকম্পের কথা বলছি তোমাদের একবার, আর একটা ছোটখাট অগ্নিকাণ্ড। আজ আর দুটি কি তিনটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা বলি—যাদের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল।

প্রথমটি আমার দালাকালের ঘটনা—মনে গাঁথা আছে স্বপ্নেই। ঝড় তুফান তোলগা অনেকই দেখে থাকবে, কিংবা ঘূর্ণীঝড় দেখেছে? ইংরেজীতে থাকে বলে tornado—বাংলায় বলেছেন পণ্ডিত একজন তুর্গুণ্ড? আমার ভাগ্যে ঘটেছিল ব্যাপারটা চাক্ষুষ দেখতে। শোন, কি ভীষণ চোরাগা ত্রাস ঐ মাঝেই বত।

আমরা ছুনে ক্রাসে বসে আছি—রংপুর জেলাস্থল। বেলা গড়িয়ে গিয়েছে—আকাশে বেগ, বর্ষার আদল দেখা দিয়েছে। হঠাৎ শুনি সব—আগুন, আগুন নাকি,—আগুন? সব বেশ হঠাৎ পড়লান আমরা, ছুনের সামনে, মাঠে। আকাশে তাকিয়ে দেখি থাকে প্রথম মনে হয়েছিল ধোঁয়া অর্থাৎ ধূমায়িত কুণ্ডলী তা হল বেশ, বাঘার উপরে প্রায় একরাশি বেশ ঘুরছে আর ঘুরছে আর ঘুর থেকে আসছে একটা চাপা নৌ নৌ শব্দ। ব্যাপার কি? ব্যাপার কি? ছুন দুটি হয়ে গেল। দুটো নাম সবাই যেদিক থেকে আসছে শব্দটা সেদিকে। দুটি বিশেষ কিছু নেই—যদিও হয়ে থাকে অতি সামান্য—চলেছি দুটে, কিন্তু কাছে কিনারাও কিছু নয়, সকলে বলতে লাগল 'সর্বনাশ হয়েছে, ওই দিকে ওই দিকে'। দুটো দিনাম, ছুন থেকে সহর পার হয়ে দু'দিন মাইল দূরে। হঠাৎ থমকে গেলাম, দেখলাম সামনে—জায়গাটা জংলা, গাছপালা তেড়েচুরে একশা। এগিয়ে গেলাম একেবারে ধ্বংসরাশির মধ্যে। অপভ্রংশ ধূশ—হাত পড়াশ চওড়া আকাবাকা একটা বোলা পথ যেন তৈরী করে দেওয়া হয়েছে খাঁড়ঝললের ভিতর দিয়ে, যেন করেক ডগুন বুল ডোমার চলে গিয়েছে দ'লে পিণে সব; ঝোপঝাড়, গাছ-গাছড়া, ঘরবাড়ী (ঘরবাড়ী ছিল সামান্য, বকা তাই) সমান করে উড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে—সুনল্যম বৈরা জীর চার-পাচ মাইল। জনবসতি বিশেষ ছিল না তাই হতাহতের সংখ্যা সামান্য—সু'চার জন মানুষ, করেকটি গরুবাছুর এবং করেকখানা ঘর।

* ঐনলিনীকান্ত গুপ্তের দালাক-বালিকাঃসের উৎসে লিখিত এক গল্প।

ধ্বংসের ভূতীর সমস্ত আক্রোশ যেন পড়েছিল গিয়ে প্রকৃতির উপর—বোধ হয় এটা সত্য সত্যই একটা ভৌতিক কাণ্ড। লোকের বলেছে শূণ্ঠিটা উঠে আসে চান পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত এক বিন থেকে—তার জনগণি ময়ন করে ঘুরতে ঘুরতে সৈতানি উঠে ছুটে আসে। যা হোক—একজন পণ্ডিত্যের কথা শুনেছি—সে রাজা দিয়ে যাচ্ছিল দিক বে-সমনয়ে শূণ্ঠি-বাহুটা রাজা পার হয়ে চলেছে। শূণ্ঠি ডাকে উড়িয়ে আকাশে কয়েক পাক ঘুরিয়ে ফেনে দেয় এক পাশে। লোকটির সৌভাগ্য, কিছু হল না তার, গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বলতে লাগল—“কার্য্যসা মজা, আশনান দেখ্ নিয়া মুকংসে”। লোকটি বিহারী মজুর গোছেই ছিল।

সেই শূণ্ঠিবাহুত কীক দিয়ে আনি কিছুদূর এগিয়ে গেলান। সেখান কি বেগবান শক্তিবান এই জোড়া—গাছ সব উপড়ে উকেট যার নাই বা, তা এমন অদ্ভুতভাবে একেবেঁকে গিয়েছে যে কতপনা করা যায় না। এখন পাঁছগাছড়া সরিয়ে মাটি হুবকী দিনেই পাকা সড়ক বা রাজপথ হয়ে যায়।

মিতীয়বার যা দেখি অর্থাৎ উপভোগ করি তা শূণ্ঠিবাহু নয় কিন্তু পবনদেবেরই নীলা—সেও ডাওবনীলা—এবং আরো বিপজ্জনক আনন্ডা যারা পড়েছিলান তার মধ্যে তাদের পক্ষে।

ঘটনা এখানে এই পণ্ডিচেতরীতে। আনন্ডা তখন পুরানো গেটে হাউসে—পুরানো বটে কারণ স্বর্ভের পরে বাড়ীখানার চেয়ারা বদলে যায়। পণ্ডিচেতরীতে সকালে প্রতি বৎসর অক্টোবর নভেম্বর সাইক্লোন হত, বেশ বড় রকমের। এখন আর তেমন হয় না—যারের নাগুিধো প্রকৃতিদেবী অনেক শান্ত হয়ে গিয়েছেন বলে হয়। তখন দরজা জানালার শুধু হড়কো যা ছিটকিনি দিয়ে বেধেই হত না, বীভিন্ত বংশদণ্ড দিয়ে আটকে রাখতে হত।

সেদিনের ঘটনা, সম্ভার দিকে। সারাদিনই আকাশ বেগে ঢাকা, দিক অন্ধকার, বৃষ্টি নাহে নাহে বেশ—যাকে বলে দুর্য্যোগ। আনন্ডা রয়েছি উপরতনার, উপরভলাতেই আনন্ডা সকলে থাকতান তখন, নীচে শুধু খাওয়া-পাওয়া হত—রাত্রির আচারাদি শেষ করে উঠেছি। এদিকে হাওগাতেও ঘোর দিয়েছে ক্রমেই। আর বৃষ্টিও চলেছে মুখলবারে। হঠাৎ বিকট শব্দ, বই বই, খুপুখাপু—অর্থাৎ জানালা দরজা ভেঙ্গে পড়তে শুরু করল হাওয়ার বাড়ায়। নৌ নৌ শব্দ আর চলল কাপটা। শ্রীমদ্রবিশ্ব যে-এটি ঘরে থাকতেন তার সব জানালা দরজা উড়ে গেল—সব দু'খানি যেন মাঠ, হাওরা আর চল। পাশের ঘরে চল এলেন, সেখানেও তলহা। উপরে আর থাকা চলে না। চললান সিঁড়ি বেয়ে নীচে। সেই বেনে গিয়েছি অবনি সিঁড়িটার চারদিকে অর্থাৎ তিনদিকে বেগা ছিল বড়বড়ি জানালার সেসব ভেঙ্গে পড়ল সিঁড়ির উপর। একটুতে বেঁচে গেলান। নীচের ঘরগুলির অবস্থাও কিছু ভাল না—জানানা দরজা ভেঙ্গে হাওরা আর বর্ষার জন্য পথ করে দিয়েছে। যাবের হলটার একটি কোণে কোনরকমে সকলে বিলে জড়ো হয়ে কুণ্ডলী পাکیয়ে রইলান চপচাপ।

ভোরের দিকে ক্রমে খেনে এল প্রকৃতির উদ্ধারতা—সকালে সব পরিষ্কার প্রার। কিছু

সেখা গেল অতিবিক্ত পরিষ্কার। অর্থাৎ রাস্তার দু'ধারে (সহস্রের একটা শোভা ছিল যা) যে সব সারিনছ গাছ ছিল (বেশির ভাগ থাকে Porché বলে, আমরা বলি health tree) তারা কাতারে কাতারে গুণে আছে পথের উপরে। চলাচলের উপায় নেই। না কাটারি কুড়ল নিয়ে এন মিউনিসিপালিটির মনবল—কেটে চলাচল সম্ভব করতে সময় লাগল। এখানে সেখা ঘর এখানে ওখানে—বিশেষতঃ (Grand Etang-র পাশে) বিপুল গাছ কি বকম বেন হাড়গোড় ভাঙা হয়ে আছে, মাটিতে ভরে অর্ধেক গড়িয়ে মনড়ে রয়েছে।

ভারতীয় নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের পাট—প্রাঙ্গণ, মধ্যাহ্ন ভোজন। কিন্তু কোথায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র—কোথায় দুধ, কোথায় চাল ডাল, কোথায় ছোটবাজার সব বিধবস্ত। আনি না যুদ্ধের সময় দুটি বিরোধী সৈন্যবাহিনী লড়াই করতে করতে যদি কোন গ্রাম বা সহরের ভিতর দিয়ে চলে যায় তবে তার চেহারা এরকম হয় কি না। লোকজন হতাহতের সংখ্যাও বখেটে হয়েছিল—হাজারের কোঠায় যাবে।

এই মহাদুর্যোগ কোন সালে ঘটেছিল আবার ঠিক মনে হচ্ছে না। খুব সম্ভব ১৯১২/১৩ সালে অর্থাৎ প্রথম মহাদুর্যুদ্ধ অব্যবহিত পূর্ববর্তী। হয়ত বা সেই বিশ্বদুর্যোগের নিশান হয়ে সেখা দিয়েছিল এই বড় দুর্যোগ এখানে।

কিন্তু আরো বিস্ময়ের কথা—অনুরূপ একখানা ঝড়বাদলা—অতযানি জোরের না হলেও তার কথক্ৰিৎ অনুকরণে এল সেই মহাদুর্যুদ্ধ শেষ হল যে-বংশের তার পরের বংশস্বই, আর একটি বার্তা নিয়ে। এটি হয়েছিল শুভ্রর আশাদের দিক দিয়ে।

শ্রীনা এসেছেন দ্বিতীয়বার এবং শেষের বার। তিনি আছেন 'বাঘ-হাউসে' অর্থাৎ এখন যেটিতে থাকেন নরনান পরিবার। মনে আছে, আমরা থাকতাম গ্রেট-হাউসে এবং প্রতি রবিবার শ্রীঅরবিন্দ যেতেন শ্রীনারায়ণ ওখানে সাতটা ভোজনের জন্য। আমরাও অবশ্য থাকতাম সঙ্গে—প্রসাদভোজী হয়ে। বলা বাহুল্য হযত আহারের 'নে' না নিজে ঠিক করতেন, ঝাঁপুনি কে সবটা নিজে দেখিয়ে দিতেন এবং সহজে করেকটি পদ রান্না করতেন। তাই বলছিলাম প্রসাদভোজী আমরা কৃতার্থ হয়েছি। তখন অবশ্য কেবল বাহা আহ্বাদন-টাই উপভোগ করেছি—তার পিছনে কি বস্তু ছিল তা আর হৃদয়ঙ্গম করছি। আহারের পরে সমুদ্রের দিকে রাস্তার উপরে ছাতে উঠতাম গিয়ে। শ্রীঅরবিন্দ ও না একবারে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা কইতেন। আমরা আমাদের নত রইতাম। কোন কোন দিন আহারের পর শ্রীঅরবিন্দকে automatic writing-এর জন্য অনুগ্রহ করা হত। তাঁর হাত দিয়ে তখন বেশব লেখা যেত হত ভয়ানক interesting তা। আমার মনে আছে কে একজন এসে আমাদের প্রত্যেকের চরিত্রের বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছিল—মতিলাল সম্বন্ধেও অনেক কিছু বলেছিল। একদিন কে একজন বলল আমার সম্বন্ধে যদি কিছু বলা হয়। না কিন্তু অবশি বলে উঠলেন—'আমার সম্বন্ধে কিছু না।' শ্রীঅরবিন্দের হাত আপনি খেনে গেল তখন।

যাহোক এই বাড়ীতে মা যখন একদিন উঠল বড়বুড়ি তৃদান। বাড়ীটি পূর্য্যো—
প্রার গলে হায় আর কি ! শ্রীঅরবিন্দ বললেন, শ্রীমাকে ওখানে আর থাকতে দেওয়া চলতে
পারে না—আমাদের বাড়ীতে নিতে আসতে হবে। এইভাবে শ্রীমা এলেন আমাদের কাছে,
রয়ে গেলেন চিরকালের জন্য মা হয়ে। তবে তখন তিনি মা নাম গ্রহণ করেন নি, আমাদের
সুখে সে নামে অভিযুক্ত হতে আরো ছ' বছর লেগেছিল (১৯২৬ অবধি)। এধারকার
বড়বুড়ি হয়ে উঠল আশীর্বাদ—সত্যসত্যই প্রকৃতি যেই ভাগবত উদ্দেশ্যের সাক্ষ্য সহকারী
হয়ে (collaborator) ঠাঁড়ালেন।

মহামানবের সাংগঠনী

(ঐক্যবন্ধন অবলম্বনে)

সমঃ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৮)

গেনবাস্তে ব্রাহ্মণযুগের যজ্ঞ * সম্বন্ধে সানান্য আন্দোলন করিয়া। এবারে ওই বিষয়ে আরও দু'একটা কথা বলবো। সেই সময়ে সে-যুগের ঠাকুর সেবতারাও আসবেন হরত একটু আধটু।

তখনকার মানুষেরা যজ্ঞ না হলে এক পা চলতেন না, এবং যজ্ঞের অতীতে সেবতারার থাকতেন মানুষের খুব কাছাকাছি, এমন কি সাধারণ মৈনলিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এইটাই হলো সে-যুগের বিশেষত্ব, এখানেই তার ঐকান্তিক পার্থক্য আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রা থেকে। বলতে পারেন, কেন, আমরা ও তে মিলিয়ে মিলিয়ে গিয়ে নিরুন্নিত পূজা উপাসনা প্রার্থনা করি, তবে তফাতটা কোথায়? পূজা উপাসনা করি বটে, কিন্তু তার অনেকটাই কি শুধু নিয়মবদ্ধ, এমন কি অনেক সময় লোক দেখানোর মনো নয়? এমন অবস্থা হতে পারে যে যখন যোরতর মুখ লাগে, যেমন গত দুই মহাযুদ্ধের সময়, কিংবা মহামারী আসে, অথবা অন্য কোনো কারণে প্রাণে ঝুঁকিত ভয় চোকে, যেমন কিছুদিন আগে অষ্টগ্রহের নাম করে দেশবিদেশে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল—এরকম কোনো বিশেষ উপলক্ষে ঠাকুরসেবতারার আমাদের কাছে হঠাৎ সম্মান হয়ে ওঠেন। কিন্তু ভগ্নী একবার কাটিয়ে উঠতে পারলেই আবার যে কে সেই। এটা জান কি বন্ধ সে-বিচার এখানে অবান্তর। বড় জোর বলা যায় এই হচ্ছে তখনকার মানুষের, অন্ততঃপক্ষে সভ্যজগতের বৃত্তিগতি।

যে প্রাচীন যুগের কথা বলতে বসেছি তখনকার বৃত্তিগতি ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। তাই তো আমরা আর ব্রাহ্মণগ্রন্থ পড়ি না; যদিও বা কেউ কেউ পড়ি প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস

* যজ্ঞ এবং বিবিধ যজ্ঞ হল বিব্রিগতের প্রতীক (ঐক্য ব্রহ্ম)।—বিবিধ কথারা অনুগ্রহ করে চলে বিভিন্ন মানবজাতি তাদের স্তম্ভ (যজ্ঞ, কব) অনুগ্রহে। যজ্ঞ কব অর্থে ঐক্যবন্ধন সম্বন্ধ—নিরুন্নিত জেনা উন্নতি জেনার কাছে আপনাকে উৎসর্গ দিবেশন করে সভ্য কবজতির মত—এই বিবিতার্ব বাহ অনুগ্রহে করে কলে পড়ে অর্থে রূপে অনুগ্রহে সুশোভিত করে বরা হয়।—সম্পাদক

উচ্চতর কবিতাও চিন্তা, ঠিক যেনে বৃষ্টিতে পারিমা, অনেক দশক যেনে হয় এ যেনে কার অবান্তর প্রকাশ। কিন্তু তখনকাল লোকের কাছে এর মূল্য ছিল অসামান্য, হয় তো বা আধুনিক জগতে সৈজ্ঞানিক প্রবেশ চেয়েও বেশী। নয় তো কি রকম করে সম্ভব হয় হাজার হাজার পাতার দ্রুত ভাষার লেখা বই—তাও পড়ো নয়, প্রায় সবটুকুই নিছক প্রমাণ—আদ্যোপান্ত বৃষ্টি? শুধু পাখনের প্রকাশ নয়, আরও কিছু নিশ্চয় আছে এর পেছনে। সেটা কি পদার্থ সর্বপ্রথমে তা জানা দরকার। তা জানলে হয় তো অতটা দুর্ভেদ্য লাগবে না।

আমাদের সাধারণ মানুষের একটা চিরন্তন সমস্যা কিং কর্তব্য। জীবনের প্রতি পক্ষে এই সমস্যাই আসে। এবং সমস্যার সমাধান করি নিজেদের ব্যক্তিগত শক্তি এবং অভিজ্ঞতা অনুযায়ী। সমাধানের পেছনে কিন্তু অনেকটা অজ্ঞাতসারে থাকে যাকে এক কথায় বলা যায় দেশধর্ম বা যুগধর্ম। এবং এই দেশধর্ম বা যুগধর্ম বদলায় কালের গতিতে। এ-যুগের মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় ঠাকুরদেবতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না তার একটা কারণ নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। বর্ষাযুগে যে থাকত শালের ভরসা, কারণ তখনও তার বৃষ্টি শুনে থাকলেও বিশ্বাস করবার কবিতা তেমন লোপ পাবনি। তারও আগের যুগে যে "ধর্মের" আধিপত্য—যেমন আমাদের মহাত্মারও সময়। ব্যক্তিগত নতানত নয়, শালের বচন নয়, শালের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, যাদের মূনিরূপিণী বলা হত, তারা বা ভেবেচিন্তে ঠিক করেছেন, যে-আশ্রম মত মানুষকে চলতে বনেছেন তাই হল ধর্ম,* ব্রাহ্মণ-উপনিষদের যুগেও "ধর্ম" ছিল, কিন্তু ধর্মের আধিপত্য তখনও আরম্ভ হয় নি। তখনকার কালে, এবং আরও প্রাচীন মহাঐতিহ্যের যুগে, ধর্মের চেয়েও বড় জিনিষ ছিল রূপক, বা symbolism। কিসের রূপক? লোকচক্ষুর অজ্ঞাতসারে যে বিশাল অলৌকিক জগৎ রয়েছে—দিনের আলোর আড়ালে লাকা বিরাট নক্ষত্রলোকের বস—সেই হলো আসল সত্তা। পৃথিবীতে যা কিছু হয়, যা কিছু জানা যে, তার উৎসই হলো সেই অদৃশ্য জগৎ। আমাদের লৌকিক জগৎ তার প্রতিচ্ছবিমাত্র, রূপক বিশেষ। অতএব, মানুষ যদি সত্যপথে চলতে চায় তাঁকে সেই অপার্থিব লোকের খবর রাখতে হবে, তার নিয়মকানুন বেনে চলতে হবে। এখন প্রশ্ন ওঠে, কে সত্য জানে সে-সব অদৃশ্যালোকের? উত্তর হলো, ঋষিরা, কারণ তাঁরা হলেন সত্যপ্রিয়, কবি। বৈদিক এবং ব্রাহ্মণ যুগের মূল প্রতিষ্ঠা এই বিশ্বাস, এই ধারণার ওপর। সে-যুগকে সঠিক বৃষ্টিতে বলে তখনকার এই মনোভাবটা অস্বীকার করলে চলবে না। ব্রাহ্মণ-যুগে প্রতি ছাত্র তার প্রাণ পাওয়া যায়।

যজ্ঞের কথাই ধরা যাক না কেন প্রথমে।

যজ্ঞ বলতে আমরা বুঝি আগুনে ধী ঢালো। ব্রাহ্মণকার কিন্তু ঠিক তা বলে করতেন

* পদ্যরচন অর্থে ধর্ম হল অজ্ঞাতব্য অপ্রতিষ্ঠিত নির্দেশ ও অনুশাসন—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রাণের শাসন অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় নির্দেশ ধর্ম।—সম্পাদক

না। মানুষ যা কিছু পায় সেবতাপের কাছ থেকে পায়, এবং যজ্ঞ দিয়ে সেবতাপের ভুই করিতে হয় প্রথমে। শতপথে (৫।১।১।১-২) এ বিষয়ে ভারী হস্তের একটি খণ্ড আছে। সেবতা এবং অমৃত দুইই প্রজাপতির সৃষ্টি, গোড়া থেকেই দুইএর মধ্যে বিশেষ ঝগড়া—“সেবাস্চ অমৃতাস্চ উভয়ে প্রাণাপত্যঃ পম্পধিরে”——কে বড় হবে এই নিয়ে। অমৃতের স্বভাব সে যা কিছু সব নিজেই অনেক রাখতে চায়, অপরকে দিতে চায় না, তার অহঙ্কার বড় বেশী—“ভূতো অমৃত্য অতিমানেন এব কসিন্ নু স্বয়ং জুহ্যাম ইতি যেষু এব আস্যামু ভুততঃ চেকঃ”। তার ফলে হলো পরাভব—“তে অতিমানেন এব পরাবভূঃ”। অতএব (এইখানে হলো ব্রাহ্মণগ্রন্থের বিশেষত্ব) কখনও বেশী অহঙ্কার করতে নেই, অহঙ্কারই পতনের মূল—“তন্নাৎ ন অতিমন্যোত, পরাভবস্য হ এতৎ নুৎ বৎ অতিমানঃ”। সেবতে পাচ্ছি এখানেও যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে, কিন্তু এ যুক্তির মূল ভিত্তি মানুষের বুদ্ধি নয়, এখান থেকে গোড়াপত্তন অদৌ-কৃতিক অগতঃ। সেবতার কিস্তি জানতেন স্বার্থপরতার লাভ নেই, তাঁরা পরস্পরকে সাহায্য করতে থাকলেন—“অথ সেবা: অন্যান্যাসিন্ এব ভুততঃ চেকঃ”। তার ফল কি হল? তাঁরা পেলেন যজ্ঞের ভাগ, স্বয়ং প্রজাপতি নিজে থেকে দিয়ে দিলেন তাঁদের হাতে—“তেভা: প্রজাপতি: অন্নান: প্রদশৌ যজ্ঞো হ এথা: আসি, যজ্ঞো হ সেবানা: অমৃত্”।

আর একটা রূপকের উদাহরণ দিই (শতপথ ২।২।২।৮-১৪) যজ্ঞের প্রধান বাহন অগ্নি, অতএব যিহাতি গৃহস্থের প্রথন কর্তব্য হল বাড়ীতে অগ্নিহোত্রের ব্যবস্থা করা। কি লাভ তাতে? এখানেও সেই সেবামন্ত্রের কাহিনী। গোড়াতে অমৃত সেবতার মধ্যে অমর কেউ ছিল না, আরা ছিল না কারণ একমাত্র অগ্নি ছাড়া—“তে উভয়ে এব অনাঙ্গান: আসু: নর্ত্যাসু: আসু:, অনাস্য দি নর্ত্যাসু: তেষু উভয়েষু অগ্নি: এব অমৃত: আস”। তার ফলে অমৃতের সেবতাপের বেগে ফেলতে আরম্ভ করল একে একে, তাঁদের সংখ্যা গেল কমে—“স যঃ হ স্নং এথা: ধুতি তৎ হ স্নং বৈ স (হত এব) ভবতি; ভূতো সেবা: তনোক্তা: ইন পরিশি-
-ধিধিরে”। তখন সেবতার ঠিক করলেন পত্রদের জয় করতে হলে কোনো নকলে। কি করে করা যায়? অগ্নির সাহায্য দরকার, অগ্নিকে তাঁরা নিজেদের মধ্যে স্থাপিত করলেন, তাই থেকেই তাঁদের অমরত্ব এবং যজ্ঞে বিজয়লাভ। “তে হ উটু:, হন্ত ইদং অমৃত: অগ্নরাগ্নি * আদধারৈহ তে ইদং অমৃত: অস্তরাগ্নি আধায়, অনুতা: ভূত্য়া, অধৃগা: ভূত্য়া, স্বর্ধগান্ সপ-
-ত্য়ান্ নর্ত্যান্ অভিতবিষ্যান: ইতি”। অতএব যে আহিতাগ্নি, যার গৃহে অগ্নি বিদ্যমান (বেদের মধ্যে মানুষের সেহকে অনেক সময় “বুরোণ” অর্থাৎ ঘরবৃত্ত বাড়ীর সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে) তার কখনও পরাভব হয় না—“তন্নাৎ বৎ আহিতাগ্নিঃ অনাহিতাগ্নিঃ চ স্পর্ধেতে, আহিতাগ্নি: এব অভিবভতি”। এই অনেকাধি গৃহীকে আহিতাগ্নি হতে বলা হয়।

* লক্ষ্য: অস্তরাগ্নি অমর অগ্নিকে আশ্রয় করত হলে—গৃহ হল সেহদের প্রতীক।—দশ্যাক

যজ্ঞের পুরোহিতীয়ত্ব কোথায় দেখা গেল, এবার বিধি সহজে কিছু জানা দরকার। যজ্ঞ বেদন তেমন ভাবে কলনেই হল না, বিধিপূর্বক করতে হয়। “যং বৈ যজ্ঞস্য বিধ্যা ক্রিয়তে বাস্যা তং বৃহসি কথুতি” (পতপথ ১।১।১৪)—যজ্ঞে বিধ্যা আচরণ করলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। “যং যজ্ঞে অভিরূপং তং সমৃদ্ধং” (ঐতরেব ৭।১৩)—বিধিবদ যজ্ঞ করলে তবে তাই ফল ভাল হয়।

ব্রাহ্মণগ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তুই হল যজ্ঞের বিধি নিয়ম। অতএব বিধিব্যবহার সম্বন্ধ আলোচনা করতে হলো পুঁথি বিরাট হয়ে যায়। তবুও এ বিষয়ে প্ৰচুরটো প্রধান প্রধান জিনিষের কথা এখানে বলা যেতে পারে। বেদন, যজ্ঞে অধিকার কার, দীক্ষিত ব্যক্তির কি রকম নিয়ম পালন কর্তব্য, যজ্ঞে যজ্ঞের প্রয়োজনীয়ত্ব কতখানি, পুরোহিতের কি দরকার, তাঁদের দক্ষিণার ব্যবহার কি রকম, যজ্ঞে বলিদানের কি ব্যবস্থা ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই আলোচনার প্রসঙ্গক্রমে তখনকার সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতি সহজেও কিছু জানা যাবে।

প্রথম প্রশ্ন অধিকারের। যজ্ঞসংহিতার বুণে কি ছিল সঠিক বলা শক্ত, কিন্তু ব্রাহ্মণ-বুণে একরকম নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় (তখনকার দিনে রাজ্যনা বলা হত,) এবং বৈশ্য, এদেরই শুধু যজ্ঞে অধিকার, শূদ্রের অধিকার নেই—“ব্রাহ্মণো বা এষ রাজনো বা বৈশ্যো বা, তে দি যজ্ঞিগাঃ” (পতপথ ৩।১।১৯)। তার কারণ কি? পতপথ বলেন, “দেবান্ বা এষ উপাবর্ততে যো দীক্ষতে” (৩।১।১৩)—দীক্ষিতব্যক্তি দেবতাদের সন্তুষ্কটবর্তী হন। “স দেবভানাঃ একো ভবতি”। তাছাড়া দেবভায়া যার তার সঙ্গে কথা বলেন না, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করবার অধিকার কেবল উচ্চচরণের—“ন বৈ দেবাঃ সর্বেণ ইব সংবহয়ে, ব্রাহ্মণেন বা এষ রাজনো বা বৈশ্যেন বা, তে দি যজ্ঞিগাঃ”। তাই যজ্ঞসাধনার সম্বন্ধে প্রবেশাধিকার নেই—“তং ন সর্বে ইব অভিপ্রপদ্যত” (৩।১।১৯)। যদি শূদ্রের সঙ্গে দীক্ষিত ব্যক্তির কোনো কথা কইবার দরকার হয় তাহোলে দ্বিজাতিদের মধ্যে একজনকে দিয়ে ঝগড় পাঠাতে হবে—“বদি এনং শূদ্রেণ সংবাদো বিলোং, এতেষাং এব একঃ ক্রুগাং ইনঃ ইতি বিচক্ ইনঃ ইতি বিচক্ ইতি; এব উ দীক্ষিতস্য উপচারঃ” (৩।১।১৩)।

দ্বিজাতিমাত্রেরই যজ্ঞে অধিকার দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু তার মধ্যেও একটু জাত-বিচার আছে। যজ্ঞের আসন মালিক হলেন ব্রাহ্মণেরা, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে যজ্ঞ করতে দেওয়া হয়েছে শানিকটা দায়ে পড়ে—ব্রাহ্মণকারের মনে হয় যেন এই রকম অভিরুচি। পতপথ বলছেন (১।১।১২) “এতে বৈ ব্রাহ্মণাঃ যজ্ঞস্য প্রাধিকারঃ যে অনুচানাঃ, এতে দি এনং তনুতে, এতে এনং জনরতি” —বীরা ব্রাহ্মণ, বীরা বৈশ্যপাঠ সম্পূর্ণ করেছেন, তাঁরাই যজ্ঞের কর্তা, তাঁদের হাতেই যজ্ঞের বিধার। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলা হয়েছে ঐতরের ব্রাহ্মণের (৭।১৯) এক কাহিনীতে।

প্রজাপতি যন্ত্র সষ্ট করলেন, তার পর ঠিক করে দিলেন কে যন্ত্রের বলিতে ভাগ পাবে আর কে পাবে না—“এতা বৈ প্রজাঃ হত্যায়ঃ যং ব্রাহ্মণাঃ, অথ এতাঃ অহত্যায়ঃ যং রাজান্যঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ”। তার পর কিন্তু যন্ত্র পালিয়ে গেল সবাইয়ের হাত এড়িয়ে। ব্রাহ্মণ কত্রিয় উভয়েই গেলেন তার বোঁকে। কত্রিয়ের হাতে ধনুর্বাণ, গায়ে কবচ, তাঁরা চলেছেন ঘোড়ার টানা হয়ে চড়ে। এমন দেখে দাবড়ে গিয়ে যন্ত্র তাঁদের কাছে বৈসন না—“আয়ুধেভাঃ য সন অস্যা বিজ্ঞানায়ঃ”। ব্রাহ্মণের হাতে ছিল যন্ত্রেরই উপকরণ, তাই সেনপর্গন্ত যন্ত্রের বন ডিম্বল, ব্রাহ্মণের কাছে ফিরে এল আবার যন্ত্র—“জ্ঞায়া স্বানি আয়ুধানি ব্রহ্ম উপাবর্তত”। তাই যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আরও শুধু ব্রাহ্মণের মধ্যেই—“তস্যাং হ যপি এতহি যন্ত্রঃ ব্রহ্মণি এষ ব্রাহ্মণেষু প্রতিষ্ঠিতঃ”। কত্রিয়রা দেখলেন যন্ত্র তাঁদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। তখন তাঁরা ব্রাহ্মণের পরগাপন্য হয়ে বললেন—“উপ না যস্মিন্ যন্ত্রে দৃশ্য ইতি”—আমাদেরও বেন ডাকা হয় যন্ত্রে। ব্রাহ্মণ রাজী হলেন এক সর্তে, কত্রিয়কে তার সন্ন্যাসে ছাড়তে হবে যন্ত্র করতে বসে, তাকে ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করতে হবে বীকিত অবস্থায়—“তং বৈ নিধায় স্বানি আয়ুধানি ব্রহ্মণঃ এষ আয়ুধৈঃ ব্রহ্মণঃ রূপেণ ব্রহ্মভূষা যন্ত্রঃ উপাবর্তত ইতি”। কত্রিয়কে রাজী হতে হল এই সর্তে। সেবারতনে অর্ধগৌরব শঙ্কিত অঙ্গার একেবারে যেমানান, এই শিক্ষা তারতের সত্যতন। ব্রাহ্মণগ্রন্থের এই প্রাচীন কাহিনী তার একটা বিশেষ নিবর্ণন।

সে-মুগেও কিন্তু ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেশ শানিকটা ছাতি-গৌরব এসে গেছে। তার একটা প্রমাণ দেখতে পাই ঐষি কবচের নকশা (ঐতরেয় ২। ১৯ : কৌশীতকী ১২। ৩)। ঐষিরা সরস্বতীর তীরে সন্তে, অর্থাৎ সাম্যিকব্যাপী যন্ত্রে বসেছেন, তাঁদের মধ্যে লেখা গেল কবচও আছে। তাঁকে বলা হল “দাস্যঃ বৈ যং পুত্রো অসি ন হজা সহ ভাক্ষিয়াম্যঃ ইতি”—তুই দাসীর ছেলে, তোরা সঙ্গে আমার খাব না। কবচ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে যন্ত্র থেকে বেরিয়ে গিয়ে সরস্বতীর উপাসনা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন—“তং হ ইয়ং অনু ইয়ান”—স্বয়ং সরস্বতী এলেন তাঁর পেছনে পেছনে। তাই সেখান থেকে ঐষিদের চেতনা হয়, তাঁরা বললেন, তুনি নিশ্চাপ, “যং বৈ নো শ্রেষ্ঠো অসি”।

একটা প্রশ্ন উঠল, ব্রাহ্মণের কি সব যন্ত্রে অধিকার আছে? যেমন বড় যন্ত্রের মধ্যে বাহুপেয়, রাজসূয়, অগ্ন্যেধ—এগুলোতে ব্রাহ্মণের কি দাত, এ তো কত্রিয়ের যন্ত্র? বাহুপেয় সন্তে ব্রাহ্মণকারণের একটু সন্তেই আছে। একদল বলেন,—“তং যাত্রঃ ন বাহুপেয়েন যজতে” (শতপথ ৫। ১। ১। ১৯)। কারণ যে বাহুপেয় করে সে হয় সর্বজিৎ—“সর্বঃ বৈ এষ ইদং উজ্জয়তি যঃ বাহুপেয়েন যজতে”। এবং বেহেতু “সর্বঃ উ হি এষ ইদং প্রজা-পতিঃ” স্বয়ংমানের সন্ততির গায়ে পাপ লাগতে পারে—“তস্য ঈশুরঃ প্রজা পাপীরসী ভবিতোঃ”। আর একদলের কিন্তু ঠিক উল্টো মত। এটা বিশেষভাবে ব্রাহ্মণেরই উপ-যন্ত্র যন্ত্র, কেননা স্বয়ং বৃহস্পতি এই যন্ত্র করেছিলেন, এবং ব্রাহ্মণই বৃহস্পতি—“স বৈ এষ

ব্রাহ্মণ্য এই বক্ত: যৎ অনেন বৃহস্পতি: অরজত: ব্রহ্ম হি বৃহস্পতি:, ব্রহ্ম হি ব্রাহ্মণ:”। এবং রাজাদের হ্রো বটেই, কারণ ইন্দ্র, যিনি দেবতাদের মধ্যে কত্রিয়শ্রেষ্ঠ এবং পাণ্ডিষ রাজাদের রক্ষাকর্তা, তিনি স্বয়ং এই বক্ত করেছিলেন; তাছাড়া রাজপণেরেণ দ্বারা সাপ্তাহ্য-
লাভ হয়—“অথো রাজনাস্য, যৎ অনেন ইন্দ্র: অরজত: কত্র: হি ইন্দ্র: কত্র: ব্রাহ্মণ্য: রাজা বৈ রাজসূয়েন ইষ্টু। ভবতি, স্তুষ্টী রাজপণেরেণ” (শতপথ ৫।১।১।৯-১০)।

রাজসূয়, অশ্বমেধ সংক্লে অবশ্য কোনো গোল নেই। এ দুটোই নিম্নক রাজাদের বক্ত, কারণ ব্রাহ্মণ হ্রো আর রাজা যানল্যভে পারবে না। তাছাড়া অত ষোড়া বা ষোড়শওয়ারই কোথায় পাবে অশ্বমেধেব ষোড়ার পেছনে ছোটবার বক্ত? তাই শতপথ বলেছেন—
“ব্রাহ্ম: এব রাজসূয়ন্ রাজা বৈ রাজসূয়েন ইষ্টু। ভবতি, ন বৈ ব্রাহ্মণো রাজ্যায় অলন্” (৫।১।১।১২)। এবং “কত্রিয়বক্ত: উ বৈ এব: যৎ অশ্বমেধ: ইতি” (১৩।৪।১।২)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লম্বা লিষ্ট আছে কোন্ কোন্ রাজারা অশ্বমেধ রাজসূয় বক্ত করেছিলেন। ব্রাহ্মণবৃণের রাজ্যবাবস্থা আলোচনায় সে কথা বনব, এখানে তা অপ্রাসঙ্গিক।

এ সব বক্ত বক্ত বক্ত রাজারাজড়াদের জন্যে। সাধারণ মানুষ দ্বারা, দ্বারা “বিশ:” বা বৈশ্য, অর্থাৎ দেশের শতকরা নিরানব্বুই জন লোক, তাদের জন্যে কি ব্যবস্থা? তারা, যদি অবশ্য পুত্র না হয়, বাড়ীতে তিনবেলা অগ্নিহোত্র করবে। তাইতেই তাদের সব পাপ ক্ষয় হবে, যেমন সাপের গা থেকে খোলস পড়ে যায়—“যদা হ বৈ অগ্নি: হত: নির্মুচ্যোত, এবং সর্বস্নাতং পান্বন: নির্মুচ্যোত য: এবং বিশ্বান্ অগ্নিহোত্র: জুহোতি”। সমস্ত দেবতারা এসে দ্রাক্ষিত্র হন তার ঘরে—“তৎ উ হ বৈ বিশ্বে দেবা: অগ্নিহোত্র: জুহুত: গৃহান্ আগচ্ছতি” (শতপথ ২।৩।১।৬-৭)। অগ্নিহোত্রে সকল দিচ্ছাত্রের অধিকার, যে বাড়ীতে তিনবেলা আচতি দেওয়া হয় না সে বাড়ী অনার্যের।

(ক্রমশ:)

যোগসম্বন্ধ-প্রসঙ্গ

অনির্বাক

[দ্বিতীয় পায়—সম্বন্ধ-জ্ঞানযোগ]

২২

বিজ্ঞান

সেই প্রাণ মনের উজ্জানে বিজ্ঞান—চৈতন্যের চতুর্থ ভূমি। এই ভূমিই ঋণার্থ যোগভূমি। বিজ্ঞানরূপে হওয়াই হল যোগরূপে হওয়া। অপার্থ আর পরার্থের মাঝে সেতু এই বিজ্ঞান, যাকে বলতে পারি সং-চিৎ-আনন্দের স্বরূপশক্তি। এই শক্তির যাবেশে ঘটে অপরা-প্রকৃতির রূপান্তর, অগত্বেষ্টির আনন্দ পরিবর্তন। অপার্থে প্রকৃতির ফেলেছো ত্রা এখানে অপদাক্রিড হয়, মূন্দরী প্রকৃতি হয় চিন্ময়ী, আনন্দের স্বাতন্ত্র্যে মুক্তচক্ষু। ইচ্ছা তখন আঙন ধরে তার অধু-পরমাণু হয়ে যায় সাদৃশ্য, ইচ্ছা আর আঙনের প্রকৃতি আর পুরুষের অন্যান্য-সময় তখন পূর্ণ।

দিব্যপুরুষের সাধর্ম্যের এই হল প্রথম ধাপ। মনের মায়া এখানে সম্পূর্ণ তিরোহিত, কেননা অধিনাস পর্যন্ত ছিল তার অধিকার। মানসোত্তর ভূমিগুলির কথা অন্যত্র বলেছি। তারা সবাই নদাভূমি, প্রাকৃত মনোভূমি হতে উৎকৃষ্ট; কিন্তু তত্ত্ব ত্রায়া অতিমানস নয়। অথচ অতিমানস বা বিজ্ঞান আর নিরোধযোগের অবনীভাব এক কথা নয়। অতিমানস মন এবং মানসোত্তর ভূমিসমূহের প্রসূতি। একের বহু হওয়ার তাগিদে অতিমানস হতে তারা বিকটে হয়েছে। যেখানে বহুর বোধ, সেখানেই ভেদের বোধ; আর এই ভেদবুদ্ধি হল মানসপ্রকৃতির বিশিষ্ট লক্ষণ। প্রাকৃত মন হতে মানসোত্তর ভূমির দিকে যত আনন্ড উন্মিষে যাই, ভেদবুদ্ধি ততই অভেদজ্ঞানের বশে আসে। কিন্তু তার সম্পূর্ণ বশীকরণ সম্ভব হয় একমাত্র অতিমানস বিজ্ঞানের ভূমিতেই। প্রকৃতি তখন পুরুষের দ্বীয়া প্রকৃতি, তার স্বরূপশক্তি। তাই পুরুষের দৃষ্টি আর প্রকৃতির স্বষ্টিতে তখন কোনও বাবধান থাকে না। তখন দৃষ্টই স্বষ্টী। শক্তির ধারা তখন নান্দে উজ্জান থেকে জটীর দিকে, তার শতমুখ নিঃস্রবণে তাই কোনও ব্যাঘাত নাই। কিন্তু প্রাকৃত ভূমি হতে উন্মিষে যাবার সময় শক্তি বাধা পায়, তার বিকার ঘটে। চেতনা বিজ্ঞানভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলে পর আর এটি হয় না।

*

এই বিজ্ঞানের স্বরূপ কি ? উপনিষদে কোথাও-কোথাও বিজ্ঞান আর বুদ্ধি সনপর্যায়ের শব্দ। তাই থেকে কেউ-কেউ বিজ্ঞান আর শুদ্ধবুদ্ধিকে এক ধরে নিয়েছেন। তাঁদের মতে প্রাকৃত বুদ্ধি ওপমণী বলে অবিজ্ঞ; আর শুদ্ধবুদ্ধি ওপাতীত বলে বিজ্ঞ পৌরুষেয়-প্রত্যয়ের ধারক। এই পুরুষেরও পরিচয় ওপাতীতবে, ওপাশীশবে না।...কিন্তু বস্তুত পুরুষ যেন ওপাতীত, তেননি ওপাশীশও। উভয়ই বিজ্ঞান তাঁর স্বরূপান্তি। তাঁকে কেবল ওপাতীত বলে ধারণা করবার আশ্রয় হতে পারে মনে। তাই তার কাছে বিজ্ঞান শুধু লগ্ন থেকে নিঃস্রবের দিকে উজিয়ে ধাবার শক্তি। বিজ্ঞানের ঐ-পরিচয় যে সম্পূর্ণ নয় তা বলাই বাহুল্য।

আবার উপনিষদের প্রমাণে কেউ-কেউ বিজ্ঞান আর চিত্তখনর এক বলে মনে করেন। তাঁদের মতে বিজ্ঞান একপ্রত্যয়সার—আদিভাবগুলোর মত আর নতুন রশ্মিভান সংহত হয়েছে। এও বিজ্ঞানের প্রত্যয় নিশ্চয় : কিন্তু শুধু সংহতন নয়, বিকিরণও তার ধর্ম। যেন প্রাকৃত ভূমিতে চিত্তবৃত্তি, তেননি বিজ্ঞানের চিত্তবৃত্তি। কিন্তু চিত্তবৃত্তি আর চিত্তবৃত্তির বৌলিক তফাত হচ্ছে, যাদেরটি নির্ভর করে পরোক্ষ সঙ্গিকর্ষের (indirect contact) উপর, আর পরেরটি তাৎপাচ্যবোধের (knowledge by identity) উপর। কিছু-না-কিছু তাৎপাচ্যবোধ সব জ্ঞানের মাঝেই আছে, কেননা বিষয়কে যানিকটা 'আরম্ভ' না করে বিষয়ী তাকে জানতে পারে না। প্রাকৃত চিত্তে আরম্ভ করবার পুণ্য আছে, পূর্ণতা নাই। একটা-কিছুকে খুব নিবিড় করে জানলেও তাকে আরম্ভ বাইরে রেখেই জানি, 'হয়ে' জানি না। অথচ এই 'হয়ে জানা'ই হল বিজ্ঞানের ধরন। বিজ্ঞান তার ফলে প্রত্যয়কে উৎসারিত করে, আর চিত্ত তাকে আচরণ করে। চিত্তবৃত্তির সঙ্গে চিত্তবৃত্তির এইখানে তফাত। প্রাকৃত চিত্তেও প্রত্যয়ের উৎসারণ আপনা থেকে হয়—আমাদের চিত্ত অহরহ ভাবনা-বেদনা-সঙ্কলনের কত ভাল বুঝে চলে। কিন্তু এই প্রত্যয়গুলি বিকিষ্ট, বিসংগাণী (discrepant) এবং আসলে ইন্দ্রিয়সংবিৎ হতে উৎপন্ন। বিজ্ঞানের প্রত্যয় তার বিপরীত। আত্মবোধ থেকেই সেখানে বস্তুবোধ উৎসারিত হয় বলে তা ঐক্যচক্ষু এবং অবিসংবাদিত। আমাদের প্রাতিভাসংবিতে কখনও-কখনও তার বাতাস পায়।

প্রাকৃত বুদ্ধি যে বিজ্ঞান নয়, তা বলাই বাহুল্য। অথচ আরেকদিক দিয়ে তা বিজ্ঞানেরই বিভূতি। কপাটা এই। প্রাকৃতভূমিতে আমাদের প্রত্যয়ের ত্রিভি হল ইন্দ্রিয়সংবিৎ (sensation)। ইন্দ্রিয় বিশেষকেই (particular) সেবে, সামান্যকে (universal) নয়। অথচ বিশেষ-প্রত্যয়ের সমাহারেই আমাদের মাঝে একটা সামান্য-প্রত্যয়ের উজ্জ্বল হয় : যেন মনুষ্য সেখানে-সেখানে 'মনুষ্যবোধ' প্রত্যয় স্বপাত, যা একটা আত্মর অনুভব এবং বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়র অনুভবের প্রতিভূ। এই সামান্য-প্রত্যয়কে আশ্রয় করে প্রবর্তিত হয় 'অনুমান', যা প্রাকৃত বুদ্ধির একটি বিশিষ্ট বৃত্তি। অনুমানে আমাদের জ্ঞানের প্রসার হচ্ছে—যেন বিজ্ঞানে কিংবা মর্শনে। স্বরূপত সে জ্ঞান অতীন্দ্রিয় বলে ইন্দ্রিয়-

প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা তার মাঝে নাই। এই অস্পষ্ট সানানা-প্রত্যয় হল প্রাকৃত চেতনায় বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশের ফল। ইন্দ্রিয় প্রত্যয়ে স্পষ্টতা আছে কিন্তু সানানাতা নাই; আর বুদ্ধিত প্রত্যয়ে সানানাতা আছে কিন্তু স্পষ্টতা নাই। সানানা-প্রত্যয় যদি ইন্দ্রিয়ানুভবের হত স্পষ্ট হয়, তাহলে এই ন্যূনতার পূরণ হয়। আবার তাকেই বসি বিজ্ঞান।

অনুমানের একটা অনুরোধ-ধারা আছে, আবার সেখানে সানানা হতে বিশেষে ঘাই; যেমন মানুষনাজেই বরণধরী এই সানানা-প্রত্যয় হতে অনুমান করি, আনিও বরণ। এই অনুমানের স্ফুটিতাকে বনে হয় স্ফুট। কিন্তু একেত্রে যে-সানানা-প্রত্যয়টি অনুমানের মূল, তা করণও সম্পূর্ণভাবে আবার ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের গোচর হতে পারে না; সব মানুষকে আনি কোনদিন বরণতে দেখিনি, দেখেও না। স্ত্রীরাং সানানা-প্রত্যয়ের নৈশিচ্য সম্পর্কে সংশয় থেকেই যায়। কিন্তু আনি আবার মাঝে ভুবে গিয়ে বরণধরী বা 'বিশরণ'কে (disintegration) যদি আমার শরীরের ধর বলে প্রত্যয় অনুভব করতে পারি, তাহলে ঐ সংশয় দূর হওয়া সম্ভব। সানানা-প্রত্যয়ের প্রত্যয় তাহলে হয় আন্তর্যোধের বোঝায়। নিয়ন্তর্যোধও আন্তর্যোধের অনুসারী হলে অর্থাৎ বাইরের বিষয়কে ভিতরে টেনে এনে ভ্রমর হতে পারলে তার সম্পর্কে জ্ঞান অপরোক্ষ হয়—এই মূল ধরে সব সানানা-প্রত্যয়কেই আবার প্রত্যয়-যোগ্য করে তুলতে পারি। বলা বাহুল্য, এধরনের প্রত্যয় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বিপরীত। চেতনা এখানে নি-বৃত্ত (inwardised), আর ওখানে পু-বৃত্ত (externalised)। হয়ে জানার মূল কথাও তা-ই: বিষয়কে আমার মাঝে টেনে এনে জ্ঞাতে ভ্রমর হয়ে তাকে 'আবার' বা 'আনি' বলে জানা। যেমন আবার জানতে পারি জানবান্নাতে—হৃদয় দিয়ে। এই ধরনের জ্ঞানকে এদেশের দার্শনিকেরা বলেছেন 'যোগসঙ্গিকর্ষ' (contact through yoga) হতে জ্ঞাত প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ই বিজ্ঞানের প্রত্যয় বা সানানা-প্রত্যয়ের অপরোক্ষ অনুভব।

*

তাহলে জ্ঞানের আরোহ-ধারা এই পরিচর। প্রথমত বাহ্যবিষয়ের ইন্দ্রিয় প্রত্যয়, তারপর আন্তরবিষয়ের মানস প্রত্যয়। মানস প্রত্যক্ষের সঙ্গে সানানাজ্ঞান জড়িয়ে থাকতে পারে, তাহলে পাই বুদ্ধিত প্রত্যক্ষের প্রাথমিক রূপ। এই পর্যন্ত হল প্রাকৃত সোধের সীমা। আন্তরপ্রত্যাকে চেতনায় যদি নিবর্তিত হয়ে নিজেকেই নিজে বিষয় করে, তাহলে পাই আন্তর্যোধ (self-consciousness)। এ-যোগ অপ্রাকৃত এবং বিজ্ঞানের ভিত্তি। আন্তর্যোধ যত অস্পষ্ট হতে থাকে, ততই তার মাঝে ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ হয়ে বিষয়কে জানবার সার্বাধা বেধা দেয়। এই সার্বাধাকে বলতে পারি বোধি (intuition)। বোধিত প্রত্যয় অপ্রাকৃত উপায়ে আমাদের জ্ঞানের প্রসার ঘটায়।

কিন্তু বোধি বিজ্ঞান নয়—বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ বিভূতি। মানুষের মাঝে তা দেখা দেয় প্রাতিভাববিভেদে আকারে, ইন্দ্রিয়শালীর মাঝে সহজাতভাৱ (instinct) হয়ে।

উভয় ক্ষেত্রে জ্ঞান ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ এবং স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু তাব অধিকার সঙ্গীর্ণ, সবক্ষেত্রে তা প্রত্যক্ষানুভূতি নয়। মানুষের নাথৈ নানসংস্কারের ভেতান থাকাত্তে অনেকসময় বোধির বিকারও ঘটে। এইসময় কালপে তাকে বিজ্ঞান বলে মনে করা ঠিক হলে না, যদিও বিজ্ঞানের স্বভাব তার নাথৈ ঋণিকতা। ফুটে ওঠে—স্বতঃস্ফূর্ততায়। বুদ্ধির মত সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হিগাব করে পা ওনে-ওনে চলে না, তীরের মত সোষ্ঠাভুতি নকাকে বিচ্ছ করত্বে পারে।

অনুশীলনের ধারা এই বেষণস্তির সামর্থ্য বাড়ানো যায়। অনুশীলনের একটি ধারা হল চেতনাকে সবসময় অস্তরাবৃত্ত এবং প্রশান্তবাহী করে রাখা। প্রশান্তবাহিতায় আয়বোধ স্কুরিত হবে। অবশ্য এ-আয়বোধ কাঁচা আনির বোধ নয়, পাকা আনির বোধ—যে-আনি আকাশের মত প্রশান্ত প্রশীপ্ত এবং প্রসন্ন অস্ত্রিষের বোধ মাত্র। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, এটি একটি সামান্য-প্রত্যয়, এমন-কি একে সামান্যতম প্রত্যয়ও বলা চলে। এই প্রত্যয়ে বিশেষকে আহরণ করবার কোনও আগ্রহ থাকে না। অথচ আরনার ছবি পড়ার মত বিশেষের প্রতিবিম্ব তার নাথৈ পড়তে থাকে। প্রতিবিম্বের অর্থ আবিষ্কার করা বুদ্ধির কাজ। সাধারণত বুদ্ধি এটি করে মনের নানা সংস্কার এবং আগ্রহের ঘারা পরিচালিত হয়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে বাসনার কোনও প্রবেচনা না থাকায় বুদ্ধির কাছে যে-অর্থ প্রতিভাত হয়, তা কল্পিত নয়, সপাৰ্থ। এই সপাৰ্থতা প্রতিবিম্বের গভীরে বিশ্বেষ মতাকে চেতনায় স্পষ্ট করে তোলে। অভ্যাসের ফলে এই দিখ্যপ্রতিভা এত সচ্ছ হতে পারে যে অবশেষে চেতনার কোনরকম বিকল্পের (mental construction) ছাড়াপাত না হয়ে যা ভূত বা ভবা কেবল তা-ই স্কুরিত হয়।

কিন্তু এমনটির শুদ্ধ এবং সমর্থ বোধিও বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের পরিণাম মাত্র। বৈদিক ঋষিদের একটি উপমা ব্যবহার করে বলা যেতে পারে, বোধির এই জুনি যেন সূর্যালোককে উদ্ভাসিত অস্থিরিকলোক, আর বিজ্ঞান স্বয়ং সেই সূর্যমণ্ডল। অস্থিরিক সূর্যালোকের ধারক, কিন্তু তার উৎস নয়। এই বোধিও তেবনি বিজ্ঞানের ধীপ সাধন (instrument), কিন্তু বিজ্ঞান নয়। এগানেও বোধির ক্রিয়া আহরণমাত্র, উৎসারণ নয়। উৎসারণের স্বতঃস্ফূর্ততা বিজ্ঞানের স্বধৰ্ম।

*

বুদ্ধির সঙ্গে প্রতিভুলনা করে বিজ্ঞানের দক্লপ বোধবার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু ঋণিকতা প্রত্যাক অভিজ্ঞতা না থাকলে ব্যাপারটা বোঝা একটু কঠিন। প্রথমেই বলা যায়, বুদ্ধির ধারা হল আন্তোহের; সে বিশেষ থেকে সামান্য রূপ থেকে ভাবে উঠে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু বিজ্ঞানের ধারা হল অবরোহের : সামান্যের নিশ্চিতপ্রত্যয়ের বিভিন্নরূপে সে বিশেষকে দেখে, রূপের নাথৈ দেখে ভাবের প্রতিরূপ। বুদ্ধির কাছে তব অনুবের, অনুবানকে তার ঋড়া রাখতে হয়, নানা সংবাদী (coherent) প্রত্যাকের ঠেকনা

দিয়ে। কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে তব কন্ঠনকৰণ প্রত্যক্ষ, যা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের নতই এমন-কি তার চাইতেও সুশৃঙ্খলিত এবং সুনিশ্চিত। বুদ্ধি তব হাতড়ে বেড়ায়, ইন্দ্রিয়সংবিৎ তুলনা প্রতিতুলনা অন্যান্য উপমান স্মৃতি করণনা ইত্যাদি তার সাধন। কিন্তু বিজ্ঞানের মাঝে এসবের বিঘ্ননা নাই—সে কিছুই মন্য হাউড়ায় না, যা আছে তাকেই উৎসাহিত করে। প্রাক্‌জড়িত ইন্দ্রিয়সংবিৎ মন ও বুদ্ধির উপর তার আধো এসে পড়ে তাদের রূপান্তরিত করে সত্যের বিশিষ্ট ভিত্তির অবধারণের সার্বিক সাধনরূপে। তাইতে বিশেষ হয় একান্তভাবে মানানোর ব্যর্থনাবহ। মানানাই সেখানে তব আর বিশেষ তার প্রতীক মাত্র। স্মৃতি অনুভব আর করণনার সহায়ে বুদ্ধি সত্যকে দেখে ঘটনার আকারে কালের প্রবাহে ভেসে যেতে: তার সবগুলি পর্ব তার কাছে শুষ্ট নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে কালের শাশ্বত প্রবাহ একটি ক্ষণে মতীত বর্তমান ভবিষ্যতের যোগপদ্যে সংগত। বুদ্ধি যথেষ্ট ধারণা করতে চায় বহুকে ছুড়ে-ছুড়ে; আর বিজ্ঞান যথেষ্টই বিচলিত দেখে বহুর লীনায়ে। বুদ্ধি দেখে বহুর রূপ, রূপের বৈচিত্র্য; আর তার ধারা বাববার বিকিশ্র হরে পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞান দেখে বহুর স্বরূপ, বহুর মূলে দেখে এককে, চক্রের অবলম্বকে (spokes) সন্নিপাত করে লাভিতে। বুদ্ধি দেখে নীতিবৃত্তকে, তাই ভেদের সংস্কার তার বহুগত; আর বিজ্ঞান মনোনের অনুপ্রবেশে ভেসে রূপান্তরিত করে অভেদের সাবলীল বিভিদে, অবিরোধ বৈচিত্র্যে।

বিজ্ঞান যার বিগ্রহ, সেই বিজ্ঞাননয় পুরুষ আধারে বনোয় পুরুষের অন্তরতর এবং প্রশান্ত। তার আদিকরণেই যোগসিদ্ধির সূচনা। কিন্তু আগেই বনেতি, বিজ্ঞানই উত্ত-রায়ণের শেষ ধাপ নয়, অপসার্য এবং পরার্থের মাঝে সে নেতৃত্বরূপ। বিজ্ঞান সং-চিং-আনশের স্বরূপ-শক্তি। স্বরূপে সে উভাস, আর শক্তিতে সে প্রচোদনা। বেদে তাই তার একটি সংজ্ঞা হল সূর্য, আরেকটি সংজ্ঞা সন্নিহিত—যিনি আধারে-আধারে ধাকে প্রচোদিত করছেন সৌর-জ্যোতির দিকে। একে উপনিষদে বলা হয়েছে অতিসূর্য, যা বিসৃষ্টির সহচরিত। বিসৃষ্টি বিচলুত্ব, যার অতিসূর্য সংহরণ। শক্তির উদ্ভাস-ভাটায় দুটিই হল বিজ্ঞানের দানন্দলীলা। ব্রহ্মের প্রজ্ঞা আনন্দ এবং শক্তি বিজ্ঞানেই সঞ্চিত এবং বিধৃত থেকে সৌর ঈশ্বরিতে এবং তেজে স্বরে পড়ছে আনন্দের মাঝে।

বিজ্ঞানের তিনটি শক্তি—গ্রহণ সংহনন এবং বিচলুত্ব; অথবা উপনিষদের ভাষায় ব্রহ্মন সব্ধন ধর্শন (ঈশ)। গ্রহণশক্তির দ্বারা বিজ্ঞান পরার্থের সত্তা চেতনা আনন্দ এবং শক্তিকে নিষ্কের মাঝে অনুভব করতে পারে। সংহননশক্তিকে এই অনুভব বিজ্ঞানের মাঝে দেখা দেয় আদিপ্রত্যক্ষ চিহ্নন বিষয়রূপে, যার মাঝে নিহিত থাকে বিশুরূপের চিহ্নবীজ। পরার্থের শক্তিপাতকে উন্মূখ বিশ্বতার দ্বারা ব্যাবহার গ্রহণ করার ফলে এটি হয়, ভাবের প্রাধিকনে চেতনার পলি পড়তে-পড়তে ভাব যেন স্রাবট বেরে যায়। তার পর বিজ্ঞানের এই চিহ্নন প্রত্যয়ের মাঝে গুরু হয় বিচলুত্বশক্তির খেলা, যার নাম দিতে পারি চিহ্নবিলাস।

এই বিন্যাসে পূর্বমুখের সত্তা চৈতন্য আনন্দ এবং শক্তির ঘনত্বের কে-বিগ্নহবতা, উপ-নিষেদে তাকে বলা হয়েছে তাঁর 'কল্যাণতরঙ্গ'। বিজ্ঞানের তিনটি ক্রিয়াতে আকাশের পরিব্যাপ্তি যেন সৌরবিদ্যে ঘনীভূত হয়ে তারও গভীরে রূপায়িত হল সচিচন্দ্রানন্দঘনবিগ্নহ হিরণ্যের পুরুষে। ননোম পুরুষ যখন বিজ্ঞানভূমিতে আঙ্কুর হয়ে এই পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তাঁর সাধুতো তাঁর চিত্তবৃত্তির রূপান্তর ঘটে চিস্তবৃত্তিতে। গোপের এই হল পরনয়ন।

২৩

বিজ্ঞানের সাধনা

বিজ্ঞানের স্বরূপের আলোচনা হতে বনে হতে পারে, প্রজ্ঞাই বিজ্ঞানের বিশিষ্ট লক্ষণ। অথবা জ্ঞানযোগের সাধনার আনন্দ প্রজ্ঞার উপরেই যে জোর দেব, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তাবলে প্রজ্ঞাই বিজ্ঞানের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, তার নাথের ভূলাবল আরও ধর্ম যে আছে একথা বনে রাখা ভাল। এই সত্যকথাটুকুর পর, কি করে বিজ্ঞানভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় আনন্দ এমন তা-ই দেখব।

মনুষ্যের পর্যায়ে না উঠলে জীবের মাঝে সচেতন যোক্তরূপের প্রবেশ দেখা দেয় না, সূত্রাং তার সাধনাও শুরু হয় না। ননোম পুরুষই হল প্রবর্ত সাধক। প্রাণ আর বুদ্ধির মাঝে বন হল একটি ত্রিবি (intermediate) শক্তি; প্রাণের আবেগ এবং বুদ্ধির পীড়ি দুইই তার মাঝে সক্রিয়। তাছাড়া তার উপর আছে বেহের বৃদ্ধ পাবি। দেহ আর প্রাণের সূচনা এবং আবিলতা তার মাঝে ঋনিকতা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে বুদ্ধির প্রসাদে। বুদ্ধি তাকে বস্তুর নাগপাশ হতে আচ্ছিন্ন করে বুদ্ধি দেয় জাবের লোকে। তখন তাকে আশ্রয় করে সে পায় বস্তুকে প্রশাসন করবার অধিকার। মানুষ হয় বুদ্ধিনির্ভর—দেহ-প্রাণ-মনের সমস্ত সাংবেদন ও ক্রিয়াকে বুদ্ধিপ্রাচ্য করতে পারলে তবে সে তাদের নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

বুদ্ধি বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের উপচরনাত—একথা আগেই বনেছি। সূত্রাং বুদ্ধির সিদ্ধি সাধারণত সত্ত্ব চয় অপজ্ঞা-প্রকৃতির ক্ষেত্রে। বুদ্ধির সহায়তায় মানুষ মনের উৎকর্ষ-সাধন করে—চয় মনসী বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ধার্মিক বা কবি। কিন্তু এতে তার অধ্যাক্ষ-সিদ্ধির পরিচয় নাই। তার জন্য তার চেতনার বোধ বুরিয়ে দিতে হয় প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্তির দিকে; উপনিষদের ভাষায় প্রাকৃত বুদ্ধিকে রূপায়িত করতে হয় 'শূন্য অথবা বুদ্ধিতে' (কঠ)। বুদ্ধির মাঝে সারান্য-প্রত্যয়ের অভাষ আছে, তা-ই তখন হয় বিজ্ঞানসিদ্ধির সাধন।

সারান্য-প্রত্যয়ের একটি বৈশিষ্ট্য হল আনন্ডের বোধ। ইন্দ্রিয় দিয়ে বস্তুকে দেখি সাত্ত্বকে। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বস্তুর পিছনে কেন্দ্রাবলকে আবিষ্কার করি, তার মাঝে স্বভাবতই

বিশিষ্ট দেশ-কালের অতীত একটা সত্যর ব্যক্তনা থাকে। একটি মানুষ আবার কাছে বিশিষ্ট ইঞ্জিরপ্রত্যকের বিষয়। কিন্তু তার অস্তিত্বিত বনুখ্য বেনানসপ্রত্যকের গোচর, তার নাখে আছে সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের ঠাই। এই বনুখ্যের মানসপ্রত্যাককে বলতে পারি আনন্দের 'বুদ্ধিপ্রাচ্য অতীত্ৰিয়' প্রত্যাক। এখানে মনের বুদ্ধি ঘটোছে বুদ্ধির মাখে। আমরা এখন স্বষ্টির ধারাকে উলটে দিতে পারি; বস্তুকে নুখা এবং ভাবকে তার ব্যক্তনা বলে না সেখে ভাবকেই নুখা এবং বস্তুকে তার প্রতিকল্প বলে সেখেতে পারি। যেমন বিভিন্ন মানুষকে সেখেতে পারি এক গাণ্ড অনন্ত বনুখ্যেরই বিভিন্ন। দৃষ্টির এই পরিবর্তন বিজ্ঞান-সিদ্ধির প্রথম সোপান। এতে ক্রমে বহর নুমে আমরা এককে সেখেতে অভ্যস্ত হই। উপ-নিষদ বলছেন, এককের অন্তর্দর্শনে শোক আর মোহ দূর হয়ে যায়। কথাটা অভ্যস্ত পতীর-ভাবে সত্য। বহর দর্শনে চিত্তবৃত্তির যে-বিক্ষেপ, তা-ই বিকোভেরও কারণ। শোক আর মোহ ঐ বিকোভের প্রকাশভেদ। বুদ্ধি বিক্ষেপ আর বিকোভকে অহরহ দূর করবার চেষ্টা করছে বহর নুমে একটা ঐক্যের সূত্রকে আবিষ্কার করে। বাইরের ঐক্যকে আবিষ্কার করা প্রাকৃতবুদ্ধির কাজ, আর অন্তরের বৃত্তির মাখে ঐকা স্থাপন করা শুদ্ধবুদ্ধি শুধা বিজ্ঞানের কাজ। বোগে অর্থাৎ চেতনার অন্তরাবৃত্তিতে সাক্ষিকে এবং পরিব্যাপ্তিতে আন্তর ঐক্যের অবধারণ সহজ হয়। এই অবধারণের চরম পরিণাম অম্বরে এবং বাইরে এক অশও সত্যর অনুভব, যা সর্বত্র অনুসৃত হয়েও সব-কিছুকে ছাপিয়ে আছে। আনি তখন আকাবৎ; সবার মাখে আবিষ্ট এবং উল্লসিত হয়েও সবার অতীত। আনি জীব নই, শিব। আমার অহতা আধারে-আধানে বিনসিত হয়ে পূর্ণাহতা, আবার নিরাধার সর্বাতিত হয়ে পরাহতা। এই আর্চচৈতন্যের বহিরা ও বহুপের উপলব্ধিই বিজ্ঞান।

*

সেহ-প্রাণ-মনের উর্ধে বিজ্ঞান। উর্ধেতম বলেই বিজ্ঞান তাদের নিয়ন্ত্রা। বিজ্ঞান-বাসিত হয়ে আধার যেন হয়ে যায় একটি কননের ধর (ছাশোপা)। হুদয়ে প্রাণের কনন, সূর্যর মনের কনন। কিন্তু কনন ফোটে যে-সূর্যের আলোকে, তার অধিষ্ঠান সূর্যরও উপরে। সে সূর্য বিজ্ঞানের সূর্য। আধারের অতীত হয়ে সে আধারের প্রশ্নাত। তাই বিজ্ঞানের প্রত্যয় হল: আধার নাখেই দেহ—'দেহের মাখে আত্ম' এই প্রাকৃত বোধের বিপরীত। সান্ত আধার তখন অনন্ত চিংগজিবিচকুরপের কেন্দ্র নাত্র। আবার এই কেন্দ্রও একটা দিরেট কিছু নয়। তার মাখে পুত্রভাবে যদি থেকেও থাকে, তা হচ্ছে শক্তি এবং চৈতন্যর। জড়ের পুত্রভাবে সত্তোচ আছে; কিন্তু শক্তি এবং চৈতন্য বিচকুরপধনী বলে তার পুত্রভাবে কোনও সত্তোচ নাই। যেমন আকাশে বিদ্যুন্ময় শব্দতরর সর্বগত। তার একটা উৎস আছে, বহুবোধে তাকে যেখানে-সেখানে বরাও যায়। কিন্তু ভাবনে তাকে কোথাও সম্বৃত্তিত বা নিবদ্ধ করা যায় না। বিজ্ঞানভূমিতে ব্যক্তিগত সত্তা বিন্দুর সম্পর্ক এই ধরনের। বিন্দুর চৈতন্যই ব্যক্তিগতে পরিকীর্ণ। কিন্তু ব্যক্তিগত-ব্যক্তিগতে চৈতন্যের অবরোধ হল অজ্ঞানের

ধর্ম। বিজ্ঞানে অবরোধ নাই। বিশ্বেশ্বর সত্ত্ব ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সত্ত্ব ব্যক্তির বোধ সেখানে অব্যাহত—যেমন দেখতে পাই একই দেহের নাথে বিভিন্ন কোষের সংস্থানে এবং বোধযুক্তিতে। দেহের ভাষায় বিজ্ঞানী 'অগ্নিঐশ্বানরঃ'—খাঁর নাথে ব্যক্তি এবং বিশ্বেশ্বর সত্যতার আর সমন্বয়।

আনন্দোত্তর বোধ বিজ্ঞানের নিত্যসহচর। সান্ত দেহ-প্রাণ-মনের নাথে বশী থেকেও আনন্দা অস্পষ্টভাবে অনুভব করি—যা-কিন্তু আনন্দের একান্ত নিজস্ব ধনে জানি, তার উৎস কিন্তু অনন্ত। আনন্দের দেহ-প্রাণ-মন এক বিশ্বব্রহ্ম বিশ্বপ্রাণ এবং বিশ্বমনেরই অংশ। কিন্তু এই বিশ্ববোধ আনন্দের নাথে খুব তীব্র নয় : বিশ্বেশ্বর একটা হালকা পরিণতনের নাথে আবার কৃত্র আনিটিই এখন নিরেট হয়ে আছে। বিজ্ঞানভূমিতে এই বোধের বিপর্যয় ঘটে। তখন বিশ্বেশ্বর আনন্দোত্তর বোধই তীব্রতর হয়ে সান্ত অহংএর বোধকে আঘাট করে। ফলে প্রাকৃত বোধ একদিক দিগে তার গুণীভূত (subordinated) হয়েও আরেকদিকে এক অকম্পা মহিনায় বিকসিত হয়। উপনিষদের ভাষায় 'শরীর তখন আকাশ, প্রাণ আনন্দ, মন আনন্দ, আত্মার সত্যো এবং শান্তিতে সব-কিছু শব্দ এবং অন্ত।' এ যেন একটা নিরেট স্ফটিকের নাথে সূর্যের আলো অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এক জ্যোতির্ঘন বিচ্ছুরণে তার সত্যের রূপান্তর ঘটান। আনন্দোত্তর বোধ তখন যেমন ব্যাপ্তিতে, তেমনি ঘনতায়—যেমন পরাক্শুণ্ডিতে (objectively) আকাশের আনন্দা, তেমনি প্রত্যাক্শুণ্ডিতে (subjectively) বিজ্ঞানের আনন্দা। বিশ্ব এবং বিশ্বাতীতের আনন্দোত্তর নাথে সর্বাঙ্গ অহত্মার ফে-পুনুক্তি, তার উদ্ভাস যেন চিহ্নবনবিগ্রহে রূপান্তরিত করেছে এই আধারকে।

আনন্দোত্তর এই নিত্যজাগ্রত বোধ এবং আবেশ হল চেতনার অতিনির্মান রূপান্তরের ভিত্তি। মন আর অতিনির্মানের নাথে মানসোত্তর কতকগুলি স্তর আছে, অন্যত্র আর আলোচনা করেছি। আলোর ছোঁয়ায় ফুল যেমন পাপড়ি বেনে, তেমনি বিজ্ঞানের আবেশে এই স্তরগুলিকে আপনাদহতে উন্নীলিত হতে দিতে হবে। সেই উন্নীলনের সঙ্গে-সঙ্গে দেখা দেবে বিজ্ঞানের নানা বিভূতি—আনন্দের প্রাকৃত জ্ঞানবৃত্তির অতুতপূর্ব রূপান্তর। ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ও হৃদয়ের সনদ ক্রিয়ার নাথেই তখন আসবে বিষয়ের মর্গসত্যো অনুব্রহ্ম হবার একটা শক্তি, যাতে আনন্দের ভাবনা বেদনা ও সত্ত্বপের পরিসর অসংখ্য বেড়ে যাবে। অথচ এটি হবে আগ্রাসের ফলে নয়, আবেশের ফলে। চিত্তের বৃত্তিনিরোধের ফলে কে-বোধ, জাতেও বিভূতির ক্ষুধা হয়, কিন্তু তার নাথে সংযমের (exclusive concentration) আয়াস আছে। তাতে প্রবর্তনসহকারে চেতনাকে গুটিয়ে এনে ঘনীভূত করতে হয়, তবে তার নাথে বিভূতির বীৰ্য জাগে। কিন্তু একেত্রে চেতনা ঘনীভূত হয় প্রবর্তনশিলায় (relaxation) ব্যাধ। এ যেন আকাশানন্দোত্তর ব্রহ্মরূহ প্রাবনের পলি পড়ে চেতনা বিজ্ঞানানন্দোত্তর ঘনীভূত হয় এবং সেই উর্বরভূমিতে বিভূতি অনায়াসে অধুরিত হতে থাকে।

*

আগেও বলেছি, চৈতন্য শুধু প্রকাশক নয়, প্রবর্তকও। চৈতন্য এবং শক্তি অবিভাজ্য (inseparable)। সত্ত্বরূপ হল চৈতন্যের সহজ শক্তি। কিন্তু আমাদের প্রাকৃত চৈতন্য জ্ঞান আর সত্ত্বরূপের নিত্য বিরোধ। আনন্ড যা জ্ঞান অনেকদূর তা করতে পারি না, আবার যা ক্রি়া অনেকদূর তা অস্বাভাবিক করে; জ্ঞান আর শক্তি দুয়েরই বৈশ্য আছে বলে কিছুতেই যেন দুয়ের বিনিময়ও হতে চায় না। শক্তি পদে বলে সত্ত্বরূপের অপ-
 ষাতে আনন্ড বিরক্ত শাক্তীর আসন নিয়ে চক্রে-চক্রে ঘেঁষে ঘাই শুধু। তাইতে অধ্যাত্ম-
 সাধকদের মাঝে একটা ধারণা বহুদূর হয়ে আছে যে জ্ঞান শুধু প্রকাশই করে, প্রবর্তনা দেওয়া তার ধর্ম নয়। অবশ্য উৎকর্ষজ্ঞানের একটা দিক, কিন্তু তা-ই তার সবটুকু নয়। আত্ম-
 সংহরণে জ্ঞানের যে নিশ্চল প্রতিষ্ঠা, তা-ই আবার আত্ম-বিচ্যুতরণের সাধন। বিজ্ঞানের
 সূর্য শুধু প্রকাশক নয়, সে 'সবিতা'। বাইরে সে প্রসবিতা, অন্তরে প্রচোদয়িতা। দুটিতেই
 তার সত্ত্বরূপশক্তির পরিচয়। আর সে-শক্তি স্বরূপসত্ত্বের সঙ্গে মূল্য বলে অক্ষয় : অন্তরে
 যা নিম্ন, বাইরে তাকেই সে রূপ দেয়। বেদন কবির কবিতা, গাছের ফুল : দুইই ভাবের
 স্কন্ধ, আলোর স্কন্ধ—অন্তর্গত চিৎশক্তির প্রবেশ। বিজ্ঞানসিদ্ধির মাঝেও সিদ্ধসত্ত্বরূপের
 স্কন্ধ এইভাবে হয়। তাঁর মাঝে বাসনা রূপান্তরিত হয়েছে সত্ত্বরূপে। বাসনা চায়, কিন্তু
 সত্ত্বস্বরূপ পায় না ; আর সত্ত্বরূপ যা আছে হ্রস্বচৈতন্যে তাকেই ফুটিয়ে তোলে। বিশেষ
 যিনি যোগযুক্ত, তাঁর সত্ত্বরূপ এবং কর্ণে বিশেষরূপে ঐশ্বর্যের প্রকাশ। তাঁর চলন-বলনের
 সান্নাতিয়ন হুঁটিনাটিতেও বিচ্যুত হইত সেই পরনসত্ত্বেরই সৌম্যতা, তাই তাঁর মাঝে অপঘাত
 যা ভালভদের দুর্বৈষ কোথাও থাকে না। এইজন্যই প্রাকৃত জীবনের পাপ-পুণ্যের নাপকারি
 দিয়ে তাঁর ব্যবহারকে কখনও মাথা যায় না।

যেখানে সৌম্যতা, সেইখানেই সামুদ্র্য, সেইখানেই আনন্দ। জ্ঞান আর সত্ত্বরূপ যেমন
 অবিভাজ্য, বিজ্ঞান আর আনন্দও তেমনি। অশক্তি হতে বাসনার অপঘাত এবং তাহতে
 প্রতিফলিতার বেদনা—এই হল দুঃখের নিদান। কিন্তু সত্যে বিধৃত হয়ে শক্তি যেখানে
 অপরাধিতা এবং মূল্যহীনতা, সেখানে তো কোনও প্রতিফলিতাই থাকতে পারে না। আপাত-
 দৃষ্টিতে যা প্রতিফল, তা চরম সার্থকতারই তির্যক বিলাস মাত্র। 'জটীলা-কুটীলা না হলে
 নীলার পোড়ই হয় না।' অজ্ঞানী ভাতে বিমূঢ় এবং বিকৃত হয়, কেননা তার কাছে 'কাল
 নিরবধি নয়, পুণ্ড্রীও বিপুল নয়।' কিন্তু দেখ আর কালের আনন্দো ধীর প্রসূত চৈতন্য
 আকাশবৎ অচলপ্রতিষ্ঠ, তিনি ধৈর্য হারান না কিছুতেই। তিনি জ্ঞানের, নীর চলনে যত
 ঝাঁকই থাকুক না কেন, সমুদ্রে এসে সে মিলবেই। সেই সমুদ্রের আনন্দ-আবেশ যেমন তাঁর
 উৎসমুখে, তেমনি তাঁর শেষ সঙ্গমে।

এনি করে বিজ্ঞানের আবেশে প্রজ্ঞা আনন্দ এবং সত্ত্বরূপের মাঝে ঘটে শক্তির অধার
 স্কন্ধ। অপরা-প্রকৃতির কুণ্ডা তখন দূর হয়, জীব হয় পুরুষোত্তমের পরা-প্রকৃতি, তাঁর
 পরা-প্রকৃতির বৈকুণ্ঠলোকের নিত্য অধিবাসী। পুরুষ আর প্রকৃতিতে বিরোধ অপরা-

প্রকৃতির ভূমিতেই গরব। কিন্তু নিতান্তীনের বৈকুণ্ঠ-স্থলে পরম-প্রকৃতি যুগল, তার জীবন তাঁদের নিত্যানন্দসেবার আনন্দহিন্দোল।

২৪

বিজ্ঞান ও আনন্দ

সেখান, অধ্যায়গিহি সনাক্ (integral) হয় একমাত্র বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে। বনকে শাধন (instrument) করেও অনেক উচুতে ওঠা যায় বাটে, কিন্তু মাননী সিদ্ধিতে কখনও চেতনার পূর্ণ রূপায়ের হতে পারে না। ভেসেভাবনা বনের ধর্ম, সে একদেশনশী। একটা-কিছুকে একান্ত করে ভুলে অনুভবের তুচ্ছতম শিখরে সে উঠতে পারে, কিন্তু তাতে অনুভব নিচোঁল এবং সম্পূর্ণ হয় না বলে তার শাবর্ধাও কুশ্লিত থাকে। তাছাড়া, অধ্যায়গিহনার বনকে চলতে হয় উজান ঠেলে, কেননা সে হল অপরাধের তর। তাইতে পরাধের জ্যোতি পক্তি এবং আনন্দকে এখানে নামিয়ে আনা তার অধিকারের বাইরে। এইজন্য মাননী সিদ্ধিতে তুচ্ছতম হয়ই থাকুক, পরিব্যাপ্তি এবং ক্ষুরতার (dynamism) দিক দিয়ে তা বিজ্ঞানগিহির চাইতে স্বভাবতই খাটো।

কিছু বিজ্ঞানেই পূর্ণযোগের শেষ নয়, বরং বলা যেতে পারে এই থেকে তার সত্যকার শুরু। বিজ্ঞান সং-চিত্ত-আনন্দের স্বরূপপক্তি, আর সচিচন্দনশে প্রতিষ্ঠাই যোগের পরম লক্ষ্য। উপনিষদে তাই আরাহতরনে বিজ্ঞানবয় পুরুষের পরে আছে আনন্দবয় পুরুষের কথা। এইখানেই হোত্তরপের শেষ নীমা—অন্তত আনন্দের দিক থেকে। এবার এই পেষের স্বর নেওয়ার পালা এসেছে।

আনন্দের স্বরূপ কি? বিজ্ঞানের স্বরূপ বুঝতে গিয়ে যেমন ভুলনার আশ্রয় নিয়েছিলার, এখানেও আনন্দের তা-ই করতে হবে। প্রথমেই বুঝতে হবে, আনন্দ ক্বং নয়। ক্বং বস্ত-নির্ভর—সে-বস্ত বাইরের বা ভিতরের বা-ই হক না কেন। কিন্তু আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত, চেতনার তা স্বধর্ম। বাইরের ভিতরের সমস্ত আনন্দন একে-একে সরিয়ে গিলেও যদি চেতনা অব্যাহত থাকে, তাহলে ভাগতে হবে আনন্দও তার সঙ্গে অবিন্যত হয়ে আছে। স্বতরাং আনন্দের উপলকি হয় চেতনার নিবৃত্তিবুখে বা যোগে। চরনে, আনন্দ তাই স্বরূপগিহির আনন্দ (bliss of self-existence)। এই আনন্দ স্ব-স্তম্ব অতিনুক্ত এবং অতয়।

যদিও নিবৃত্তিবুখেই আনন্দ আনন্দের স্বরূপের একটা আভাস পেতে পারি, তবুও বিজ্ঞানের নত তারও একটা ক্ষুরতার প্রবেগ আছে যাতে সে প্রবৃত্তির সকল ভূমিতে অবাবে সকারিত হতে পারে। আনন্দকে তখন বলতে পারি রসচেতনা। এই চেতনা অপরা-দ্বাধের ভিনটি ভূমিতে নিষেকে ক্ষুরিত করছে জীবনের উল্লাসরূপে। এটি আনন্দের

প্রাকৃত অববোহের ধারা—যোগদৃষ্টিতে প্রকৃতির বিকল্প বা প্রপাকোত্তাস। এই ধারাকেই যোগে উন্মিষে নেওয়া যায় তার উৎসে। তারপর তাকে আবার আকাশগতাল দিব্যধারায় নাবিয়ে আনা যায় পৃথিবীর 'পরে।' সর্বপ্রাচীন আনন্দের মূলধারাকে উত্তান-ভাট্টার বওরাতে পায়াই যোগের সবাক্ষিচ্ছিত।

বহুপ্রতিরিত্তি য়ে-আনন্দ, তা একটা যোগপদ্ধতি। অপরাধের বিভিন্ন ভূমিতেও তার প্রকাশ হতে পারে, এসেশের সাধনপাঠে তার বর্ণনা আছে। বলা হয়েছে, পরম উপলব্ধিতে লিঙ্কচেতনা 'জড়বালোমিতপিশাচবৎ' হয়ে যায়। আগেই বলে রাখছি, সবাক্ষিচ্ছিত (integral perfection) বলতে আনন্দ বা হুষ্টি, এ-অবস্থাগুলির কোনটাই কিন্তু জা নয়। সাধারণত এদের প্রত্যেকটির মাঝে প্রকৃতির অপরাধের একটা সঙ্কেত আছে। অবশ্য এ-অবস্থাগুলি বিজ্ঞানশক্তির ধারা সঞ্চিত হলে তাদের চেহারা দাঁড়ায় আরেকরকম। কিন্তু সে পরের কথা।

উত্তান-ভাট্টার রহস্য না কেনেও অনুবহ পুরুষের মাঝে সচ্চিদানন্দের আবেশ হতে পারে। জড়প্রকৃতির গভীরে বা জুখুস্তির মাঝে য়ে-আনন্দ সমুদ্ভূত হয়ে আছে, এ হল তারই আবেশ। তার সঙ্কর্ষণে (inward pull) অনুবহ পুরুষের চেতনা নিখর হয়ে যায়। কলে সাধক হয় বন্যীকত্বের বড় জড় হয়ে যান, অথবা তাঁর মাঝে শক্তির স্পন্দন দেখা দিলেও তা তাকে নিয়ে ঝড়নে আগে বরাপাতার নত বা ঝাঁটছাড়া শিওর নত য়েন-বুনি খেলিয়ে বেড়ায়। শাস্ত্রে একেই বলা হয়েছে সিঙ্কের জড়কৎ বা বানবৎ হওয়া।

প্রাণবহ পুরুষের মাঝে যদি তেননি করে সচ্চিদানন্দের আবেশ হয়, তাহলে চেতনার গভীরে এক নিখল তরুতা নেমে আসা সবেও সাধকের প্রকৃতিতে দেখা দেয় বিশ্বপ্রাণের উন্নত ভাওব, তাঁর আচার-ব্যবহার হল নিয়মবীন নিশ্চল বা বাঁতৎস। এরই নাম সিঙ্কের উন্নতবৎ বা পিশাচবৎ অবস্থা।

তেননি বনোবহ পুরুষের মাঝে সচ্চিদানন্দের আবেশে বিশ্ববনের অনিবাধ জ্যোতির ছটায় সাধকের মনঃপ্রকৃতি ধাঁধিয়ে যেতে পারে। তাঁর মন তখন হয় অনন্যভাবে নিঃশুপ্র, অথবা সাক্ষিভাবনায় তটব। আবার মনের মাঝে যদি রসাত্বাদের সংস্কার প্রবল থাকে, তাহলে সাধক ইষ্টের সান্নিধ্য বা সাদৃশ্যের নিবিড়তার বিভোর হয়ে যান। তখন তাঁর 'হবে বিশ্ব প্রেমবী সুরাধারা অবিরাম'। মন জড় ও প্রাণের উল্লসিত তব, তাই অপরত্বের সিঙ্কেক বিজ্ঞের ভূমিতে স্বচ্ছন্দে লীনাবিত্ত করবার সানন্দ্য তার আছে। স্বতরাং সিঙ্ক বনোবহপুরুষ তাঁর আরত্ব নিঃসঙ্গতা বা রসাত্বাদবিভোরতার উপর পূর্বোক্ত জড়বালোমিতপিশাচবৎ অবস্থার বং চড়িয়ে দিতেও পারেন।

★

কিছু বিজ্ঞানের মাঝে যে অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্য আছে, রসাত্বাদের য়ে-সানন্দ্য আছে, অপরাধের কোনও ভূমিতেই তার অবাধ স্কুরণ সম্ভব নয়। তিনটি ভূমিতেই দেখা যায়, পুরুষ

অন্তরে অপরা-প্রকৃতি বহন হতে মুক্ত হয়েও বাইরে তার প্রশাসনের কাছে নিজেকে ছেড়েই দেন। এইজন্য প্রায়ই দেখা যায়, তপাক্ষিত সিংহের ঘোঁষনে বাইরে-ভিতরে সামঞ্জস্যের অভাব, একটা পৌষমান পুষ্য তার তাঁর ঘোঁষন হজেন নয়। তৎপরে নাথে যে-বিত্তিধর্মিতা (inertia) আর প্রাণের নাথে যে-প্রবৃত্তিপত্ততা (effusion) আছে, যোগশক্তি দ্বারা তাদের চিন্ময় করে তুললে যে জ্ঞানসিদ্ধি আর ভাবসিদ্ধি পাওয়া যায়, তারই প্রকাশ ঐ জড়বানোমন্ডপিপাচবৎ অবস্থায়। এখানেও পুরুষ ওপাধীন—ওপাধীন নন, প্রকৃতি তাঁর স্বীয়া প্রকৃতি নয়। আর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখতে গেলে ওপও এখানে অবিস্তৃত। ততোওপ বিত্তিধর্মী, আর রতোওপ প্রবৃত্তিধর্মী; প্রকাশধর্মী সযওপ দ্বারা জ্ঞানিত এবং রূপান্তরিত হলেই তারা শুদ্ধ হতে পারে। দ্বিত্তি এবং প্রবৃত্তি তখন রূপান্তরিত হয় শান্তি ও স্বীর্বে—দুয়েরই নাথে থাকে শৈব-চেতনার আবেশ। এটি সত্ত্ব বহু বিজ্ঞানভূমিতে—মনোভূমিতেও নয়। নন বিজ্ঞানের উপচর বলে সযওপের প্রকাশধর্ম তার নাথে প্রবন, কিন্তু তনুও সে রজস্তম্বের বিকেপশূন্য নয়। তাই ননোবর পুরুষের সিদ্ধিতে বিজ্ঞানের আভাস পেলেও তার প্রভাস খানকা পাই না। সাধারণত সাধকদের লক্ষ্য হয়, ওপের রূপান্তরের দিকে দৃষ্টি না রেখে ওপকে পেগিয়ে যাওয়া। তাতে অন্তরে ওপাতীত জ্বির নিখরতা আয়ত হলেও বাইরের ওপলীলার উপর প্রভু জন্মার না। অপরাধের সকল ভূমিতেই সিদ্ধির ন্যূনতা এইখানে।

এই ন্যূনতার পূরণ হয় বিজ্ঞানভূমিতে। বিজ্ঞান শুদ্ধতার অর্থাৎ অপরা-প্রকৃতিতে সত্ত্বের নাথেও যে তামগিক আবরণ আর সাতসিক বিকেপের নিশ্রুণ থাকে, এখানে তা থাকে না; নিরন্ত্র প্রকাশধর্মের দ্বারা দুটি ওপই শোবিত এবং রূপান্তরিত হয়ে যায়। বিজ্ঞাননর পুরুষের চেতনা তাই প্রমুক্ত প্রশাস জ্যোতির্বিব অথচ অকুণ্ঠ সানর্থে ঈশান। এই সানর্ধ্য প্রকাশ পায় অপরা-প্রকৃতির রূপান্তরে, যা অবরভূমিতে সত্ত্ব হয় না। রূপান্তরিত প্রকৃতি পুরুষের স্বীয়া প্রকৃতি। তপঃশুদ্ধা পৌরীর সঙ্গে তখন হরের বিনন—অর্ধ-নারীপুত্রের নিত্যসানবদ্যে আনশে।

বলেছি, অন্তরাবৃত্তিই যোগের মুখ্য লক্ষণ, কিন্তু তার পরিপান শূন্যতা নাও হতে পারে। বৃত্তির নিরোধকে যদি যোগ বনি, তাহলে অবশ্য পুরুষের কৈবল্য শূন্যতার দিকে ঝুঁকবে সাধারণত যোবীরা এই পথ ধরেন। পুরুষকে প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ বিরিক্ত করাই তাঁদের লক্ষ্য। অপরা-প্রকৃতি এবং পরা-প্রকৃতিতে তাঁরা ভেদ করেন না। পরা-প্রকৃতির নাথে জ্ঞান-যেহ-নোহের বিকার আছে, চেতনাকে তাহতে মুক্ত করা অবশ্য সব যোগীর পুরুষার্দ। প্রকৃতির সমস্ত পরিপানকে তত্ত্ব করে দিয়ে এ-মুক্তি বেনন আসতে পারে, তেননি আসতে পারে পরা বা দিব্যা প্রকৃতির ক্রিয়াকে চেতনার স্বচ্ছল হতে দিয়ে। এইটি সত্ত্ব বহু, যদি বৃত্তির প্রশাসনের সঙ্গে আবেশের ভাবনাকেও মুক্ত করে নিই। আবেশ সত্তা চেতনা এবং আনন্দের আনন্ডের। সমুদ্রের নাথে বীনের হত বৃহৎ-এর নাথে নিবজ্জিত হয়ে আছি, তাতেই

সম্বন্ধ করছি, তাঁর আবেশ একটা নেশার নত আবার পেয়ে আছে—এট ভাবনাও যোগ। নিরোধ এর সাধন নয়, এর সাধন হল আপায়ন। সূর্যের গুরুত্বোত্তীর্ণ কাছে নিজেকে ধাপে ধিয়ে কুন যেমন তার বর্ণরূপকে ফুটিয়ে তোলে, এও তেননি। আপায়নেই পরা-প্রকৃতির সামর্থ্য আবিষ্কৃত হয়ে অপরা-প্রকৃতির রূপান্তর সিদ্ধ হতে পারে। তখন কৈবল্যের সঙ্গে যুক্ত হয় বিভূতিও, বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ফোটে স্বপ্তির নীর্থ।

আনন্ত্যের মাঝে আত্মবিলোপ নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠাই হল বিজ্ঞানান্ত্রিত পূর্ণযোগের লক্ষ্য। সম্বন্ধ আত্মভাব বা পুরুষের সমর্থ পৌরুষ ব্যাপ্ত হবে প্রকৃতির সকল ভূমিতে, কোনও কিছুকেই সে প্রত্যাখ্যান করবে না। আশ্রয় যেমন নিজের ধীরে ইচ্ছনকে আত্মরূপে রূপান্তরিত করে, বিজ্ঞানও তেননি মুগ্ধরী প্রকৃতিকে করে তোলে চিন্তরী। অবসারের তিনটি ভূমিতে যোগগতিধির কথা আগে বলেছি, বিজ্ঞান তার বৈকল্যকে শোধন করে দেয় নতুন রূপ। বিজ্ঞানীও বালবৎ; কিন্তু তখন তিনি রাজার ছেলে—বিশুব্রহ্মাও নিয়ে তাঁর সহজানন্দের খেলা। তিনি জড়বৎ; কিন্তু তাঁর জড়র উদাসীন ধীরের নয়, সমর্থ শিবের—যার মাঝে যুগনন্দ প্রকৃতি-পুরুষের সামরস্যের আনন্দ প্রপঞ্চোপনয়ন স্বত্ব থেকেই প্রপঞ্চোল্লাসে ঠিকরে পড়ছে। তিনি উন্নতবৎ; কিন্তু তাঁর উন্নাদনা বহাশক্তির আবেশে বিনশ হয়ে খেই হারিয়ে কেঁদা নয়; এ সেই নটরাজের বিশুব্রহ্মের উন্নাদনা যার দুর্লভা ছন্দে সম্বন্ধভবনের নর্ধ-নর্ধে লাগে অনির্বচনীয়ের ঘোলা। তিনি পিশাচবৎ; তাঁর শক্তির উল্লাস ননঃকলিপিত ভূতচ্ছ বিধি-নিষেধের বন্ধন নানে না, নিজের গুণতচ্ছন্দা দুর্ধর্ষ প্রবেগে প্রণোদন হলে নিষ্ঠুর এবং ভয়ালও হতে চান। হুতরা; জড়বাদোন্নতপিশাচের অবস্থাতেও তিনি প্রকৃতির প্রশান্তা, জ্ঞার ভর্তা এবং ভোক্তা নহেশ্বর।

*

বিজ্ঞানের পর আনন্দ। প্রশ্ন হবে, বিজ্ঞানই শেষ নয় কেন? বিজ্ঞান আর আনন্দে তর্কাত কোথায়?

দুরের মাঝে তর্কাত কোনও ভেদ নাই, তবুও বিভাবের (aspect) ভেদ আছে। আগেও বলেছি, বিজ্ঞান হল সং-চিৎ-আনন্দের শক্তি। সচিৎদানন্দ স্বরূপ, আর বিজ্ঞান শক্তি। স্বরূপ আর শক্তিতে ভেদের ভেদ না থাকলেও বিভাবের ভেদ থাকতে পারে। শক্তির একটা আশ্রয় চাই; সং-চিৎ-আনন্দ বিজ্ঞানের সেই আশ্রয়। আশ্রয় আশ্রয়ীকে ছাপিয়ে থাকে বলে তার মাঝে রয়েছে অবরোধদৃষ্টি, আর আশ্রয়ীর মাঝে আরোহদৃষ্টি। সং-চিৎ-আনন্দ হল অপসারের পরম আশ্রয়। তাইতে অনুবর হতে বিজ্ঞানবর পর্যন্ত সমস্ত ভূমিতেই চেতনার লক্ষ্য থাকে উর্ধ্বতর একটা ভূমি। কিন্তু সং-চিৎ-আনন্দের উর্ধ্ব আত্ম-কিছু নাই বলে তার মাঝে আছে কেবল স্বরূপপরিচিতি আর অবতরণের প্রবেগ। আনন্দ আর বিজ্ঞানের তর্কাত এইখানে। বিজ্ঞানে উদ্যান-জাটা দুরেরই টান আছে।

আনন্দ চেতনার সব ভূমিতেই আছে, কিন্তু জ্ঞার স্বরূপের পূর্ণপ্রকাশ হয় একবার

বিজ্ঞানভূমিতে। বিজ্ঞান চিহ্নন বনে আনন্দমনও। বিজ্ঞান আনন্দে বিশ্বাস্ত এবং বিগলিত হয়ে যায় যট্টে, কিন্তু তবুও তার স্বরূপশক্তির পরিধান (change) সেখানে অক্ষুণ্ণ থাকে। সে-পরিধান হন চেতনার স্বাতন্ত্র্য এবং আনন্দের উদ্ভাৱ। পবন মানিত্রা বিজ্ঞানের যেমন প্রতিচ্ছা, তেমন তার পরিধানেরও প্রবর্তক। বৈদিক ঋষিরা উপনা দিয়েছেন আকাশ আর সূর্যের, তাঁদের ভাষায় বরুণ আর নিতের। বরুণ স্বাতী, আর নিত্ৰোজ্যোতি তাঁর স্বাতী। এ-নাড়া কিন্তু আধুনিক বেসান্তের 'কুহকিনী নয়, এ হন পরবের 'প্রজ্ঞা পুরাণা', সচিচমানন্দের কবি-কৃত্ত (seer-will)। বিজ্ঞান এই অর্থে সৈবী নাড়া বা যোগস্বাতী। বিজ্ঞানে প্রজ্ঞানের যে হ্রস্বোন্নয় বিচক্কুরণ, আনন্দে তা সংহত স্বপ্রতিষ্ঠ এবং অতিবিত্ত (transcendent)। এনি করে বিজ্ঞান আনন্দের স্বরূপশক্তি।

অপরাধে সেখানে দেহ-প্রাণ-মনের বেলা, সেখানে সেখানে পাচিছ ভেদভাবনাই প্রবল, তার পিছনে অভেদের একটা আবছা অনুভব মাত্র আছে। তুনি-আনি সবাই আনাধা-আলাধা, তবুও কোথাও যেন আনন্দা সবাই এক। বিজ্ঞানে এই একত্বের অনুভব বুঝা হয়ে দেখা দেয়, ভেদ সেখানে অভেদেরই বিবৃত্তি। বিনি বিজ্ঞানী বা 'মহানু আরা' তাঁর চৈতন্য সর্বব্যাপ্ত এবং সর্বানুসূত, তিনি সবার স্বাতী, সবাই তাঁর আপন। প্রাকৃত অনুভব যেমন ভেদের, তেমন আবার বিজ্ঞানের অনুভব হন ভেদাত্মকের। অভেদের মাঝে ভেদের নীচায় ঐশ্বর্য আর উন্নাসের পরিচয়। যেনন পদ্যের পাণ্ডিঙলি বিবৃত হয়েছ কণিকা, কিন্তু কণিকা আর পাণ্ডিঙলি মিনিয়েই পন্য। কেত্রে অভেদ, পরিধিতে ভেদ; একটি কোতিবিন্দু হতে অল্প ক্রিয়ের বিচক্কুরণ। কিন্তু আনন্দ-ভূমিতে ঐ কেন্দ্রবিন্দুটিও নাই। সেখানে ভেদাত্মক নয়, শুধু অভেদ। ভেদ ভেদাত্মক আর অভেদ—চেতনার উত্তরণ বা অবতরণের তিনটি পর্ব; যথাক্রমে অপরাধে বিজ্ঞানে এবং পরাধে। যেমন আনন্দের বন বুদ্ধি আর বোধ। বনে বৃত্তির ভেদ; বুদ্ধিতে ভেদজ্ঞান একটি অভেদভাবনায় বিবৃত; কিন্তু বোধ আনন্দের স্বরূপের অনুভব বনে অভেদভাব তার স্ববর্ষ। জ্ঞেদ-জ্ঞাতা স্বাদ্য-স্বাদক কার্য-কারণ—এই ভেদগুলি অপরাধে স্পষ্ট, এরা যেন আনাধা-আলাধা জ্ঞাতের। কিন্তু বিজ্ঞানে একই চৈতন্য জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় ইত্যাদিতে বিদগ। আর আনন্দে ঐ ভেদটুকুও বিগলিত—সেখানে শুধু জ্ঞান, শুধু আনন্দ, শুধু শক্তি। উপনিষদের ঋষি এই অবস্থাগুলি বুঝিয়েছেন জাগ্রৎ স্বপ্ন আর সুশুপ্তির প্রত্যয় দিয়ে। আনন্দের জাগ্রতে বিদগ আর বিদগীর ভেদটা স্পষ্ট; স্বপ্নে বিদগ বিদগীরই স্পষ্ট; আর সুশুপ্তিতে বিদগ বিদগী একাকার। অথচ তিনটি একই আনন্দভেদের বিভিন্ন ভনি মাত্র। তেমনি অপরাধ ব্রহ্মের জাগ্রৎ, বিজ্ঞান তাঁর স্বপ্ন, আনন্দ তাঁর সুশুপ্তি। কিন্তু প্রাকৃত-চেতনার বড় ভিনটি অবস্থার পর্যায়ভেদ নাই, তাঁর মাঝে ভিনটিই গুজপ্রোত।

আনন্দে আনন্দভেদা বিগলিত হয়ে যায়, স্বীক আনন্দা হয়ে যায়—এটি ব্রহ্মোপ-বক্তির প্রথম অবস্থা। কিন্তু বক্ত আনন্দের জাগ্রৎ প্রকাশ নয়, উন্নাসে। স্ববন উন্নিয়

বাই, তখন প্রশ্ন ; আবার ভাটিতে আসবার সময় উল্লাস । পূর্ণযোগে আনন্দ উজান-ভাটা দুটি দিকেই যনান দৃষ্টি দিই ব্রহ্মের আনন্দে যেমন আনন্দ বিশ্বাস, তেমনি আবার উল্লাসিত । সে-উল্লাস রূপ ধরে বিস্মৃতিতে, কেননা আনন্দ 'সর্বেশ্বরঃ সর্বোনিঃ' । ব্যাপারটা যেন যোগনিষ্কার্য নত । প্রাকৃত স্মৃতিতে চেতনার প্রবল ; কিন্তু যোগের স্মৃতিতে চেতনা ভেঙ্গে ওঠে আনন্দভূমিতে ভাববিস্তার বীৰ্য নিয়ে । এইজন্য বেদের ধর্মিরা ব্রহ্মের আনন্দকে বলেছেন 'জননোক' কিনা বিশুদ্ধবনের জ্ঞান বা বিস্মৃতির ভূমি । 'আনন্দো ব্রহ্মোনিঃ' ।

বস্তুত আনন্দই সর্বমূল । অপরাধেও জীবের সবচেয়ে ব্যাপারের মূলে রয়েছে আনন্দের প্রেমধা । আনন্দের অভাব থেকে দুঃখবোধ, নান্দ্য অহরহ তা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করতে থাকে অর্থাৎ যুগ্মচেতনায় আনন্দস্বরূপকেই । বাইরের উপকরণ যখন আর তাকে তৃপ্ত করতে পারে না, তখন সে ধরে অন্তরের পথ—বাইর থেকে সে একেবারেই ভুলি চায় । সাধকের জীবনে এর নাম নুনুক্য । নুনুক্য থেকে আসে বৈরাগ্য । বৈরাগ্যের মাঝে যে নেতির ঝোঁক, তা তাকে উজানপথে ঠেলতে-ঠেলতে অবশেষে পৌঁছে দেয় সর্বনাশ প্রলয়ের কূলে । নির্বাণসঙ্গামী অনেক সাধক তখন আনন্দকেও ছেঁয়ে বলে প্রত্যাখ্যান করেন । কিন্তু এটা তাঁদের বাড়াবাড়ি, গোড়াতে যুগ্মভাবভ্রমের জীব আগ্রহের ফল । বস্তুত নির্বাণ প্রলয় নয়, তা হল রাগ-দ্বন্দ্ব-মোহের উপশন, চেতনার প্রশান্তবাহিতা । শান্তি আর আনন্দ নিব-নতির নতই যুগ্মনন্দ । আনন্দ শিবেরই অবস্থান শক্তির উল্লাস । প্রশ্নের ফলে আনন্দকে যিনি পান, তিনি এক সর্বব্যাপ সর্বানুগত সত্যের অবগাহন করে বহন-মুক্তির সংস্কার হতেও মুক্ত হন । উপনিষদের ভাষায় এই হল তাঁর অতিনিষ্কৃতি । তাঁর কাছে ভব আর নির্বাণ এক । অপরাধ থেকে যখন বেগি, ভব তখনই বহন ; যদিও এই ভবের মাঝেই রয়েছে চিত্ত-প্রকর্ষের প্রেমধা—আনন্দ যার প্রসূতিক । আর পরার্থ থেকে যখন বেগি, তখন ভব আনন্দের উল্লাস । শক্তির উজান-ভাটা দুয়েতেই আনন্দ ।

অপরাধে পুরুষ-প্রকৃতিতে কে-বিরোধ, আনন্দে তার সমাধান । বিরোধ সেবা দিয়ে-ছিল চেতনার সঙ্কোচে । বিজ্ঞানে চেতনা যখন আনন্দে বিস্ফারিত হল, তখন অপরা-প্রকৃতিও রূপান্তরিত হল পরমা-প্রকৃতিতে । এই প্রকৃতি পুরুষের আনন্দচেতনায় যখন উল্লাস । প্রকৃতি-পুরুষ তখন নিত্যসামর্যে যুগ্মনন্দ । আর সেই যুগ্মনন্দতাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের সাগরকে যুগলের অনন্ত কার্যমূহের নিত্য আবর্তন ।

বিশ্বের প্রতি এই দৃষ্টিই বিজ্ঞানীর সম্যক-দৃষ্টি এবং এই দৃষ্টির আনন্দে সত্যবিত বিস্ফারিত এবং সমধর্মজিহ্বা জীবনই বিদ্যা-জীবন ।

[অবশ্য :]

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রস্তোভ]

১

প্রশ্ন : (মায়ের "Conversation", "কথাবার্তা" থেকে) আপনি এতে বলেছেন, "মানবজনের সেবা করব, এ হলো খুব সাধারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এমন মনোভাব পোষণ করা বা এমন কাজ করতে যাওয়া ব্যক্তিগত অহংকারের চিহ্ন।"

একে এক্ষেপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলেছেন কেন ?

উত্তর : জনসেবার কাজগুলো তুমি কেন করতে যাও, কি মতনব নিয়ে ? তাই মানে তুমি ওতে মানুষদের মধ্যে একজন বড়ো কেউ হবে, এই ভোনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এ কথা কি বোঝা করিন ?

*

প্রশ্ন : ভগবান সকলের মধ্যেই আছেন। অতএব সকলের সেবা করার মানে তাঁরই সেবা করা।

উত্তর : কথাটি চমৎকার ! কিন্তু ওর চেয়ে আরো বেশী নিশ্চয় করে বলা না যে ভগবান আমার মধ্যেও আছেন, অতএব নিজের সেবার কাজ করলেও তাঁরই সেবা করা হবে।

যত্নত ভগবান যখন সর্বত্রই ছাড়াই আছেন তখন অর্গতে ভোনার কোনো জনসেবা করার দরকার হবে না। সেটা তাঁর কাজ, ভোনার সাহায্য ছাড়াও তিনি তা করতে পারবেন।

দেখছি যে তুমি কথাটা ঠিক বুঝলে না। কিন্তু ভেবে দেখ, ভগবান সবার মধ্যে আছেন এ কথা যদি ভোনার বৃত্তিতে এসে থাকে, তাহলে ভোনার পক্ষে জনসেবা করা দরকার এমন কথা মনে হবে কেন ? তার মানে তুমি বলতে চাও যে জনগণের জন্যে কি করা দরকার সে কথা ভগবানের চেয়ে তুমি জানো বোঝো। সত্যিই কি তাই ?

ভগবান সর্বত্রই রয়েছেন। ঠিক কথা। কিন্তু ভগবানের অস্তিত্বজ্ঞাপক কোনো কিছুই তেমন পেবাচ্ছে না। আমি এর একটিনাত্র মীমাংসার কথাই বলতে পারি। মানুষের জানো যদি করতে চাও তাহলে সম্পূর্ণভাবে নিজে-কেই ভগবানের কাছে নিবেদন করে যাও। এই হলো উপায়।

তুনি বলছে যে ভগবান সকলের মধ্যেই আছেন। তাহলে এই সব জিনিসের কোনো কিছুই বদলাচ্ছে না কেন? তার নামে তিনি সর্বদা পাচ্ছেন না, কোনো কিছুই তাঁর ইচ্ছাতে সাড়া দিচ্ছে না। তাঁর দেখা পেতে হলে তোনাকে আপনি চেতনার তলদেশে নেনে গিয়ে দেখতে হবে। মানুষের সেবা যাতে হয় তার জন্য কি করবে তুনি? দরিদ্র-ভোজন করাবে? লক্ষ লক্ষ মানুষকে খাওয়ালেও দারিদ্র্যের সমস্যা বুটবে না, যেমন যাচ্ছে তেননি থাকবে। মানুষের অবস্থার নতুন কিছু উন্মুক্ত আনবে? কিন্তু ভগবান যখন তাদের মধ্যেই আছেন, তবু কেন তাদের এ অবস্থার কিছুই বদলাচ্ছে না? তাদের অবস্থার কথা তোনার চেয়ে ভগবান নিশ্চয় খুব ভালোই বোঝেন। তুনি নিজে কড়টুকু? তাঁর চেতনার সামান্য একটু অংশ আর সামান্য একটু জড়বস্তু, এই নিয়েই তোনার অস্তিত্ব, একেই বলে তোনার “আমি”। যদি এমন চাও যে মানবের বা অগভীর বা বিশেষ কিছু উপকার করবে, তাহলে তোনার একমাত্র কাজ হবে তোনার ঐটুকুকে ভগবানের দ্বাতে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেওয়া। এ-স্বপ্ন কেন বিদ্যাজগৎ হচ্ছে না? এখানে শষ্টই দেখা যাচ্ছে যে সবই বৈদিক কাজ হচ্ছে হুতরাং এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো, তোনার সর্বস্ব তাঁকে দিয়ে ফেলা, ভগবানকে পুরোপুরি সর্পর্পণ করা, কেবল তোনার নিজের জন্যই নয়, কিন্তু সকল মানবের জন্য, সারা বিশ্বের জন্য। এর চেয়ে ভালো উপায় আর কিছু নেই। মানবের কল্যাণ কেননা ক’রে তুনি করবে? তাদের জন্য কি পরকার তার কিছুই তুনি জানে না। আর তোনার কাজের দ্বারা কোন শক্তি যে সোনা করা হবে তাও তুনি জানে না। তাহলে আগে নিজের দিকটা না সামলে তুনি অন্য কোন দিক কেননা ক’রে সামলাবে?

যাই কেন বলে তোনার নিজের ক্ষমতা খুবই কম। যাকে সাহায্য দিতে চাও তার চেয়ে তোনার নিজের চেতনা যদি বড়ো না হয়, তাহলে কেননা ক’রে তা করবে? নিজস্ব ভালকের নতো কর্পনা নয় কি? ভালকেই এমন বলতে পারে: আমি দ্বাত্রাবাস খুলবো, শিওনিবাস বানাবো, গরিবদের পায়ের খাওয়াবো, জ্ঞানপ্রচার করবো, ধর্মের বিস্তার করবো ইত্যাদি। তার কারণ নিজেই বনে করো অন্য সকলের চেয়ে বড়ো, তাদের কি হওয়া উচিত আর কি করা উচিত সে কথা তাদের চেয়ে তুনিই ভালো বোঝো। আর তাঁকেই বলে তোনার অনসেবা। ঐ সব কাজই কি এখনও চালিয়ে যেতে চাও? কিন্তু ঐরূপ কাজে এতদূর বিশেষ কিছু বদলায়নি। হাসপাতাল বা ছুন যারা খুলেছে তারা ঠিক মানুষের উপকারের জন্যই তা করেনি।

*

প্রশ্ন : তবু ওতে কাজ কিছু তো হয়েছে? যদি খুলেগুলো উঠিয়ে দেওয়া হয়.....

উত্তর : ওতে যে মানুষের সুখ বেড়েছে কিংবা খুব বেশী উন্মুক্ত হয়েছে এমন আশার বনে হয় না। কেবল তোনারই ডাবো “আমি একজন কেউ হনান”। একেই বলি উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

মূল প্রভুত্বের জন্যে যাত্রা তাঁকা চালিতে প্রস্তুত তাদের কাছেই যদি বলো যে একটা ভাগবত কবী করবার আছে যা ধর্ম ভগবানের অভিপ্রেত, তাহা যদি ও হ্যাঁ হ্যাঁ বৃথাবে যে তাতে ভগবানের কাছই করা হবে, তবু সে কাছের জন্যে তাত্রা কিছু দ্বিভেদে চাইবে না, যেহেতু তা লোকজনিত ভগবতের কাছ নয়, ওতে কিছু সর্বগ্রাহ্য মঙ্গল কর্ম করছি বলে তার মনস্তৃষ্টি হবে না। সেইজন্যেই একে বলি উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আমি এমন লোকদের জানি যাত্রা হাস-পাতাল ঘোনার জন্যে লাখ লাখ টাকা দিতে পেরেছে, কারণ তারা ওতে এই ভেবে সুখী হয়েছে যে আমি এক মত বড়ো বহুং কাজে এত দান করেছি। ওতে যে আরগৌরব জন্মায়, তাকেই আমি বলছি উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

একজন বসিক ব্যক্তিকে আমি জানি, সে বলতো, “ভগবানের রাজ্য এত নিগুণের এখানে আসতেই পারে না, কারণ তা এসে গেলে তখন এই বেচার্য্য লোকহিতৈষীদের কি গতি হবে? মানুষের সব কিছু দুঃখকষ্টই যদি বুচে গেল, তাহলে সে বেচারাদের জন্যে কি করবার বইন?” এমন অবস্থা থেকে বেরোতে পারাই বুঝ করিন। অথচ এ কথা নিঃসন্দেহ যে জগৎ যদি ভগবানের হাতে নিজেহে ছেড়ে না দেয় তাহলে এই অবস্থা হতে তার কখনই নিষ্কৃতি নেই। তোমরা যত কিছুই পুণ্য কাজ করো আর তাতে যতই কেন উৎসাহমান করো, তাতে কেবল তোমাদেরই আরতৃষ্টি হবে, স্বতন্ত্রাং অহংকারই বাড়বে; কিন্তু ভগবানের কথা জানা সত্ত্বে তাতে কোনোই সাহায্য হবে না। আর যারা নাকি রূপতের উপারমুদ্রা বোঝায় ব্যক্তি, তাদেরই এদিকে ফেরানো সব চেয়ে করিন। তাদের নিজেদের বতো জীবন নিয়েই তাত্রা বুঝি। একজন নগণ্য ব্যক্তি, সে তার জীবনে সকল রকম সোমাই ক’রে ফেলছে, সে তৎকথ্যং সেকথা স্বীকার ক’রে নিয়ে বলবে, “আমি কিছুই নই, আমার কোনো কিছুই করবার ক্ষমতা নেই, আমাকে নিয়ে যেমন বুঝি তাই করো।” এমন লোকেরাই ঐ সব গণিত বিজ্ঞ মানুষদের চেয়ে ভগবানের অনেক কাছাকাছি হতে পারে, কারণ নিজেরা যে কেমন তা এরা দেখতে পায়।

যে বিজ্ঞ ও বদান্য ব্যক্তি অনেক কিছু মানবকল্যাণের কাজ করেছে, সে এতই বেশী আরতৃষ্টি ভোগ করছে যে নিজের কোনো পরিবর্তন আনার কথা সে কর্তৃপনাই করে না। এইরকম লোকেরা প্রায়ই বলবে, “আমি যদি এই জগতের সৃষ্টি করতান তাহলে এমন বাজে কাজ কখনই করতান না, এর চেয়ে অনেক ভালো জগৎ তৈরি করতান।” মার এরাই চায় ভগবানের স্রষ্টা সংশোধন করতে; এদের বতো সবস্ত তিনিসিগাই করা হয়েছে নির্বোধের বতো নিতান্ত নিরর্থকভাবে। এমন নবোভাব নিয়ে কেউ কখনো ভগবানের সঙ্গে মিলতে পারে না। সেখানে ভগবান ও সেই ব্যক্তির মাঝখানে হয়ে গেল এক পূর্ণাঙ্গ অহং, যে নিজের বৃত্তির গর্বেই সঙ্কীভ, নিজেকে অস্বাভ্য বেনে ভগবানের কাছের বিচার করে। সে নিজের কৃতির সত্ত্বে এতই স্নানিচিত্ত যে তার ধারণা জগৎসৃষ্টির তার তার হাতে পড়লে সে ভগবানের বতো এমন বোকারি করতো না। এই ধরনের নবোভাব আসে কেবল মস্ত থেকে,

আত্মশ্রাব্য ও আত্মবিজ্ঞানের বোধ থেকে। আর এরাই তার মানবকল্যাণের আশ্ফালন করতে।

মানুষকে তারা কতখানি সন্মতি দিতে পারে? একটুও না। এমন কি যদি তারা সেতের প্রত্যেকটি ইকবিনু পাত ক'রে তাদের মাথার ভিত্তরকার সমস্ত কল্পনাকে ও পকেটের সমস্ত অর্থকে বিশেষ ক'রে ফেলে, তবু তারা একজন মানুষকেও বদলাতে পারবে না। যে মানুষের অস্তিত্ব বলতে বোঝায় চিরস্থনের একটি সুদৃঢ় সত্তা। অথচ তারা জানে যে অধিকের মানুষ হ'য়ে চিরস্থনের উপরে তারা কলন চালাতে পারবে। এ অগতে মানুষের চেয়ে কত বেশী উচ্চতর সত্তা। এসে গেছে, তারা নিষেধের প্রাণ দিয়েছে এখানে আসো এনে সেবার জন্য, কিন্তু তাতেও তারা এখানকার বিশেষ কিছু পরিবর্তন আনতে পারে নি। তাহলে সেখানে সানান্য অকুপারবাধুর বড়ো ক্ষুদ্রাঙ্গি ক্ষুদ্র মানুষ কিই বা করতে পারবে? আর কিছু না, কেবল ওদের আশ্রয়। ওদের যুক্তিটা হলো এই, “প্রত্যেকেই যদি তার যথাশাধ্য করে তাদেরই সব ঠিক হয়ে যেতে পারে।” আমি কিন্তু জা বনে করি না, আর তা ছাড়া ওটা অসম্ভব কথা। এক দিক থেকে যেখানে বিশ্বের সকল কিছুই তার যথাশাধ্য করছে। কিন্তু তাতেও কিছু বল হচ্ছে না। সমগ্র না বদলালে কোনো কিছুই বদলাবে না। সব চেয়ে যেটা উৎকৃষ্ট তারও বদলানো চাই। অজ্ঞানের স্থানে আসা চাই জ্ঞান ও শক্তি ও চেতনা, নতুবা সমস্তই সেই একই ভুল-পথে ধূতপাক খেতে থাকবে।

লক্ষ লক্ষ হাসপাতাল খুলে দিলেও লোকের রোগ হওয়া ঠেকানো যাবে না। বরং সেখানে রোগীর সংখ্যা তাতে আরো বেড়েই যাবে। কিন্তু ঐ রকমের ধারণাই এখন সবাইকে পেয়ে বসেছে। আপন বিবেককে তারা এই বলে আশ্বাস দেয়, “এই দুনিয়াতে যখন আমি এসেছি, তখন পদের জন্যে কিছু করি।” নিষেধ মনকে এই বলে বোঝায়, “যেব আমি কি নিঃস্বার্থ। সর্বস্বানবের সেবা করছি।” এ অহংকার ছাড়া আর কিছুই নয়।

বস্তুত সব চেয়ে প্রধান যে মানুষটিকে সাহায্য করা দরকার সে হলো ভূমি নিজে। সব দুঃখ দুঃখিতের অগত্যা বদলাতে চাও, কিন্তু দুঃখবোধের চরিত্রটাকেই পাল্টে বতকণ পর্যন্ত তাকে আনন্দের নিঃচরতায় না আনতে পারছ, ততক্ষণ পর্যন্ত এ অগত্যা বদলাচ্ছে না। যেমন আছে তেমনি থাকবে, আর এমনি ধূতপাক বাওরায় চলবে—এক সভ্যতা থেকে আর এক সভ্যতা, এক বিপর্যয় থেকে আর এক বিপর্যয়, তবু কোনো কিছুর পরিবর্তন নেই, তার কারণ একটি জিনিস বরাবরই বাদ পড়ে যাচ্ছে। তা হলো চেতনা, তারই পরিবর্তন। এই মোট কথা।

আমার যা মত সেটাই তোমাদের আনিতে দিচ্ছি। হাসপাতাল চাও, খুল চাও, সবই করতে পারো; যদি তাতে বৃশি হও, সে ভালো কথা। কিন্তু তার বিশেষ কোনো দান হবে বলে ভেবো না। সেদিন “ইসিও ওয়াসী” (Monseieur Vincent) সিনেমাটি দেখে আমার খুবই ভালো লেগেছিল। তিনি দরিদ্র জনদের বাওরাতে গুরু ক'রে দেখলেন

দিয়ে চলেছে ? নিখিঁড়াভাবে যদি বিচার করো তবে করেকটা বছর পিছনের দিকে ফিরে চাও। তাহলে ক্রমশ আত্মা বেশী গম্ভীরাল বাধবে। সেদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে বলবে, “ওটা আমার স্মৃতি”। কিন্তু জোয়ার সব স্মৃতি যদি বুড়ে যায়, তবু যে তুমি সেই তুমিই থাকবে। এমনি ঐকান্তিকভাবে যদি পরের পর বুঁড়ে বুঁড়ে দেখতে থাকো, তাহলে শেষ পর্যন্ত এক সময়ে দেখবে যে সবকিছুই বাড়িন হয়ে গেল, বাকী রইল একটিনাত্র জিনিস, ভগবানের উপস্থিতি। তাছাড়া সব কিছুই গলে পড়ল, সূর্যের তাপে মাখন যেমন ক’রে গলে যায়। এ আবিষ্কারটি যখন করবে তখন দেখবে যে তুমি কতকগুলি অভ্যাসের খাঁটি-বাঁধা বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়। সেই এখন কথা বলছে, কিন্তু ভগবানকে সে জানছে না, তার সম্বন্ধে অচেতন। প্রত্যেকের মধ্যে এমনি শত শত “আবি” কথা বলছে শত শত বিভিন্নভাবে। সকলেই অচেতন পরিবর্তনশীল তরল “আবি”র দল। আর যে “আবি” কথা বলছে, সে কালকের “আবি”র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বেশীদূর পর্যন্ত অনুসরণ করতে গেলে “আবি” তখন লোপ পাবে। শেষে থাকবে একমাত্র ভগবান, তাঁকেই দেখবে সবসময় একরকম।

★

প্রশ্ন : কেউ কি প্রকৃত জ্ঞত ইচ্ছা নিয়ে জগতের কোনো গাথাবাই করতে পারে না ?

উত্তর : জ্ঞত ইচ্ছার দ্বারা অনেক কিছুই বদলানো যায়, কিন্তু তা পুরোপুরি বিস্তৃত ও অবিপ্র হওয়া চাই। সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সত্য যে ইচ্ছা বা প্রাণনাকে জগতের মধ্যে ছেড়ে যেওয়া হয় তার কাছ সে নিশ্চয়ই করে। কিন্তু তেমন জিনিস কোথায় হয়, যখন চিন্তা হয়ে জা মানুষের ন্ত্রিকের মধ্যে আসে ? তখন তা কাননায় বলিন হয়ে নীচে নেমে যায়। তুমি যদি আভ্যন্তরীণ চেতনা ও জ্ঞানের প্রচেষ্টার দ্বারা কারনাকে সম্পূর্ণরূপে বিশেষ ক’রে দিতে পারো, এবং তাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে সেই চেতনা ও জ্ঞানের আলোতে তিতের বাঁটি শুভ-ইচ্ছা এনে ফেলতে পারো, তাহলে দেখবে যে কারনাপূরণের আনন্দের চেয়ে তার আনন্দ শতগুণে তীব্র হবে। এবং তার যা ফল হবে তাও অতি আশ্চর্য। জগতে তা এমন স্মরণের চেউ তুলবে যার সম্বন্ধে জোয়ার কোনো ধারণাই নেই। তা খুবই ব্যাপক, কারণ যে স্রষ্টার তুমি স্বষ্টি করলে তার ক্রমশঃ ব্যাপ্তি হতে থাকবে। বরফের চাঁদর যেমন গড়াতে গড়াতে বেড়ে চলে তেমনি ক’রে তাও ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে। তোমার আপন বক্তাবের মধ্যে যে অল্পটুকু তুমি করলে, তা যতই সামান্য হোক, সারা জগতের মধ্যে তখন তা কাঙ্ক্ষ করতে পারবে। এই কথাটাই জোয়ারের আবি বলতে চাইছিলাম : তিতের দিকের পরিবর্তন না এনে বাইরে যা কিছুই করো—হাসপাডলি বা ছল প্রভৃতি—তা সবই করা হয় আত্মপর্ষ থেকে, নিজেকে বাড়ো ক’রে ডাঙা থেকে ; তার চেয়ে নিজের মধ্যে যদি কিছু একটু অজ্ঞান

করতে পারো, তবে তা খুব গুপ্ত থাকলেও তার কাজ হবে অনেক বেশী। জোয়ার মধ্যে সত্যের বিগোনা যত কিছু অসত্যের ক্রিয়া হচ্ছে তা নিবাতীকরণে প্রত্যাখ্যান করছে। কিন্তু উক্তন প্রচেষ্টা সাধনায় কিছু হলেও তার ঘাটা বখেটে কাজ হচ্ছে, জোয়ার কাছে তা অসামান্য থাকলেও একটা সাধারণ ও নির্ব্যক্তিক ভাবে তার কিছু স্রবন ঘটছে।

যথার্থই যদি নতুন করতে চাও, তাহলে তার পক্ষে প্রকৃত উপায় হলো নিজের মধ্যে ঐকান্তিকতার সঙ্গে একটির পর একটি ক'রে জয়লাভ করে যাওয়া, তাতেই জোয়ার দিক দিয়ে যথাসাধ্য অগংকন্যায় করা হবে।

*

প্রশ্ন : আনন্ড যদি জয়লাভ করি, তা কি সবগ্ন জগতে কাজ করবে ?

উত্তর : তাতে ভগবতের সম্বন্ধ অবশ্যই স্থানান্তরিত না। জোয়ার নিজের অর আয় কতটুকু, তার মধ্যে সকল মানুষ আঁটতে পারে না। তার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের দরকার। সবগ্নের তুলনায় জোয়ারটুকু খুব সামান্য, তার মধ্যে আবার অন্যান্য জিনিস এসে বিশেষ যায়। একে বলতে পারো জগতে নতুন কিছু ছয় করবার মতো শক্তি অর্জন করা ; তা বাস্তবে ফলপ্রসূ হতে হয়তো শতাব্দীকাল বেগে যেতে পারে। প্রশুটা হলো আনুপাতিক হিসাবে। তুমি জোয়ার আপন পরিণালের মানুষদের নিয়ে পরীক্ষা চালাতে পারো। কিন্তু জোয়ারকে হতে হবে পুরোপুরি ঐকান্তিক, অনুক প্রকরের ফল নিলবে এমন কথা ভেবে কিছু করবে না, কেবল চাইবে জোয়ার আপন চেষ্টায় জয়ী হতে। সেই জয়লাভ ঘটলেই জোয়ার আপপাশের মানুষগুলির উপর তার ফল গিয়ে পড়বে। কিন্তু তার মধ্যে কোনো ব্যবসায়ারী বনোভাব থাকলে চলবে না ; যদি থাকে, "আমি আমার সোম গুণেরে নিচ্ছি, কিন্তু অনুক নোকটিও তার সোম গুণেরে নিক", তাহ'লে হলো না। "আমি এটা মিচ্ছি, তার বদলে ওটা চাইছি", এই হলো ব্যবসায়ারী। এতেই সব কিছু নষ্ট করে। ওর মধ্যে বিত্তহিও নেই, ঐকান্তিকতাও নেই, কেবল বাটোয়ারী।

জোয়ার ঐকান্তিকতা এবং আশুচা এবং লক্ষ্যের মধ্যে যেন অন্য কিছুই না বিশেষ যায়। তুমি যা কিছু করছ তা ভগবানের জন্য, সত্যের জন্য, সম্পূর্ণতার জন্য, এ ছাড়া আর কোনোই বক্তন বা চিন্তা জোয়ার নেই। তাইতেই পাবে সবুচিত সাফল্য।

*

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ বনেছেন, "ভগবানের পূর্ণ (integral) ধারণা" সম্পর্কে, তার অর্থ কি ?

উত্তর : প্রত্যেক মানুষই ভগবান সম্পর্কে একটা কিছু ধারণা করে, তার আপন ব্যক্তিগত বোধশক্তি ও স্মৃতি ও বনের গতি এমন কি কাহিনা অনুসারে। যে সকল ভগবানকে

তুনি পেতে চাও বা দেখতে চাও, সেইসকল ভগবানেরই তুনি একটা ধারণা ক'রে নাও, স্তম্ভরাং সেখানে তোমার উপলব্ধির কেন্দ্রকে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ক'রে রাখো। কিন্তু যখন আমরা এটা বুঝে দেখি যে সমস্ত কিছুই ভগবান, তখন আমরা ওর চেয়ে অসংখ্য গুণ বড়ো ক'রে ধারণা আনতে শুরু করি, আর তখনই তা আর একটা পূর্ণ স্বকনের ধারণা আসার দিকে। মানুষের চেতনা একটা কিছু গঠী ধরেই তবে বুঝতে পারে, স্তম্ভরাং তার পক্ষে সমগ্রতাবের পূর্ণতার ধারণা করা খুবই কঠিন। কিন্তু যারা নন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে জানে, তারা চেষ্টা করতে থাকলে নিজেদের যথেষ্ট ব্যাপ্ত ক'রে নিয়ে সেই পূর্ণতার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছতে পারে।

নিশ্চয়ই তুনি ভগবান সম্বন্ধে এমন কিছু ধারণা ক'রে রেখেছ যা তোমার নিজের প্রকৃতি ও করুণার সঙ্গে খাপ খায়। এখন যদি তুনি নিজের গঠী থেকে বেরিয়ে এসে পূর্ণযোগ করতে শুরু করে, তখন তোমাকে এটা বুঝে দেখতে হবে যে ভগবানকে তুনি যেমন নিজে ডাখছো তেমন হওয়া ছাড়াও অন্যান্যকেও তাঁকে যেমন ডাখছে তিনি তেমনও হতে পারেন, —এবং তা ছাড়াও তিনি এমনও হতে পারেন যা সকলেরই ধারণার ব্যতীত। এ যদি তোমার বোধের মধ্যে আসে তাহলে তাঁর পূর্ণতার ধারণার এক ধাপ এগোলে।

আপন সহজাত প্রবৃত্তি থেকে ও এমন কি অজ্ঞাতসারেই লোকে চায় যে ভগবান যেন হয় ঠিক তাদেরই ধারণার মতো। কিছুমাত্র না ভেবেচিন্তেই তারা আপনা হতে বলে থাকে : “হী, এই হলো ভগবান, কিন্তু না, ওটা তা নয়।” কিন্তু বাস্তবিক তারা জানে কতটুকু ? আবার এমন লোকও দেখছি যারা এ পথে আদৌ পা দিতে না দিতে, এখানে এসেই একবার চারিদিকে চেয়ে আর কয়েকজনকে বেঁধে নিয়ে তৎক্ষণাৎ মন্তব্য ক'রে বলে, “এ আশ্রমের সঙ্গে ভগবানের কোনো সম্পর্ক নেই, তার কোনো নামগন্ধও এখানে দেখছি না।” তাদের যদি তুনি জিজ্ঞাসা করে, “ভগবান কাকে বলে ?” সে প্রশ্নে তারা হাফড়ে বাবে, কারণ ও সম্বন্ধে কিছুই তারা জানে না।

এ কথা একেবারে নিঃসংশয় যে, কে-বিষয়ে যে-ব্যক্তি যতই বেশী অজ্ঞান সে সেই বিষয়ে ততই বেশী মতামত প্রকাশ করে, এবং যার ভাঙে যতই বেশী জ্ঞান থাকে সে তার সম্বন্ধে ততই কম মত প্রকাশ করে। তার এমন একটা সময় আসে যখন দুটো একটা নিত্য সহজ কথা কলা ছাড়া কোনোরকম মন্তব্য করাই তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। তখন কেবল সে দেখতেই থাকে, পারস্পরিক সম্পর্কে কোন জিনিস কেমনভাবে রয়েছে, কোনটি কোনখানে থাকা উচিত ছিল কিন্তু তার চেয়ে কতটা তফাতে রয়েছে (সে কথাও তার জানা, কারণ জগতে তেমনি বিপৃথন্যই ঘটেছে), কিন্তু কোনও সে তাই নিয়ে কিছু ভালোবাস বলে না। কেবল দেখেই যায়।

আবার এমন সময়ও আসে যখন ঐরকম ভাবে আর বনাই যায় না যে, “এটাই ভগবান, ওটা তা নয়,” কারণ তখন তুনি সারা জগৎকে এমন সমন্বিতভাবে এক ক'রে দেখে যে তার থেকে সামান্য কিছুও বাদ দিতে গেলে তার সেই অনন্য সমগ্রতা নষ্ট হয়ে যাবে।

তারপর আরো দুই এক ধাপ এগিয়ে যাও, তখন নিঃসংশয়ে দেখতে পাবে যে ভগবানের উল্টো জিনিস বলে যা তোমার ননকে বুঝে পীড়া বিচ্ছিন্ন, তা কেবল সেই জিনিসগুলির স্বানৃত্য হওয়াতেই তেমন দেখাচ্ছে। প্রত্যেক জিনিসটা থাকবে তার যথাযথ স্থানে, আর সব কিছুই থাকবে এমন নবনীর হয়ে যাতে এই অভিব্যক্ত ভগবতে যাই কেন এসে যুক্ত হোক, তাকে সান্নিধ্যের সঙ্গে গ্রহণ; অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিতে পারবে। বিশ্বের মধ্যে চলছে আভ্যন্তরীণ অন্তর্গঠনের নিত্যক্রিয়া, যাতে তার উত্তরোত্তর ব্যাপ্তি ঘটছে কিংবা তা উত্তরোত্তর স্ফীত হতেছে; এইভাবে বিশ্ব হচ্ছে পূর্ণ হতে পূর্ণতর—আর এর কোনো শেষ নেই। আর যখন নতুন কিছু এখানে অভিব্যক্তি পাচ্ছে তখন আগাগোড়া আবার নবতর ভিত্তিতে সংগঠিত হচ্ছে,—সুভাঃ এমন কোনো বুদ্ধত নেই যখন এর সমগ্রতা সক্রিয় নয়। কিন্তু এ কাজ যদি দিবা নিরবের নির্বেশে চলে, তাহলে তার মধ্যে এমন সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য থাকে যে অভ্যন্তরীণ সক্রিয়তা হলেও তা প্রায় চোঁটই পাওয়া যায় না।

এখন, ঐক্যপ চেতনার অবস্থা হতে যদি অপেক্ষাকৃত স্বাধা চেতনাকে ফিরে আসো, তখন তোমার পৃথকভাবে বোধই হতে থাকবে যে কোন জিনিসগুলি তোমাকে সত্যচেতনা লাভের পক্ষে সাহায্য করছে, আর কোনগুলি পিছতান নাগিয়ে তার প্রতিরোধ করছে। তখন সেই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে তোমাকে বলতেই হবে; এই জিনিসটা হলো ভগবানের দিকের, কারণ এতে সেইদিকেই আনাকে নিয়ে যায়; আর ওটা হলো তার উল্টো দিকের, কারণ ওটা বিরুদ্ধ দিকে যায়।

কিন্তু এ সব হলো প্রায়োগিক দিকের প্রশ্ন, বাস্তবের জীবনে চলবার জন্য—কারণ এখনও তুমি ওর উপরে চেতনাকে আরও করোনি, এখনও তেমন আন্তর পরিপত্তি আসেনি যাতে কোনোরূপ সংগ্রামের প্রয়োজনই থাকে না, সকল সংগ্রামের রাজ্যকে তুমি ছাড়িয়ে চলে যাও। কিন্তু চেতনার ও কর্মে সেক্ষপ অবস্থা না আসা পর্যন্ত সংগ্রাম তোমাকে করতেই হবে, আর সংগ্রাম থাকলেই সেখানে ভালোমন্দের বাছবিচারও থাকবে, ইষ্টানিষ্টের বিবেচনাও করতে হবে।

আর সর্বাপেক্ষা সুনিশ্চিত বিবেচনার কাজ হবে সত্যানে ও খইচছায় ভগবানের অভ্যন্তর ও বিধানের কাছে যথাসম্ভব সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ। তাহলে আর কিছু ভুলচুক দ্বার বা বিধা আলোকে সত্য হলে করবার দার থাকবে না।

•

(৩)

প্রশ্ন: সকল কিছুই নাকি ভগবানের দিকে আকর্ষিত হচ্ছে। বিরোধী শক্তির দ্বারা কি তাই?

উত্তর : এর উদ্ভব নির্ভর করে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। ঐভাবে সে কথা বলা যায় না। কারণ অপ্রকাশ আকর্ষণও আছে, তা এতই প্রচলিত ও গুপ্ত যে খাচ্ছে বলে জানাই যায় না।

জড়ের মধ্যে যেখানে অসাড় নিষ্ক্রিয়তা (যদিও তা কেবল দৃশ্যতঃ), সেখানকার আকর্ষণ অনেকটা সত্তাবনার মতো ; অর্থাৎ তা পরে হবে পরিস্ফুট, আপাতত জানাই যাচ্ছে না।

এই কথা বলতে পারো যে সকল প্রকারের চেতনাই ভগবানের দিকে আকর্ষিত হচ্ছে, সে নিজে তা জানুক বা নাই জানুক। কিন্তু আগে সেখানে অন্তত কিছু চেতনা থাকা চাই, নতুবা তার সম্পর্কে এ কথা বলা চলেবে না।

এমন কি এখনকার পৃথিবীতে যারা সব চেয়ে বেশী চেতন-সত্তা, সেই মানুষদের মধ্যেও এমন অসংখ্য ব্যক্তি আছে যারা প্রচলিতভাবে আকর্ষিত হচ্ছে ভগবানের দিকে, অথচ সে কথা তারা নিজেরা জানে না ; এমন কি অনেকে তার সত্তাবনার কথাও সঠিকভাবে অস্বীকারই করে। কিন্তু সেই অস্বীকারের তলে তলে এমন কিছু তৈরি হচ্ছে যা তারা জানেও না বা ইচ্ছাও করে না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু সকলেই যাবে ঐদিকে। তফাৎ কেবল সোজা পথ আর ঘোরাণো পথ নিয়ে। অনেক দূর থেকে ঘুরে ঘুরে যেতে হলে অনেকটা বিনয় লাগবে। কিন্তু এমন সত্তাও আছে যারা খনন গোলকধাঁধার পথই বেছে নিয়েছে, যতকাল পর্যন্ত পারে ওরই মধ্যে থেকে যেতে চায়। আর তারাই ভগবানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। আবার যাদের প্রকৃতি উচ্চ ধরণের, তারা যদিও জানে যে ঐক্যপন্থা সংগ্রাম করতে থাকা নিরর্থক ও নিষ্ফল, তথাপি তারা ওতেই যেন মগ্ন পায়। যদিও তা মগ্নের পথে নিয়ে যায় তবু সেই রাস্তাই তারা বেছে নেয়।

এমন অনেক সত্তা আছে, অর্থাৎ মানুষই আছে, যারা জেনেওনেও কুর্কর করে—যেমন মদ্যাদি পান, নকিয়া প্রভৃতি ধূমপাড়াবির ইন্ডেক্সশন নেওয়া ইত্যাদি—যদিও তারা বিলম্বিত জানে ওতে আনবে বিনাশ ও নুত্ব। তবুও তারা ঐগুলোই চায়।

*

প্রশ্ন : তাদের মধ্যে দরজো আত্মসংযম নেই।

উত্তর : তা নয়, আত্মসংযম প্রত্যেকেরই মধ্যে থাকে একসময়। সেই সময়টিতে একবার যদি সে “হী” না বলতো, ঐ সিদ্ধান্তটি মজুর না করতো, তাহলে ও কান্ন আর সে করতোই না।

এমন মানবদের নেই যে তার উপর বাইরের একটা কিছু চাপাতে গেলে তাকে প্রত্যাখ্যান করার মতো শক্তির সেখানে অভাব হবে। তারা এমন কথা বলে, “আমি তাঁর না করে পারি না”, তারা তাদের অন্তরের মধ্যে ভাই ছাড়া অন্যায়কর চায় না বলেই ওরূপ বলে, সেই

কৃষ্ণের দাস্য ভাষা ইচ্ছা করেই বরণ করেছে। একসময়ে খেচড়ার এই দাস্য সে বল্লর করেছে।

আমি তার চেয়ে আরো বলি বোগ সম্বন্ধে এই কথা, "একটা এমন সময় এসেছিল যখন রোগকেও তুমি ঐভাবে বেনে নিজেছ। তা যদি না নিতে তাহলে আজ তুমি অসুস্থ হতে না। কেবল যারা নিজেদের সম্বন্ধে ও নিজেদের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া সম্বন্ধে অচেতন থাকে তারাই কখন কি করছে সে কথা জানতে পারে না।"

তবে বেনন জোনার দৃষ্টভঙ্গী হবে তার উপরেই সব কিছু নির্ভর করবে। এককরন দৃষ্টভঙ্গীতে দেখবে যে অগতির কোনো কিছুই একেবারে নিরর্থক নয়। কেবল যেগুলি পূর্বে এককালে গ্রাসা বা সমর্থনীয় ছিল, পরবর্তী অন্য কালে তা রইলনা। তখন লোক বলতে শুরু করেন, ওগুলো অতি ধারাপ জিনিস, কারণ তখনকার ইচ্ছা জেগেছে সেগুলিকে কর্তন করতে। কিন্তু বিশুর ইতিহাসে দেখবে, আর আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের কথা যদি বরো তবে এই পৃথিবীর ইতিহাসেও দেখবে যে, এখানে যা কিছু দেখা যাচ্ছে তার প্রত্যেক-টারই কোনো-না-কোনো সময়ে কিছু প্রয়োজন এবং দাম ছিল। তার পরে বেনন বেনন অগ্রগতি হয়েছে তদনুযায়ী অনেক কিছু বাড়িল হয়ে গেছে, কিংবা অতীতের জিনিসের পরিবর্তে ভবিষ্যতের নতুন জিনিস এসে তার স্থান নিয়েছে। এখন যেগুলি টিকে থাকার কোনো হেতু নেই তারই সম্বন্ধে তুমি বলছ, "ওগুলি মশ", কারণ জোনার মধ্যে এসেছে সে অভ্যাসকে দূর করার তাগিদ। কিন্তু এককালে তা মশ ছিল না, মশ ছিল অন্য কিছু।

তুমিও হয়তো এক ধরনের অবস্থা ও অনুভবের ও কর্তার সীতি অনেককালই অনুসরণ করেছ, তাকে তখন মশ ভাবোনি, এমন মনে হয়নি যে তা বৃথা বা পরিত্যাগ। কিন্তু হঠাৎ একদিন জোনার অজ্ঞাতে কি ঘটে গেল, দৃষ্টভঙ্গীটা গেল পাল্টে, তখন তুমি বললে, "এ কি? আমি এখনও এই করছি? ছি ছি, এ যে অসহ্য, এ আমি চাইনা।" তখন জোনার সেগুলিকে ত্যাগ করার সম্বন্ধে এসেছে, জোনার নতুন মনোভাবের সঙ্গে তা আর পাপ যাচ্ছে না, যে অবস্থাতে এগিরে গেছ তার সঙ্গে আর বনছে না। সেই জিনিসের স্থান আর জোনার মধ্যে নেই; তার স্থান এখন অন্যত্র, সেইজন্যই জোনার তাকে খারাপ লাগছে। কিন্তু জোনার কাছে বা মশ, অন্যের কাছে তা হয়তো এখনও খুব ভালো লাগবে, যারা রয়েছে জোনার থেকে নীচের দরে।

জোনার অবস্থার চেয়ে নিম্নতর, অন্ধকার অজ্ঞান ও অচেতনের অবস্থা নিশ্চয়ই অনেক আছে। যে অবস্থা জোনার কাছে অসহ্য ও পরিত্যাগ্য বোধ হচ্ছে, তাই নিম্নতরের সম্ভাব্যদের কাছে প্রদীপ্ত ও প্রীতিপ্রসূ বলে মনে হবে। তাহলে তাকে মশ বনার অধিকার জোনার কোথায়? তুমি শুধু এই বলতে পারো, "আমার ও আর দরকার নেই, আমি এমন অবস্থার দাবীতে চাই যেখানে ওর কোনো স্থান নেই, কিংবা ওগুলো সরে যাক অন্যত্র যেখানে ওর

হান হবে।” কিন্তু তুমি বিচারে তাকে মল্ল বলতে পারো না। কেবল এটুকু বলতে পারো, “আমার পক্ষে ওটা মল্ল, অতএব মল্ল হয়ে থাক”। এই বলে তুমিই তাকে বর্ধন করতে পারো।

এতেই তোমার অগ্রগতি সহজ হবে; নতুবা হতাশ হয়ে কেবল বদি বিলাপ করতে থাকো যে কি যন্ত্রণা তোমাকে বহন করতে হচ্ছে, কি অসহ্যব শোষণলো তোমাকে আঁকড়ে ধরেছে ইত্যাদি, তাতে কিছু কাজ হবে না। তোমার তখন বলতে হবে, “না না আমার কাছে ওর হান নেই, ওগুলি সরে যাক অন্যত্র যেখানে উপযুক্ত আদর পাবে। আমি এখন চলেছি উপরের পথে, উপর ধাপে উঠে চলেছি শুষ্কতার ও পূর্ণতার আনন্দের অভিসুখে; যে জিনিস আধাচন্দ্রের তা আমার থেকে দূর হোক।” এ ছাড়া আর কিছু নয়।

বর্ধনই পুরোন কোনো কিছুকে ধারাপ বলে বোধ করতে থাকবে, তখনই জানবে যে তোমার কিছু অগ্রগতি হচ্ছে। তখন আর হতাশ না হয়ে কিংবা বিলাপ না ক’রে বুনি হয়ে ঘনবে, “ঠিক আছে, আমি এবার চলেছি এগিয়ে।”

*

প্রশ্ন : আপনি আপনার ১৯৫৬ সালের নববর্ষ বাণীতে বলেছেন, “সর্বশ্রেষ্ঠ অতলাত বেখানে হয় সেখানে কোনো উচ্চতরাল থাকে না। নতুন জগৎ আবির্ভূত হলে তখন তা চাক পিটির আহির করা হবে না।” ঐ বাণীর ভিত্তিকার তাৎপর্য কি তবে এই যে তেরনি শ্রেষ্ঠ রকনের জয়লাভই এবার আসন্ন ?

উত্তর : ঐ বাণীর অর্থ বুঝি সোজা, অর্থাৎ বেশী কিছু গুণগোণ না ক’রে যা হতে যাচ্ছে তাকে হতে দাও। অতত আমার দিক থেকে বলতে পারি যে এইসকল ওর অর্থ : যা হবে তার আগে তাই নিয়ে কিছু কোলাহল না করাই ভালো, তাতে যা হয়ে দাঁড়াতে পারে তাকেই বলছি “চাক পেটানো”।

লোকে জিজ্ঞাসা করে, “সে জিনিসটা কেমনভাবে হবে ?” তা তোমরা দেখতেই তো পাবে। সবুর করে। অন্ততপক্ষে আশ্চর্য রকম কিছু হবে তো ? আমি তার জবাবে বলি, “তা জানিনা।” কারণ তখন আমি নিজেই সাধারণ অগতঃচতনার মধ্যে স্থাপন করি, যেখানে রচিত হচ্ছে যে এবার কম্পনাভীত অসাধারণ রকমের একটা কিছু ঘটবে যা ধারণার বাইরে,—কিন্তু আমি আগেই তোমাদের বলেছি যে বর্ধন কোনো কিছুর সহজে একটা ধারণা করতে পারবে তখন জানবে যে তা এসেই পৌছে। নতুবা তার সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নোটে করা যেতো না।

হী, আমরা আমাদের উচ্চতরাল মধ্যে স্থাপিত ও প্রদীপ্তরূপে অনুভব করি যে তা কেমন জিনিস। কিন্তু বাস্তব চেতনার মধ্যে নেমে এসে তখন বলতে হয়, “কই, কিছুই বুঝছি না।” বর্ধন সেটা বাস্তবে আসবে তখন বাস্তবভাবে বলা হবে যে তা কেমন জিনিস—আর আমাদেরও

তা বলতে হবে না, তোমরা নিজেরাই দেখতে পাবে। যাদের নজরে পড়বে, আশা করি তুমিও তাদের মধ্যে একজন হবে। কারণ এমনও অনেক নোক থাকবে যারা মোটে কিছু দেখতেই পাবে না।

অতএব এমন থেকে সকলের কাছে বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে কি লাভ আছে যে, “শোনো শোনো, ওটা হবে এমনি জিনিস।” তারা সে কথা শুনে তখনই বলবে, “কই, আমরা ভেবন কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না”,—যেমন তোমরা সেদিন সেই “জানী” (Le Sage) নাটকটির অভিনয়ে দেখলে, মনে পড়ছে কি? সেখানুও এসে বললে,—“ভগবান এখানে উপস্থিত রয়েছেন, তিনি তোমাদের সব কথাই শুনছেন”,—তার জবাবে একজন বলে উঠল, “কিন্তু আমি নিজে সেটা তো দেখছি না।” এখানেও ঠিক সেইরকম। যেমন অনেকে এই আগ্রহে এসে বলে থাকে, “এখানে আধ্যাত্মিকতার কোনো চিহ্নই নেই।” কেমন করে তারা সেটা দেখবে? কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে?

সে যাই হোক, আমি কিন্তু খুবই আশা করি যে তার কোনো অভিব্যক্তি ঘটলে জোয়রা ঠিকই তা দেখতে পাবে। অবশ্য হঠাৎ যদি ভেবন কোনো উল্ফল ও জোয়ালো রকমের অভিব্যক্তি এসে পড়ে যাতে সব কিছুই বাহ্য চোয়রাও পানুতে যার, তাহলে তা কুতূহলবোধেরও নজরে পড়বে। কিন্তু অতদূর পর্যন্ত হওয়া যথেষ্ট সম্ভবাসাপেক্ষ, এখনই তা ঘটে যেতে পারে না, তা হবে আরো অনেক পরের কথা। তার আগে আরো অনেকগুলি বড়ো রকমের ব্যাপার ঘটবে, যার ওরকম ওর থেকেও বেশী, এ কথা তোমরা জেনে রাখো।

কিন্তু একই তোমরা দেখতে পাও, যখন তা ফুল হয়ে ফোটে। কিন্তু সেই ফুটে ওঠার অনেক আগের থেকে তার অদ্ভুত-সত্তাটি জন্মায় গাছের শিকড়ের মধ্যে।

*

প্রশ্ন অভিব্যক্তি বা ঘটবে তা কি খাটি আধ্যাত্মিক জিনিসই হবে, অর্থাৎ যারা যোগ করছে তারাই শুধু তা দেখতে পাবে, কিংবা বাইরের জগতের লোকেরাও তার ফল দেখতে পাবে?

উত্তর : কেন বাপু, তাকে নিত্যন্ত ভবিষ্যন্তের জিনিসই বা বলছ কেন?

ইতিমধ্যে অনেক বছর থেকেই তো জগতে কত অসাধারণ ও কল্পনাতীত রকমের কল ফলে গেল। অবশ্য তা দেখবার নজরে কিছু একটু জ্ঞানদৃষ্টি থাকাও দরকার, নতুবা তাকেও জোয়রা নিত্যন্ত মানুসী ব্যাপার বলেই ধরে নেবে—কারণ কোথা থেকে কেমন করে কি হচ্ছে সে কথা মোটে বুঝতেই পারবে না।

আর পরেও হয়তো ঐরকমই হবে; কত বিরাট ওলটপালট হয়ে যাবে, কত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে যাবে, তবু লোকে বলবে “ও ওটা। তা এমনি হওয়াই তো স্বাভাবিক।” কারণ তা কেমন করে হচ্ছে সে কথা তারা জানবে না।

জগতে নতুন কিছু বাটা ? সে তো নিতাই ঘটছে। সব দিকেই কিছু বেড়ে যাচ্ছে, নতুন কিছু কাজ হচ্ছে, নতুন প্রবেশা আসছে, নতুন নতুন দিক খুলছে, নতুন ইচ্ছা আর নতুন ভাবগুলো যুটে উঠছে,—সর্বত্রই তাই হচ্ছে। কিন্তু কেমন ক'রে কোথা থেকে কোনটা হচ্ছে তা জানো না বলে তোমরা ভাবছ এগুলো সবই হচ্ছে “স্বাভাবিক”। হাঁ, স্বাভাবিক তো বটেই, কিন্তু তা মানুষী স্বাভাবিকের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা গ্রহণ স্বাভাবিক।

অথবা এ খুবই সত্যসত্য কথা যে আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়াগুলি বৃদ্ধিতে হলে আধ্যাত্মিক চেতনা থাকে চাই। আত্মশক্তির সম্মান যদি না জানো তাহ'লে কেমন করে তার কাজগুলি দেখবে ? তার ক্রিয়ার ফল যখন বাস্তব জগতে ফলবে তখন বাস্তবের মানুষ হয়ে তাকে তুমি বলবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তুমি আবার কাজই বা কতটা জানো আর স্বাভাবিক প্রকৃতির কাজই বা কতটা জানো ? প্রকৃতির ক্রিয়া হচ্ছে—আনি বাস্তব প্রকৃতির কপাই বলছি—খুব কনই জানা আছে, প্রায় কিছুই না, কারণ তার হচ্ছে আমরা যা কিছু নতুন শিখি তা আগেকার জানা নিয়মের ব্যতিক্রম দেখে।

তাহলে প্রকৃতির নিজস্ব কাজ আর তার মাধ্যমে আবার কাজের মধ্যে পার্থক্য কেমন ক'রে ধরবে ? অথচ প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়টা কি পার্থক্য। তাই বোঝাই দরকার। কিন্তু আত্মাকে বোঝার মতো ডেনন হচ্ছে ও সুনির্দিষ্ট চেতনা যদি তোমার না থাকে, তাহলে তাকে ও তার কাজকে স্বতন্ত্ররূপে চিনবে কিরূপে ? এ খুব সহজ মুক্তির কথা। জগৎ চলে থাকবে তার নিষেধ তালে, আর এই সব ঘটনাগুলি ভিতরে ভিতরে ঘটে যেতে থাকবে। হয়তো খুব অল্প কয়েকজন নাত্রই জানবে যে কোথা থেকে কি হচ্ছে। এই হলো কথা।

ধরো যদি তোমাকে একটুও প্রস্তুত হতে না দিয়ে হঠাৎ এই নুহুর্ডে একেবারে সেই দুই তিন হাজার বছরের আগেকার পৃথিবীতে হাজির করা যায়—কিংবা তার চেয়েও কম ক'রে নাত্র এক দুই হাজার বছর আগেকার জগতে ফেনে দেওয়া যায়, তাহ'লে কি হবে ? এখনকার মানুষ তখনকার অবস্থায় পড়ে সেই নিদারুণ পরিবর্তনে এমনই হাঁপিয়ে উঠবে যে তা স্যারস্বক, খুব কম লোকই অতটা পরিবর্তন সহ্য করতে পারবে। কিন্তু সবসামগ্রী স্বতন্ত্র প্রকৃতি ঐক্যপ “স্বাভাবিক” উপারে এমন ধীরে ধীরে অতটা আশ্চর্য পরিবর্তন এনে ফেলছে যে লোক ত প্রায় টেরই পারনি। তাই তারা সে কাজকে বলে স্বাভাবিক।

এ কোনো ভাবচিত্রণ নয়, সাহিত্যিক বাচন নয়, যখন বলা হয় যে এই সাধারণ চেতনার পরিবর্তে যখন তুমি সত্যচেতনার মধ্যে প্রবেশ করবে, তখন তোমার কাছে এই জগৎটাও ফুলে যাবে। তা কেবল আপাতদৃষ্টিতে বা ধারণাতে মাত্র নয় ; এখন এই সাধারণ চেতনাকে যতটা বা দেখছ তার চেয়ে আরো অনেক বেশী অন্যান্য কত জিনিস তুমি দেখতে পাবে ; তখন সব কিছুর সম্পর্কও দেখবে আলাদা, তার কারণগুলিও দেখবে আলাদা, ফলগুলিও দেখবে আলাদা। এখন যা দেখছ তা পুরোপুরি স্বচ্ছভাবে নয়, কোনো কিছুর পিছন পর্বত তুমি দেখছ না, যা দেখছ তা উপরভাগ বাইরের ছালটুকু মাত্র ; ভিতরদিক থেকে

কোন ভিনিস যে তাকে চান্নাচ্ছে, কিসে যে তার অস্তিত্বকে বলাব রাখছে. তার কিছুই ভূমি দেখতে পাচ্ছ না। কিন্তু একপ দেখা তখন সবতই পান্টে বাবে—তখন এইওলোকই মনে হবে কৃত্রিম, অস্বাভব, তার অস্তিত্বই প্রায় না থাকার মতো। যখন ভূমি অন্যায়সে সহজ-ভাবে সেই মন্তু দেখা দেখতে শুরু করবে, তার জন্য তখনার কোনো ধান-বারণা করা বা চেষ্টার দ্বারা একাগ্রতা এনে কষ্টসাধন করার দরকার হবে না, যখন সেই মূর্খই তখনার সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে আসবে—তখন ভূমি সব কিছুই অর্থ ছানবে অন্যরূপ ভাবে, অসংকেও দেখবে অন্যরূপ।

তার জন্য কতকটা প্রাথমিক ব্যাপাংক অতিক্রম করা অপরিহার্য। বারা সেই পথটুকু অতিক্রম করেছে, তারা তখন নিজেরাই দেখতে পার যে এখনকার এই সব জল্পনা আলোচনা বা প্রশ্নাদি করা তাদের পক্ষে কিছুই আর প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক, আমার ঐ বাণীটির সহজে যে কথা বলতে চাইছিলাম। তা শুধু এই: একদিন আমার কাছে বাণী চেরে পাঠানো হলো, “আগামী বছরের জন্যে একটা বাণী লিখে পাঠাবেন কি? তাহলে আমরা সেটা ছাপবো”। এমন ক’রে আমার কাছে চাওয়া হয়, আর আমি দিয়েও থাকি। তখন কি করি? আগমনো-নুখ নববর্ষের দিকে আমি একবার চাইলাম—তার সহজে কিছু বলতে মনে আমাকে একবার তার দিকে চাইতেই হয়। আর ঐদিকে চাইতে গিয়েই সকলে যা জল্পনা করছে সেদিকে আমার নজর পড়ল, এই তথাকথিত আশ্চর্যবর বছরে কি কি ঘটবার তারা প্রত্যাশা ও জল্পনা করছে। আমার সেই সঙ্গে এও সেরছি যে ইতিমধ্যে কতটা কি এগিয়ে এসেছে। দুই দিকে চেরে আমি তখনই ঠিক ক’রে কেনলাম যে সব চেরে ভালো কাজ হবে, কি কি ঘটতে পারে তাই নিয়ে কোনো কথাই না করা।

কিন্তু সবাই যখন চার যে প্রকাশ্যভাবে ছাপার অঙ্করে কিছু ঘোষিত হোক, তখন কাজেই আমি ঐ কথাগুলি বললাম। তা ভিনু আর কিছু নয়। তবে ওর মধ্যে আমি এই কথাই বলতে চেয়েছি যে, “বেশী ব্যাব্যার না ক’রে ছাপচাপ থাকাই ভালো”। এ ছাড়া আর কিছু বলতে চাইনি। বেশী কথা বলতে কিবো য়ে চৈ করলে কিছু লাভ হয় না। যা হবার তা হতে থাক গভীরতর নির্দেশে, আমরা বেন তাই নিয়ে নির্বেদ্য দর্শকের মতো কিসক-কোলাহল না করি।

আর বিশেষ ক’রে এখানে ডেমরা বেন বনো না, “জেনে নাও যে একর এমন হবে আর ভেদন হবে”। ওতে জিনিসটা আরো কঠিন হয়ে পড়ায়। এমন কথা বলছি না যে তার দ্বারা উন্মত্ত কাথটি বেবে বাবে, কিন্তু বেশী বলাকওয়া করলে হয়তো তার কাথটি কঠিন হয়ে উঠতে পারে। অতএব যা হবার তাকে আপনা হতেই হতে নাও।

ডেমরা অনুমত্ত হয়ে বুঝ ধীর দ্বির চিন্তে এই কথাগুলি ভেবে দেখ, “আমরা যে উপ-ধর্মের প্রশ্ন নিয়ে এতটা সেরেগোল করছি, এ জিনিস দশ হাজার বছর পরে কোথায় থাকবে?”

কালের গতিতে ভবিষ্যৎ-উপলব্ধির অন্য প্রস্তুতির ইতিহাস তালিকাতে এর স্থান গিয়ে দাঁড়াবে অস্পষ্ট একটি বিপুল নগর। তাহলে এই নিয়ে এত উদ্বেগিত না হয়ে যতটুকু আশাবাদের করণীয় তাই নীরবে করতে থাকাই আশাবাদের পক্ষে যথেষ্ট।”

কিন্তু অনেকে চায় মনকে নিয়ে মনন করতে, যেমন ক’রে মাধনকে মনন করা হয়। তার অন্তর জোনাদের যেতে হবে কবির কাছে, আনার কাছে নয়। আমি কবি নই, কাব্যই পছন্দ করি। বলার চেয়ে করাই বেশী ভালোবাসি। *

* S. A. I. C. E. Bulletin, Feb. '62 থেকে। অনুবাদ—সত্যপতি জটায়ব

প্রশ্নোত্তর

“চিন্তাবলী ও সূত্রাবলী” (Thoughts and Aphorisms) সম্পর্কে

৬৭

“মানুষের মধ্যে পাপ বলে কিছু নেই, যা আছে তা শুধু রোগ, অজ্ঞানতা ও অশুভরোগ”।

৬৮

“পাপের বোঝা আসার প্রয়োজন ছিল, যাতে মানুষ আপন অপূর্ণতার বিরক্ত হয়ে ওঠে। অহংকারকে ধ্বংস করার জন্য ভগবানের সেওয়া ও এক শোধনায়। কিন্তু মানুষ ভগবানের সেওয়া এই কৌশলকে এমন দিচিত্রভাবে কাছে লাগিয়েছে যে নিজের পাপের বোঝাতে সে হয় বিভ্রান্তভাবে সচেতন, আর পরের পাপ নিয়ে হয় তীব্রভাবে সচেতন।”

৬৯

“পাপ আর পুণ্য নিয়ে আমরা ভগবানের সঙ্গে বিরোধিতার নুকোচুরি খেলি, যখন তিনি আমাদের সুপরিণতির দিকে টানতে চেষ্টা করেন। পুণ্যবোধ আমাদের সাহায্য করে নুকিরে নুকিয়ে পাপকে উপভোগ করতে।”

প্রশ্ন : এই সূত্রগুলি থেকে জানা যাচ্ছে যে পাপ পুণ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কত ঘাটত। আপনিও এই ধরনের কথা বলেছিলেন আপনার ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ তারিখের অনুভূতি সম্পর্কে “আমি দেখলাম যে সাধারণ নৈতিক বিচারের ধারণায় আমরা যাকে দিব্যের অনুকূল বা প্রতিকূল বলে ধরে নিই তা একরকম, কিন্তু অতিনিশ্চয়ের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ অন্যরকম।” আসে এই কথাগুলি বলেছেন : “আমরা যাকে দিব্য বা অদিব্য বলে থাকি তা ভুল ক’রে বলা হয়।.....তখন আমি বুঝলাম যে....এখানকার অগতের সঙ্গে উপরের অগতের সম্পর্ক ধরে দেখলে তখন সকল কিছুই মূল্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণই বদলে যায়। সে দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মনের দিকের বিচার কিছুই থাকে না, কেবল একটা আত্মস্বার্থী বোধ আসে যে, আমরা যা কিছুকে ভালো কিংবা মন্দ বলে ভেবে থাকি তার অনেকগুলিই প্রকৃত-পক্ষে ভাই নয়। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে সব কিছুই নির্ভর করে তার ভিত্তিকার গুণাগুণের সম্ভাব্যতার উপর, অর্থাৎ অতিনিশ্চ অগতের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক ঘটছে তারই উপর।”

৬৯

তাহলে কিরূপ সেই অতিনানস দৃষ্টিভঙ্গী? কিরূপে হতে পারে সেই অতিনানস-অগতের দৃষ্টিভঙ্গীর উত্থান বা তার সঙ্গে সেই সম্পর্কস্থাপন?

*

উত্তর: এ সম্বন্ধে আমি পূর্বে কিছু বলেছি, বনের ভিতর দিয়ে হরিণ ছুটে বাবার কাহিনীটি সম্পর্কে (১৯৬১ অগষ্ট সংখ্যা 'বক্তিকা' প্রটো)। তাতে এ প্রসঙ্গে কিছু ইঙ্গিত করা হয়েছিল।

আমি সেই ঐরা ক্ষেত্রচারিত্র অনুভূতির ভিতরকার অতিনানস-অগতের আত্মজটিল সঙ্গে নিষ্পেক্ষে অভিভূত হয়েছিলাম। তখন থেকে আত্মও পর্যন্ত আমার সেন্সিটিবলনারি। সেই অনুভূতির স্থানিধিট কিছা চলেছে এই পরিমিত্তির উপর, তার দ্বারা একটা সনুচিত অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ওতে কেবল যে সাধারণ নৈতিক বিচারগুলি ছুটে গেল তাই নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে ভারতে বা কিছু করা দরকার বলা হয়ে থাকে তারও প্রয়োজনীয়তা হইল না। সেদিক থেকে ওটা খুবই শিক্ষাপ্রদ। প্রথমতঃ বেশ এই তথাকথিত সন্যাসধর্মী শুদ্ধতা সম্পর্কে, যার অর্থ হলো সর্ববিধ প্রাণধর্মী ক্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করা, অর্থাৎ যেখানে প্রাণের ক্রিয়াগুলিকেও ভগবানের দিকে কিরিয়ে এবং তার মধ্যেও তাঁর উপস্থিতি রয়েছে জেনে ওর মধ্যেও তাঁকে মস্তভাবে কাজ করতে দিতে হবে, সেখানে তার পরিবর্তে ভূমি বেন তাঁকে বসতে চাইছ, "না এদিক দিয়ে তোমার কিছু করতে হবে না"। বেন প্রাণের কোনো ব্যাপারের মধ্যে তাঁর একেবারে প্রবেশ নিষেধ।

আর সেই সম্বন্ধেও সেই পুরানো কথা, যা সকলেই জানে। প্রাণের সাথে সাথে সেহকেও সন্যাসী সাধকেরা বরাবর প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। কেবল বেগুনিকে ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুসারে পবিত্র বলে নতুন করা হতো, বেনন বিবাহাদি অনুষ্ঠান, সেগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হতো। কিন্তু মুক্তজীবন। তা যে ধর্মীয় জীবনের পক্ষে অসম্ভব!

সুতরাং ঐগুলিকে সম্পূর্ণ বাতিল করা হতো।

কিন্তু তাই বলে বাস্তবিক বেগুন প্রয়োজন তাঁও নিত্যন্ত সহজ কথা নয়। বরং ঐক্লপ প্রত্যাখ্যানের চেয়ে তা আরো বেশী কঠিন।

প্রথমতঃ মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে যে অবস্থা আনা বিশেষ প্রয়োজন, যার কথা বনেহিলাব সেই হরিণের গল্প প্রসঙ্গে, তা হলো পূর্ণ সবজ। এটি অবশ্যই চাই। আমি সেই ১৯৫৬ থেকে বরাবর লক্ষ্য করে আসছি যে পূর্ণ সবজ যেখানে নেই সেখানে অতিনানসের স্পন্দন প্রবেশ করে না। সবজ যদি কিছুমাত্র বিচলিত হয়, সানান্যতম অহং এবং তার দিকে চান যদি কিছুমাত্রও থেকে যায়, তবে অতিনানসের কোনো স্পন্দন তার মধ্যে আসতেই পারে না। এই হলো যন্ত্র এক বাণী।

এ ছাড়া তার উপলব্ধি আসার পক্ষে আরো দুটি শর্ত পূরণ করা চাই, তাও খুব সহজ

কথা নয়। বৃদ্ধির তত্ত্বের দিক থেকে তা অপেক্ষাকৃত সহজ বটে (যদিও সকলের পক্ষে নয়, কেবল যারা যোগ করছে এবং একটা সাধনার পথ ধরেছে তাদের নিয়েই বলছি) ; আর মনস্তত্ত্বের দ্বারাও যদি ওর সঙ্গে সমস্ত যুক্ত থাকে, তাহলেও সে কাজ কঠিন হয় না। কিন্তু যেমনি কল্পন স্বার্থী মূলতত্ত্বের দ্বারা এসে পড়বে, যমনি সে কাজ অত্যন্তই কঠিন হবে। যে দুটি শব্দের কথা বলছি তা হলো এই : প্রথমত এমন এক বিচার ও ব্যাপকতার পদ্ধতি অর্জন করা যার কোনো সীমা থাকবে না, যাতে তুমি শেষ পর্যন্ত অভিমানেসের সামগ্রিক চেতনার ব্যাপকতার ও বিস্তারে পৌঁছো তার সঙ্গে মিলে যেতে পারো। সে চেতনা হলো তপস্বানেরই সামগ্রিক পর্যাচেষ্টা। তাকে "সামগ্রিক" বলছি অর্থাৎ যাতে তিনি সর্বজোড়াবে অভিযুক্ত হচ্ছেন। অবশ্য আরো উপরকার স্তরের দিক থেকে দেখলে সকল জোড়াই তপস্বানের সঙ্গে একাত্মতা আশা চাই, শুধু তাঁর অভিযুক্তির দিকটা নিয়েই নয়, কিন্তু তাকে ছাড়িয়েও যেখানে তিনি হয়েছেন অটল অনড় নির্ভাবের মধ্যে অসম্পূর্ণতার অবস্থাতে, সেখানেও পর্যন্ত। আর তা ছাড়া সকল প্রকার সম্ভূতির মধ্যেও তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। তাহলে এর মধ্যে দুটি জিনিস এসে পড়ছে : এক হলো সীমাহীন বিচার, যে কথা আগেই বলান, অথচ সেই সঙ্গে চাই পূর্ণ নমনীয়তা, যাতে সকল সম্ভূতির ভিতর দিয়েই তুমি তাঁকে অনুসরণ করতে পারো। অবশ্য এক বিজ্ঞাপিত কালেই তুমি বিশেষর মতো বিতৃত হবে না, কিন্তু ব্যাপক হওয়া চাই নিরন্তর সম্ভূতির পথে। এই হলো দুটি শব্দ, আর দুইই যেন থাকে তোমার সাধার মধ্যে সম্ভাবনীর হয়ে।

যতক্ষণ পর্যন্ত দৈনিক রূপান্তরের কোনো প্রশ্ন নেই, ততক্ষণ পর্যন্ত মনস্তাত্ত্বিক ও বিবর্তন-গত দিক দিয়ে কাজ হতে থাকবেই যথেষ্ট, এবং তা অপেক্ষাকৃত সহজও হবে। কিন্তু যখন দেহের প্রশ্ন এসে পড়বে, যার মধ্যে জড়ের সম্পর্ক রয়েছে এবং যার গোড়াতোই বিকৃতি—যার ভুল হয় নিশ্চেষ্টতা ও অজ্ঞানতা থেকে—সেখানে তখন কাজটি হবে খুবই কঠিন। কারণ এই জড়কে তার আপন স্বাতন্ত্র্য সমেত আদি জড়চেতনাত্তে কিংবা যাবার উদ্দেশ্যে এমন এক বাধাবন্ধা আকৃতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা বরাবর তার সেই স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখেই চলেবে। সেই কারণে সেখানে ওর পক্ষে অভিমানেসকে গ্রহণ করার মতো বিস্তার ও নমনীয়তা আশা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। আনাকে সর্বদাই এ সবসার সম্ভূতীয় হতে হয়, আর এ খুবই নিম্নেই ব্রহ্মের বাস্তব সমস্যা, কারণ এখানে মূল বেকোমাকে নিয়ে কথা এবং কোমগুলি সেই কোমই থাকবে, কোনো অস্বাভাবিকভাবে তাকে উঠিয়ে নেওয়া যাবে না। অথচ তারই মধ্যে আশা চাই নমনীয়তা ও বহনশক্তি, যাতে তা অনন্তরূপে বিচার পেতে পারে।

(নীরব থেকে)

পূর্বোক্ত জাহাজের অনুভূতি আমার এসেছিল সুক্লমে। তার ভিতর থেকে যে কড়কগুলি দাবী লোককে নাবিরে দেওয়া হয়েছিল, তাদের সকলেরই মধ্যে ঐ দুইপ্রকার জিনিস অনুপ্রাণন নমনীয়তার অভাব ছিল। বিশেষত বিন্দুগতাত্ত্বিক অনুসরণ করার চেয়ে

নিজেকে প্রসারণের ক্রিয়ায় অভাব ; যাদের জাহাজ থেকে নাবানো হলো তাদের পরবর্তী কাজই রইল সেই কবরতাকে আয়ত্ত করা । কিন্তু জাহাজে থাকার মধ্যেও প্রসঙ্গটি হিসাবে তাদের কাজ ছিল এই প্রসারণশক্তিকে বাড়ানো ।

সেই অগ্নুদ্ভতির সঙ্গে একটা কথা তখন বলা হয়নি । জাহাজটির মধ্যে কোনো-রকম কলকল্লা ছিল না । তার ডিভারকার সবচেয়ে কাজই হচ্ছিল কেবল ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণে—যাজিরদের সম্পর্কে ও সব কিছুতেই সম্পর্কে (এমন কি সকলের দেহের পোষাকগুলিও ইচ্ছার তৈরি) । তাতেই সবেরই মধ্যে ছিল প্রচুর নবনীকতা ; কারণ সে ইচ্ছা জে নবনের ইচ্ছা নয়, সে হলো আত্মিক ইচ্ছা । কিন্তু এখানেও জোনারদের মধ্যে তেমন ইচ্ছা হতে পারে ; যখন জোনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাতে কোনো কথা বলা বা কাজ করা—বা নবনের ভরক থেকে আসে) নিয়ন্ত্রিত নয় (আনি চিন্তা ও বুদ্ধিকে বাধাই দিচ্ছি) । সাধারণত আনন্ড যখন কিছু করতে যাই তার আগে একটা ইচ্ছা আগে (এবং তা আনন্ড লক্ষ্যও ক'রে থাকি যে অনুকৃষ্ট কাজটা করতে আনন্ড এই ইচ্ছা লাগছে—তা খাটতির মধ্যে হলেও), আর তখন মেথডে পাই যে মন আগে তার নিজের কাজটি করলে, তার পরে সে জিনিস শুরু করা হলো । কিন্তু অভিমানসের কাজ হবে মনকে ডিঙিয়ে ; নবনের ডিভার দিয়ে তার আশার দরকার নেই, সে সরাসরি চলে আসতে পারে । সরাসরি মন প্রাণকেন্দ্রগুলির মধ্যে কিছু একটা চুকে এসে তাদেরকে দিয়ে কাজ করায়—চিন্তার মাধ্যমে না এসে, অথচ পূর্ণ চেতনাকে । সে চেতনার কাজ সাধারণ নিয়মে হয় না, আত্মিক ইচ্ছা ভেগে উঠে প্রত্যক্ষভাবে স্বস্তির উপর কাজ করে ।

মনকে যদি তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চল ক'রে রাখতে পারো, তাহলে আসবে সেই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ আত্মিক প্রেরণা । এমন কি বাইরে কথা বলতেও যদি তাকে ধরে নিয়ে রেখে দিতে পারো, তাহলে তার মধ্যে কোনো নিশ্চয় হবে না, সে ঝাঁটাই থাকবে ।

এটা খুবই সুকৃৎক্রিয়া, কারণ বোধ হয় এই যে তা অভ্যস্ত ক্রিয়া নয়,—ঈশ্বর একটু ইচ্ছাকৃত ভাবে এলে বা নবনের মধ্যে সামান্যতম স্পন্দন উঠলেই ওর সব কিছু বিগুড়ে যায় । কিন্তু যতক্ষণ তা থাকে ততক্ষণ ঝাঁটাই থাকে । আর অভিমানস-জীবন এলে তাই হবে নিত্য-কার অবস্থা । সে অবস্থায় আত্মিক ইচ্ছা মনোগত হয়ে কোনো গওগোল করবে না ; অপরপক্ষে জোনার আত্মিক ইচ্ছা হয়তো বেশ ভালোরকমই থাকতে পারে, তুমি তাকে নিত্য প্রকাশ করতেও পারো (যাত্রা বোধ করে যে তারা ভগবানের নির্দেশে চালিত হচ্ছে তাদের মধ্যে তাই হয়), কিন্তু তথাপি তা যতক্ষণ নবনের ডিভার দিয়ে ভরক হয় কাজ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা অভিমানস জীবনের কাজ হলো না । কারণ অভিমানস নবনের মাধ্যমে কাজই করবে না । মন থাকবে অনড় প্রেরণার বাজ হরে, নতুবা সেখানে একটু কিছু খুঁই করলেই সবচেয়ে বিগুড়ে যাবে ।

(নীরব থেকে)

কথা হলো এই যে পাখির চেতনার মধ্যে অতিনিমানের বিকাশ ঘটায় জন্য চাই পূর্ণ সমজা, যা আসতে পারে ভগবানের সঙ্গে আধ্যাত্মিক একাত্মবোধের দ্বারা ; তেমন সমজার মধ্যে সব কিছুই হবে ভগবান । আর সে সমজা আপনা হতেই আসে, কোনো চেতন ইচ্ছা বা বুদ্ধির প্রচেষ্টার দ্বারা নয় বা আগের থেকে বুঝে-বুঝে নয়, কারণ এ তেমন ধরনের জিনিস নয় । আপনা হতে আসবে স্বতঃস্ফূর্তের মতো, তখন আর সেক্ষেপভাবে কোনো কাঙ্ক্ষ হবে না—যেমন সাধারণত হয়ে থাকে বাইরের থেকে কিছু নিমিত্ত ঘটলে তার জ্বাবে । সেটা হলো প্রতিবর্তী ক্রিয়া, কিন্তু তার দ্বারা এ-অবস্থায় হবে একটা ভিতরকার নিত্যবোধের ক্রিয়া, যদিও তা একই রকমের নয়, কারণ যেখানে যেমন পরকার তেমনি হবে তার বিশিষ্ট ক্রিয়া, কিন্তু তার মধ্যে ঐ প্রতিবেশের মতো কিছু নেই । দুইএর মধ্যে একটা তফাৎ আছে—বাইরের থেকে কিছু এসে তোমাকে নাড়া দিল এবং তার জ্বাবে তুমি কিছু করলে, এ হলো আলাদা কথা,—আর তোর নিজেরই মধ্যে একটা চেতনাপ্রবাহ চলেছে যার থেকে সমুচিত স্পন্দনগুলি উঠছে, সে হলো আলাদা কথা । কথাটা তোনামের ঠিক বোঝাতে পারলাম কি না জানিনা ।...একটা স্পন্দনধারা আসছে একই আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকেন্দ্রে থেকে, এ একরকম জিনিস, আর বাইরের উদ্বেজনাত্তে কোনো ক্রিয়া জেগে উঠল, এ অন্যরকম জিনিস (যা সাধারণ মানুষের মধ্যে হয়) । অপরপক্ষে চেতনা স্বরূপ ভগবানের সঙ্গে একাধ হয়ে যায় তখন সকল ক্রিয়াই আসে ভিতরদিক থেকে, অর্থাৎ বাইরের কোনো কিছুই নাড়াত্তে নয় ; সেখানে নিত্যই একটা প্রোত বইছে এবং তার থেকে একই রকম স্পন্দন উঠছে, কিংবা গুরই মধ্যে তার স্পন্দনবল হচ্চে ।

এ জিনিস আমার কাছে খুবই পরিচিত, কারণ আমার মধ্যে এখন ঐক্যপ অবস্থা সর্বত্রই বিস্তার করছে,—বাইরের থেকে কিছুই দ্বারা সেখানে কোনো সংঘর্ষ বাধবে এমন বোধ আমার আসেই না, আমি জানি যে আমার সকল ক্রিয়াই ঘটছে ভিতরে, তা বহুপ্রকার এবং বিপরীত-ধর্মীও হয়, আর প্রয়োজন অনুযায়ী সেই নিত্যপ্রবাহের মধ্যে আভ্যন্তরীণ নানা পরিবর্তনও ঘটতে থাকে ।

অতএব ঐক্যপই হবে অপরিহার্য ভিত্তি ।

বিভারগুলো আসবে আপনা হতেই, তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সৈনিক পরিবর্তনও হতে থাকবে, কিন্তু সে এক সমস্যা যার বীনাংসা করা কঠিন । আমি এখন সেই সমস্যার মধ্যেই সম্পূর্ণ নিবদ্ধ হয়ে আছি ।

অতঃপর সর্বপ্রকার সমুদ্রিক অনুসরণ করার মতো নবনীলতার কথা । এই নবনীলতা দ্বারা নতুন পুনর্গঠন দেবার যোগ্যতা । সারা জীবনটাই তো হলো আপন ব্যক্তিকে গড়ে তোলার কাঙ্ক্ষ, তার মধ্যে সচেতন ও অসচেতন সেই কাঙ্ক্ষই করে বেতে হবে, আবার শেফ-কালে তাকে হবে ভেঙে ফেলতে । চেতন ব্যক্তিসত্তা হওয়া বাবেই নিত্য একটা স্নানিধিষ্ট গঠন নিতে থাকা, সকল বিষয়েই ; পরে কিন্তু আবার তার বিপরীত ক্রিয়া করতে হবে, তখন

তাও হবে নিত্যকার ত্রিা এবং তাতে আরো বেশী ইচ্ছাশক্তি নাগবে। অথচ ব্যক্তির গড়ে ওঠাতে চেতনার মধ্যে যা ফল হয়েছিল তা যেন বোঝা না যায়।

এ যে পূব করিন কাছ তা বলতেই হয়।

চিত্তার দিক থেকে দেখলে বনে হবে এ তো নিত্যের প্রাথমিক কাছ, খুবই সহজ। এমন কি অনুভবের দিক থেকেও করিন নয়; কারণ অনুভূতিপ্রবণ জীবনের পক্ষে ভগবানের মাঝে বিতারনাভ করা অপেক্ষাকৃত সহজই। কিন্তু দেখের বেলা। তা নিত্যই করিন। কোনো কিছুই কল্পকতি হতে না দিয়ে, সেহম তখন বা জন্মটপ্রবণ কেন্দ্রকে পারিপার্শ্বিক সেহ-বস্তুর মধ্যে তলিয়ে যেতে না দিয়ে, এ কাছ সাধা হওয়া খুবই করিন। বনে করা যদি তুনি থাকতে অরণ্য পর্বত ও নদনদীপোড়িত প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে তাহলে তা কত আনন্দের হতো। কিন্তু রয়েছে তুনি সেহমূর্গে বশী হয়ে, তার থেকে এক পাও বেয়োতে পারো না, বেয়োতে গেলেই নানা বাধার সম্মুখীন হতে হবে। কচিং কখনো হয়তো হৃৎ-সদতির দেখাও মিনতে পারে, যখন উপরের আলোর উজ্জ্বল স্পন্দন দেখা যাবে, কিন্তু সেটা হওয়া খুবই বিরল। হাঁ, তবে ফুলের দেখা পাও বটে, কিন্তু তাও পূব কচিং, সর্বদার জন্য নয়। এই বাস্তবের ভগতে চারিদিকেই বাধা—কেবল যত খাড়া আর ঠোড়ার আর নির্বাতন সহ্য করা, সবই কইকর, সবই এমন করিন যে কিছুতেই গোনে না। মানবজীবন কোনোনতে উন্মুক্ত হতে চায়না! কেবল থাকে গুটিয়ে থাকিয়ে শক্ত হয়ে, কিছু যানো নেই, উদ্বাপ নেই, আনন্দের কথা ছেড়েই দিলান।

কিন্তু মাঝে মাঝে যখন নছন পড়ে যায় যে নদী বইছে, সূর্যরশ্মি বসিত হচ্ছে পাছের মাধার, তখন সঙ্গীত বাজে—তখন কোষগুলিও গেয়ে উঠে তোমাকে খুশি করে দেয়।

*

প্রশ্ন : কিন্তু সৈনিক রূপান্তর আনা যদি এতই করিন, তবে অন্য ওয়া উপায়ে ওয়া-শক্তির সাহায্য নিয়ে নবদেহ গড়িত করাই কি সুবিধার কাছ হলে না ?

উত্তর : তার নানে প্রথমত এমন কেউ থাকা চাই যিনি এই বাস্তব ভগতে থেকেই এমন সিদ্ধিলাভ করেছেন যাতে অতিমানস-সত্তাকে বাস্তব গঠন দিতে তাঁর ক্ষমতা হয়েছে।

আমি তাই বনেছিলান যে কোনো প্রাথমিক সত্তাকে নিয়ে যদিও আমি তাকে সেহকাত করতে পারি, কিন্তু অনেক চেষ্টা করলেও তাকে স্থায়ী বাস্তবের আকৃতি দেওয়া অসম্ভব হবে; তার মধ্যে একটা কিছু বাকী থেকে যাবেই। যদি তাকে দৃশ্যমানও করা যায় তবু তা স্থায়ী হবে না—তখনই অবাস্তবে মিলিয়ে যাবে। তেমন স্থায়ী এমনও পর্যন্ত কেউ আনতে পারেনি।

এ সম্বন্ধে গ্রীষ্মবিশ্বের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, আর তিনিও আমার কথাই সর্বাঙ্গ করেছিলেন, অর্থাৎ এই পৃথিবীতে বাস্তব আকার দিতে যে পদ্ধতির দরকার তা কারো

থাকে না। এমন কি কেউ বাত্বের মধ্যে আনতে শকন বলেও তা স্বামী হই না, তুল
বাত্বের মতো তা হতে পারে না। যা স্বামী করা হলো তার মধ্যে বাত্বের স্বাধিকত্ব
আরোপ করা যায় না।

ঐচ্ছিক মন্দির দ্বারা স্বামী করবার উপায় আমি জানি, কিন্তু তা বাত্ব অর্জন দিবে না।
চেষ্টা করলে তাকে দেখবার মতোও করা যাবে, কিন্তু তা হবে অস্থায়ী, ক্রমশঃ বাড়তে থাকার
মতো গুণ তার মধ্যে থাকবে না। *

* S. A. I. C. E. Bulletin, Feb. '62 থেকে। অর্থসংক— পণ্ডিত জীবন

যোগের প্রথম পাঠ

ত্রীশরবিন্দ

কাম-আহার-নিজা

প্রশ্ন : যোগের পথে যৌন-কামনাই সবচেয়ে বড় বাধা, একথা কি সত্যি ?

উত্তর : অন্ততপক্ষে যুগন্তন বাধার একটি ।

প্রশ্ন : অধিক আহারে কি যৌন-কামনা বৃদ্ধি পায় এবং অল্পাচারে তার হ্রাস হয় ?

উত্তর : কয়েক রকম খাদ্য আছে যা' বেলে তা' বৃদ্ধিই পায়, যেমন মাংস, পেরাড, নাক প্রভৃতি ।

প্রশ্ন : লোভ, ক্রোধ, মেঘ প্রভৃতি কি যৌন-কামনারই সঙ্গী ?

উত্তর : মোটের ওপর যৌন-কামনারই সঙ্গে ওসব থাকে, তবে সর্বদা নয় ।

প্রশ্ন : না বনেছেন "যা যৌন-লিপ্সা এবং ও-রকম প্রবৃত্তির শক্তি জোগায় তা' হল ও-সবের দিকে মানুষের নিছেরই অভ্যুগ্ৰহ নজর ।"—ও-জাতীয় আবেগের প্রতি বেশি নজর দেওয়া বলতে কি বোঝায় ?

উত্তর : সর্বদা তাদের কথা চিন্তা করা, এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া—এরই নাম তাদের ওপর খুব বেশি নজর দেওয়া ।

প্রশ্ন : বেশি নজর না-দেবার জন্যে কি কর্তব্য ?

উত্তর : ও-সব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে হ'বে, কামের কথা কম ভেবে ভগবানের কথাই বেশি ভাবতে হ'বে ।

প্রশ্ন : কাম-চিন্তার মুসঙ্গে একথাও না বনেছেন যে "দমন দ্বারা তাদের শাসন করতে যাওয়া, নিছের মধ্যে হ'রে রেখে তাদের ওপর চেপে ধরা" ঠিক নয় । মানুষ কি ক'রে ও-সব চিন্তাকে তিত্তরে হ'রে চেপে রাখতে পারে ?

উত্তর : কথাগুলিই তাদের নিজেদের ব্যাখ্যা দিচ্ছে। তুমি সর্পণাই যদি যৌন-চিন্তায় নগ্ন থাক এবং কোনও কর্ণের মাধ্যমেই তাদের প্রকাশ না হ'লে লাও, তাই হ'ল নিজের মধ্যে তাদের ধ'রে রাখা এবং বেশ ক'মে ধরা। ক্রোধ বা অপরাধের রিপূর ক্ষেত্রেও একথা খাটে। তোমার উচিত তাদের পরিহার করা, নিজের মধ্যে ধ'রে রাখা নয়।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, কোনও অবৈধ কাজের রাশ টেনে রাখা হ'ল তা' দমন ক'রে রাখা, কিন্তু অস্ত্র থেকে বিদূষিত করতে হ'লে তা' বর্জন করতে হ'বে। তবে কান, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতির ক্রিয়াকে সংবৃত্ত করার আবশ্যিক কি ?

উত্তর : তুমি যদি তাদের বর্জনে বিফল হও, তবে তাদের শাসনেই রাখতে হ'বে। সে-সংঘবন অন্ততপক্ষে প্রাণিক রিপূর দাস্য থেকে তোমার রক্ষা করবে। একবার সংঘবন নাট করলে তুমি সহজে তাদের পরিহারে সন্মত হ'বে। সংঘবনহীনতার সাহায্যে পরিহার সার্থক হয় না।

প্রশ্ন : যৌন-শক্তিকে ওজসে পরিণত করার উপায় কি ?

উত্তর : একটা পদ্ধতি যদি নিতে হয় তবে তা' তপস্যার (চিন্তনায়, বাচনে ও কর্ণে আত্মসংযম) দ্বারা, এবং নবীনঘণার সাহায্যে রোতঃশক্তিকে উন্মীলনের সাহায্যে। কিন্তু যোগের অন্যান্য বিঘ্নে যেমন, এখানেও ভেদনি পরাশক্তির অবতরণ এবং কামকেন্দ্রের ওপর তার প্রয়োগ ও ফলত রূপান্তর দ্বারা তা' আরো সুদৃঢ়ভাবে সম্পন্ন করা।

প্রশ্ন : আমাদের সাধনায় উপবাস কি সাহায্য করে ?

উত্তর : উপবাসে এ-সাধনার কোনও সাহায্য হয় না।

প্রশ্ন : অতি অল্পাহার কি ইন্দ্রিয়াদির সংঘবন সাহায্য করে ?

উত্তর : না, তা' শুধু তাদের বেশরোয়া ক'রে তোলে,—সবচেয়ে ভাল হ'ল পরিমিত আহার। যারা উপবাস করে, সহজেই তারা অতিভূত হ'য়ে পড়ে এবং সবজ্ঞ হারিয়ে ফেলে।

প্র : যদি কেউ কেবল নিরামিষ আহার করে, তা' কি ইন্দ্রিয়-সংঘবন সাহায্য করে ?

উ : আনিমডোজীসের কে-সত্যটে পড়তে হয়, অবশ্যই তার কয়েকটি থেকে রেহাই দেয়, কিন্তু কেবল তা-ই যথেষ্ট নয়।

প্র : যে-সামক উর্ধ্বতন চেতনা লাভ করেছে তার কি নিজস্ব আধার্যক হয় ?

উ : যতদিন না জ্ঞানার শরীর তার ব্যবহারী ক্রিয়ার পরিপূর্ণ রূপান্তরিত হচ্ছে, ততদিন নিজস্ব প্রয়োজন আছে।

প্র : সাত্ত্বিকেরা নন ও প্রাণ অত সক্রিয় হ'য়ে ওঠে কেন ? কি ক'রে সাত্ত্বিকেরা তাদের এই ক্রিয়া সংযত রাখা যায় ?

উ : ওদের ওই কাজ। যতদিন পর্যন্ত জ্ঞানার নিজস্ব তুনি সচেতন না হচ্ছে, ততদিন তারা সক্রিয় থাকবেই।

প্র : আবার বুনের শুরুতে এবং মাঝামাঝি সময়ে খুব বেশি মানসিক ও প্রাণিক ক্রিয়া চলতে থাকে, কিন্তু শেষরাতে তা' প্রশান্ত হ'য়ে আসে ও আনি অনেক অর্থপূর্ণ স্বপ্ন দেখি, উচ্চতর জ্ঞানের ইঙ্গিতও পাই। এর কারণ কি ?

উ : বুনের মধ্যে মানুষ প্রায়ই চেতনা থেকে চেতনার গভীরতর স্তরে এক দীর্ঘ ব্যাধিক্রম হ'য়ে ক্রমেই প্রবেশ করে শেষে পৌঁছয় চৈতন্য স্তরে, উচ্চ থেকে উচ্চতর চেতনার স্তর পার হ'য়ে শেষে বিশ্রাম লাভ করে এক নীরবতা ও শান্তির কোলে। এই বিশ্রামে যে-করটি মুহূর্ত থাকে যায়, তা-ই আসল সাত্ত্বিকতা নিজে। এ না পেলে যে বিশ্রাম হয়, তা আংশিক। যখন তুনি এই গুটি শান্তিস্থানের নিকটবর্তী হ'ও, তখনই তুনি উচ্চতর স্বপ্ন দেখতে শুরু কর।

প্র : বুনের মধ্যে কি ক'রে চৈতন্য স্তরে বা উর্ধ্বতন চেতনায় উন্নীত হওয়া এবং সেখানে বিশ্রাম লাভ করা যায় ?

উ : সাধারণত তা' অজ্ঞাতসারেই হয়। তবে কেউ যদি সজ্ঞানে তা' করতে এবং স্বমনে রাখতে চায়, তবে সর্বপ্রথম তাকে বুনের মধ্যে সচেতন হ'তে হবে।

প্র : স্থল, অবচেতন নিজস্বকে কি করে সচেতন করা যায় ?

উ : চেতনাকে আরো বেশি আহ্বান ক'রে।

প্র : আমি বেবেছি, রাতে পাঁচ-ছ' ঘটনা বুনের চেয়ে দিনে অল্পতর আধার্যকও বুনে আমি অনেক বেশি সজীব বোধ করি। এর কারণ কি ?

উ : কারণ নিশ্চয়ই এই যে দিনের বুন অন্য ধরনের, অর্পেকাকৃত কম ভারি, এবং অবচেতনে তা' অল্পসময় অভিযুক্ত।

প্র : অনেক বলে যে সারারাত তারা স্বপ্নপূর্ণভাবে ঘুমতে পারে। তা' কি সত্য ?

উ : তারা এই বলতে চায় যে যখন তারা জেগে ওঠে, তখন আর স্বপ্নের কথা তাদের মনে থাকে না। ঘুমের মধ্যে চেতনা অন্যান্য তরয়ে চ'লে যায় এবং সেখানে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে, এবং হুল মনে সেগুলো অল্পবিশেষ নির্ভুল বা অস্পষ্টভাবে স্মৃতিতে হয়, তখনই তাদের বলা হয় স্বপ্ন। সর্বদাই ঘুমের মধ্যে একাতীত স্বপ্ন দেখা যায়, কিন্তু সময় সময় তাদের তা' স্মরণে থাকে, অনেক সময় আবার একেবারেই তা' ভুলে যাও। আবার কতক সময় অনেকে নেমে যায় অবচেতনের পাতালে এবং সেখানে স্বপ্ন দেখে, কিন্তু তা' এখনই অতনের যে যখন তারা উঠে আসে, তখন স্বপ্ন যে দেখেছে তার সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানই থাকে না।

প্র : স্বপ্নের মধ্যে কি কোনও ইঙ্গিত থাকে ? অবচেতনের স্বপ্ন কি তাত্পর্যপূর্ণ ?

উ : যখন তা অবচেতনা থেকে আসে না তখন স্বপ্নগুলি হয় ইঙ্গিতপূর্ণ, আর নয়তো কোনও অতিপ্রাকৃত তরয়ের অভিজ্ঞতা অথবা সেক্ষেত্রে মানসিক, প্রাণিক বা অন্য-কোনও শক্তির সেওয়া রূপাংলী, এবং কদাচিত্ অতীতে বা বর্তমানে ঘটনা বা ভবিষ্যতে ঘটবার নির্দেশক হিসাবে আসে। অবচেতন তরয়ের স্বপ্ন অর্থহীন। অবচেতনায় অতীতের স্মরণ-প্রভাব বা স্মৃতি থেকে যায়, এসব তারই এক বিচ্ছিন্ন।

প্র : আমি এক স্বপ্নে দেখেছিলাম যে অতি কষ্টে কয়েকজন লোক একটা পাহাড়ের উপরে। আমিও তাদের সঙ্গে উঠছি। ঋনিক ঘানে আমি হাঁপিয়ে পড়লাম এবং আর না-উঠে কী কর্তব্য ভাবতে লাগলাম। তারপর আবার অনুভূতি হ'ল—যেন এক শক্তি আমার সতর্কণে তুলে ধরলো, আর পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে দিল। চূড়ায় পৌঁছে আমি লান্না রং আর আলোয় ভরা অনেকগুলো বাড়ি দেখতে পেলাম। তারপরেই আবার ঘুম জেগে গেল। এ-স্বপ্নের অর্থ কি ?

উ : এ হ'ল সেই পদ্ধতি-মুটিরই প্রতীক—একটি, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, আর অন্যটি, সাধককে বহন ক'রে নিয়ে চলে যে বাড়িশক্তি, তারই ক্রিয়া।

প্র : ঘুমের মধ্যে আমি প্রায়ই প্রাণিক তরয়ের ঘুমন্ত দেখি। তা' কি করে পরিহার করা যায় ?

উ : যেমন ধর ঘুমনার আগে, অগ্নিত অবস্থায় এসব জিনিসকে স্বপ্নের মাঝে আসতে না-দেবার ইচ্ছা প্রয়োগ ক'রে, তা' করতে পার। সঙ্গে সঙ্গেই সকল হবে না, কিন্তু শেষ

পৰ্বত তা' হ'বেই। অথবা ভোনাৰ আশ্বাস্য করতে হ'বে বুনের বধো আরো সচেতন হবার জন্যে।

প্র আমি বুনের বধো ঘনন আক্রান্ত ছই, যারের নাম জপ ক'বে নিকৃতি পাই। এর অর্থ কি যারের নামেরও শক্তি আছে ?

উ : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ও-নামে সৰ্বদাই এক শক্তি রয়েছে। *

* Elements of Yoga থেকে অন্তৰ্ভুক্ত।

পত্রাবলী শ্রীঅরবিন্দ

পত্র কান্দা কিম্বা পত্র পঙ্ক্তির কথাই নয়। একটি কবিতাকে ধূ'রকবে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যায়—এক হল মূলের প্রকৃতি ও ভঙ্গিটি চব্বছ বেনে চলে, আর অন্যটি হল মূতন ভাষার সঙ্গে ঝাপ ঝাওয়াবার জন্যে মূলের ভাব অর্থ চিত্ররূপ নিয়ে ভাষান্তর করা। 'অ'-র কবিতাটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, সরল ও স্পষ্ট, এবং শব্দে আকারে ছন্দে গাঢ়বদ্ধ হয়ে বাঙালার আপুৰ্ণ—বাংলার হরত টিক ওরকন করা চলেবে না। এখানে দয়াকার আকারের বিস্তার—তুমি ত্র-ই করেছ। তোমার অনুবাদ খুবই সুন্দর; তবে মূলের পাশাপাশি রাখলে একটি দেখার ছোট্ট মুকুতার কোবল সৃষ্টি, অন্যটি সযুচ্ছ পরিব্যাপ্ত রূপ।

Where is it calling

The eyes of night

এর সঙ্গে তোমার বিকল্প পঙ্ক্তিগুলি যদি নিলিয়ে সেখ তবে পার্থক্যটা বুঝতে পারবে। আনি অবশ্য বলছি না তোমার অনুবাদে কিছু বদলানোর প্রয়োজন আছে।

(২)

মনোনীত মূলের প্রতিটি কথা ধরে চলতে অনুবাদক বাধ্য নন; ইচ্ছা করলে এর থেকে নিজের কবিতা তিনি রচনা করতে পারেন, এবং প্রায়শ তাই করা হয়। আর এর সার্থকতা এই জন্যে যে সেখা যায় আক্ষরিক অনুবাদ মুক্তিসম্মত স্বাধীন অনুবাদের চেয়ে বেশি শক্ততা করে—আবস্তকে বৃতে এবং কাব্যশক্তিকে দারিদ্ৰ্যে ও নীরসতায় পর্যবসিত করে। অনুবাদের সবচেয়ে এক ভাষার ভাষ, প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্ট বেগ এবং তার ছন্দের শোলা আর এক ভাষায় টিক ধরে দিতে পারেন এমন কৃতীর সংখ্যা খুব বেশি নয়, বিশেষত আলোচ্য ভাষা দুটি, যখন ইংরাজী ও বাংলার মতো এত বিপরীতবাহী। তা করতে পারলেই হল নির্দোষ অনুবাদ।

(৩)

অনুবাদে মূলানুগত হবার মূলমূল্যটি মনে দর এই যে এক্ষেত্রে যথাপন্থর মূলের সঙ্গে নৈকট্য রাখতে হবে আবার ভাঙতে যেন পাঠ্য দেখে মনে না আগে যে অনুবাদ পড়ছি, মনে

হয় যেন মূল বাংলায়ই লেখা কোনো কবিতা পড়ছি—আবার, যতদূর সম্ভব, মনে যেন হয় মূল বাংলায় লেখা একখানি বৌলিক কবিতাই পড়ছি।

স্বীকার করছি যা বললাম তা আমি নিষেধ কর্তৃত্ব করিনি,—যখনই আমি অনুবাদ করেছি তখন মূল পাঠ নিয়ে কারো চিত্তকোত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিনি, মূলকে নির্ভরতায়ে বাসুনয়ে আমার যা-খুনি তাতে রূপান্তরিত করেছি। তবে সে দারুণ দুরূহ দুরূহ অন্যের অনুকরণীয় নয়। পরবর্তীকালে আচারে একটু নীতিপরায়ণ হতে চেষ্টা করেছি—জানি না তাতে কতখানি সাফল্য এসেছে। যাছোক, এ হল সেই রকম ব্যাপার, “হা বলি তা করো, যা করি তা করতে বেও না।”

(৪)

আমি মনে করি না শুধু ভাবের বিভিন্নতাই যুরোপীয় ও ভারতীয় ভাষার পার্থক্য সূচনা করে—যা করে তা ভাষার চংটি। ইংরেজী ভাষার চাল ও চং বাংলার চালান দিলেও মূল্যের অনুকূলপ গাড়া না-ও লাগাতে পারে, কারণ এই ভক্তি নৃতন ভাষার বাপছাড়া পরদেশীয় নতুন লাগবে। তবে বাঙালীর মন ও কানের কাছে গ্রাহ্য ঠিক চালটি এনে ধরতে পারলে ভাবটিকে আরো সহজে মূল্যের নতই স্বাভাবিক নরম্পণী করে তোলা যায়। ভাবটি বাঙালীর মনের কাছে অতুত ঠেকলেও বাংলা ভাষার নিজস্ব চালে তাকে ধাতুর ও প্রহণীয় করা সম্ভব। ভোবার অনুবাদের মূলটির বক্তব্য বোটাটাই এই : “এই এখানে অব্যবহিত মূল্যের বহুভাষা, ভাষাকুল, অরণ্য, বিহঙ্গমেনা—তত আয়ুর্কাল এখনো আমার হয় নি যাতে আমি এদের সবাইকে জ্ঞানতে পারি কিংবা এরা আমাকে জ্ঞানতে পারে এবং ফলত উভয়ের মধ্যে জ্ঞানের সন্ধ্যা। অথচ এই অসময়ে নৃতর আমাকে আশ্রয় করল।” অনুভবটি একাত্তই মানুসী, একজন যুরোপীয়ের কাছে যতখানি ততখানি কিংবা ভিন্ন চেয়ে বেশিই একজন ভারতীয়ের কাছে মূলত এবং অন্যায়সেই গৃহীত হতে পারে। ইংরেজীতে যে চালের চং সে ওয়া হয়েছে তা আকস্মিক এবং তেজী, অথচ বেশ সন্দর্ এবং নরম্পণী—বাংলায় হয়ত ও-ধরন বিসম্বাদ লাগবে এবং ব্যর্থ হবে। তাই যদি হয়, তাহলে বাংলায় ভোনাকে এমন চলনটি আবিষ্কার করতে হবে যা সন্ধ্যা সন্তেজ এবং গুণগামী। শুধু এখানেই নয়, এ-রীতি সর্বত্রই প্রযোজ্য। অবশ্য মূল থেকে অতিরিক্ত তথ্য হতে গেলে এবং তার ভাবার্থের বিপরীত কিছু বললে চলবে না, এটুকু বন্ধনের মধ্যে আবশ্যকনতো স্বাধীনতার অবকাশ রয়েছেই।*

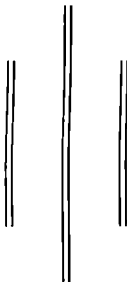
—

১৩

* Letters of Sri Aurobindo (3rd Series) থেকে অনুলিখিত।

Examine thyself without pity, then thou wilt be
more charitable and pitiful to others.

— *Sri Aurobindo*



BENGAL IMMUNITY

COMPANY LIMITED

CALCUTTA-13

ARTHUR BUTLER & CO. (Mozufferpore) LTD.

**Structural, Mechanical Engineers and
Railway Wagon & Coach Builders**

Manufacturers of:

Sugar Mill Machinery and Agricultural Equipments

Works:

**MUZAFFARPUR
BDMR, N. E. RLY.**

HEAD. OFFICE:

**18, NETAJI SUBHAS ROAD
(2nd Floor), CALCUTTA-1**

Managing Agents:

North Bihar Trading Company (Private) Ltd.

Telegrams:

**"ARTBUTLER" CALCUTTA
"ARTLER" MUZAFFARPUR**

PHONE:

**HEAD. OFFICE: 22-5198
22-3333
WORKS: MUZAFFARPUR 43 & 112**

It's *Spencer's*



at home or in a party this invigorating
and refreshing drink is sheer delight.

SPENCER AERATED WATER FACTORY PRIVATE LTD.
CALCUTTA-14



For your Electrical Services

CONSULT

FARADAY ELECTRICALS

79, DHARAMTALA STREET

Show Room: 9, Lower Circular Road

CALCUTTA-16.

PHONE-24-2012.

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର

ବର୍ତ୍ତିକା

(୨୦୦ ଛାପାଟ, ୨୨୧୨)



ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠମନ୍ଦିର

୧୫ ବାବୁ ଚାଟାଜି ସ୍ଟ୍ରିଟ

କଲିକତା—୧୨

১। চিহ্নাবলি ও হুঁকাবলি	শ্রীমদ্রবিন্দ	১
২। উবাচঃ	অঃবাঃক—ঈশানীকান্ত গুপ্ত	৮
৩। পোশোভঃ অংশে	নিমিকান্ত	১৫
৪। বৃষ্টির পাতা	ঈশানীকান্ত গুপ্ত	১৭
৫। বোগসমঝা-প্রদ	অনিবার	৩১
৬। মহামানবের সাগরতীরে	সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫
৭। মাঘের সবে কথা	শ্রীমা	৫১
৮। প্রমোদ	শ্রীমা	৭০
৯। বোগের প্রথম পাত	শ্রীমদ্রবিন্দ	৮১

বক্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১২ই আগষ্ট এবং ২৩শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫২ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় অফিসে কিংবা কলিকাতা-মাথার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

মাথা :
শ্রীমদ্রবিন্দ পাঠ্যবিদ
১০, বক্তিক চাটাজি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীমদ্রবিন্দ আগ্রম
পত্রিকারী

মূল্য—১৪০ টাকা

প্রকাশক—শ্রীমদ্রবিন্দ পাঠ্যবিদ, ১০, বক্তিক চাটাজি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মুদ্রক—শ্রীমদ্রবিন্দ আগ্রম প্রেস, পত্রিকারী



১৫ই আগষ্ট, ১৯৬২

একদিন আমি দেখে আমার বিপুল মধুর জগৎ খুলে ফেলেছে
সেপত্রাঙ্গের জুঁন চন্দ্রাবেশ সব,

সবিনে গিরেছে ভীতির ঘন ডঙ্কন আর পাপের পরিচ্ছন্ন ।

শাশ্বৎ চরেছি আনন্দা, চলেছি মাগের কাছে, তাঁর মুখখানি
দেখল বদে,

আনন্দের মগল শিঙ-মড়া তাঁর কোলে ফেলে দেব ।

তুখনি যে-আনন্দের অনুসন্ধান চুটেছি আনন্দা, তাকে আনিচল
করে শব্দ ।

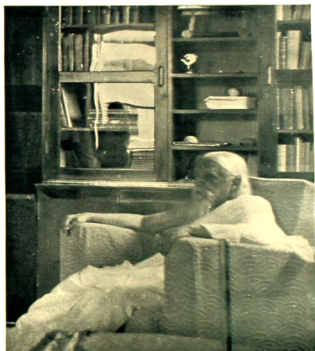
তখন চিরকালের অস্থিষ্ট দেহতাকে পেয়ে শিহরিত হয়ে উঠব ।

তখন নিজের আনন্দের স্বপ্নের অপ্ৰত্যাশিত ফল-ফাঁদল ।

“সাবিত্রী”—শ্রীঅন্নবিন্দ



चित्र



श्री अग्रविन्द



চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

পূর্বসমুদ্র

ঐশ্বর্যবিশ্ব

ভক্তি

আমি ভক্ত নই, কারণ ভগবানের জন্য আমি ত সমস্ত ত্যাগ করিনি। সে বস্তু আমি ত্যাগ করি কি বস্তু, যা তিনি নিজে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন ছোর করে, আর আমাকে জীবিয়ে দিয়েছেন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে? এ সব জিনিষ আমার পক্ষে অতি দুরূহ।

*

আমি ভক্ত নই, আমি ভ্রান্তী নই, আমি ভগবানের কর্মীও নই। কি আমি ভবে? আমার প্রভুর হাতে যন্ত্র আমি, সেব-স্বাধীনবালকের নুখে বাঁশী, ভগবানের ফুৎকারে চালিত পাতা একখানি।

*

ভক্তি পূর্ণ পূর্ণতা লাভ করে না যতক্ষণ তুমি জানে ও কর্মে পরিণত না হয়। তুমি যদি ভগবানের অনুসরণে চলতে থাক এবং তাঁকে ঘরে ফেলতে পার, তবে তাঁকে ফিরে যেতে দিও না, যতক্ষণ না তুমি পেয়েছ তাঁর সত্যকার সত্য। যদি তুমি তাঁর সত্য সত্যকে অধিকার করে থাক, তবে তাও তাঁর পূর্ণ সত্য—পূর্ণতা লেবে তোমাকে দিব্যাকর্ষ, বিশেষ নুস্ত পয়ন আনন্দ।

*

আমি সকলে গর্ব করে তারা ভগবানকে ভালবাসে—আমার গর্ব, আমি ভগবানকে ভালবাসি নি, তিনিই আমাকে ভালবেসেছেন, আমাকে ঘরে কেনেছেন, ছোর করে তাঁর আপন করে নিয়েছেন।

*

আমি যখন জানতাম ভগবান হলেন নারী, তখনই ভাল করে কিছু বুঝতে পারলাম, বেশ দূর থেকে তুমি, প্রেম কি বস্তু। তবে যখন নিজে আমি হ'লাম নারী, সেবা করলাম আমার প্রভুকে দরিত্রকে, তখনই জানলাম প্রেমের পূর্ণতা।

*

*

ভগবানের সঙ্গে কুনিন্দিত হ'ল সেই চরম অভিজ্ঞতা, যার জন্যই এ জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল।

★

ভগবানকে সত্যসত্যই ভয় করা অর্থ তাঁর কাছ থেকে দূরে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া, তবে ঠোমার জন্যে তাঁকে ভয় করা হ'ল আনন্দকে তীক্ষ্ণতম করার অনুপাত।

★

ইচ্ছাশীল আবিষ্কার করেছে ভগবৎ-জীত মনুষ্য, ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছে ভগবৎ-জ্ঞানী ভগবৎ-প্রেমী।

★

ভগবানের দাস ছন্দেছিল ভুক্তিগ্রহ-দেশে, আরবদেশে সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের আনন্দ তার দাসপ্রেমিককে নিয়ে।

★

পূর্ণপ্রেম ভয়কে নির্বাসিত করে। তবুও ঐ নির্বাসিতের কিছু একটা কোনন ছাড়া বা স্মৃতি রেখে দিও, পূর্ণতা সে আবার পূর্ণ করবে।

★

অন্তর্যাত্রা ভগবানের পরিপূর্ণ আনন্দ আবাদন করবে না, যদি কখনও তাঁর পথ হওয়ায় আনন্দ সে না পেয়ে থাকে, তাঁর পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচারা হয়ে, তাঁর সঙ্গে জীবন-নরপ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে।

★

ভগবান যাতে তোমাকে জানবাসেন তা যদি না করতে পার, তবে যাতে তিনি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করেন তাই কর। প্রেমিকের আলিঙ্গন যদি তিনি তোমাকে না দেন, তবে ভোর করে তাঁর কাছ থেকে আশ্রয় কর কৃষ্ণগীরের আলিঙ্গন।

★

আমার অন্তর্যাত্রা ভগবানের বন্দী, যুদ্ধে তিনি আমাকে জিনে নিয়েছেন—এখনও সে মনে করে যুদ্ধের কথা—যদিও বহুদূরে চলে এসেছে তা থেকে—আনন্দ আর তীতি আর বিদ্রোহের সঙ্গে।

★

সকল জিনিষের মধ্যে পৃথিবীতে আবার-বিষেব সবচেয়ে বেশি ছিল বেদনার উপর—ভ্রমপূর্ণ ভগবান যখন আমাকে দিনের আশ্রয় আর পীড়ন, তখনই আমি আবিষ্কার করলাম যে বেদনা হ'ল অস্তিত্বিত আনন্দের একটা বিকৃত ও অব্যবহার্য আকার।

★

ভগবান আনন্দের যে বেদনা সেন তার অদ্ভুত চারটি ক্রম—যখন তা শুধুই বেদনা, তারপর

যখন তা গিয়ে আসে তখন, তারপর যখন বেদনাই হয় তখন, আর শেষে যখন তা হ'ল স্মৃতি
আনন্দেরই একটা রূপরূপ ।

★

উৎকৃষ্ট আনন্দের লোকে—বেদনা বেধানে মুগ্ধ—যখন উঠে যাওয়া হয়, তখনো বেদনা
বর্তে পাকে একটা অসহ্য উল্লাসের জলবেশ হয়ে ।

★

যখন আমি তাঁর আনন্দের তুচ্ছতম নিখরে নিখরে উঠে চলেছি, তখনো আমি নিজস্বা
কল্পি নিজে, আনন্দের ক্রমবিক্রির গীতা যাচ্ছে কি না, তখন আমি প্রায় ভীত হয়ে পড়লাম
ভগবানের আলিঙ্গন-আলম্বায় ।

★

ভগবানকে ভালবাসার অবাধহিত নীচেই যে আনন্দ তা হল মানুষের মধ্যে ভগবানকে
ভালবাসা—এখানে লাভ হয় বছরের আনন্দ ।

★

শরীরের পক্ষে একবিবাদ হয় ও উৎকৃষ্ট বিনিয় ; কিন্তু অস্ত্রাশ্রা সকল মানুষের
মধ্যে ভগবানকে ভালবাসে, সে এই এখানে জীবনধারণ করে বহনহারা, উল্লাস-বিভোর
ঐশ্বর্যচাচারী মত্ত । তবুও লবনদাই—রহস্য হ'ল এই—তার ভালবাসা একজনকেই সাথে ।

★

সমস্ত ভুবনই আনন্দ অস্ত্র-পূর—সেখানে প্রত্যেক সপ্রাণ জীব, প্রত্যেক নিশ্বাস
মত্ত। আনন্দ পরমানন্দের বাহন ।

★ ১

কখনও কখনও আমি বুঝতে পারি না কৃষ্ণকে আমি বেশি ভালবাসি না কালীকে ।
কালীকে যখন ভালবাসতাম, তখন ত' ভালবেসেছি নিজেকেই ; কিন্তু যখন কৃষ্ণকে ভালবাস-
লাম, তখন ভালবাসলাম আর একজনকে, তবুও তখন নিজেকেই নিজে ভালবেসেছি ।
তাই কালীর চেয়ে কৃষ্ণকেই—বেশি ভালবেসে ফেলেছি ।

★

প্রকৃত্তিকে একটা শক্তি, একটা অগ্ৰত সত্তা, দেবী বলে স্বীকৃতি করা বা পূজা করার
লাভ কি ? সৌন্দর্যের দিক দিয়ে বা চাক্ষুশ্য দ্বিগুণে তার গুণকীর্তন করার লাভ ? রহস্য
দান অস্ত্রাশ্রা দিয়ে তাকে উপভোগ করা, শরীর দিয়ে যেন রবীকে উপভোগ করা যায় ।

★

জন্মে যখন দুটি বুনেছে তখন সব বস্তু,—প্রকৃতি, চিন্তা, কর্ম, ভাব, কর্তব্য, কৃতি,
পদার্থ—সব হয়ে ওঠে সেই পরম-প্রেমিক, পরম-আনন্দের উৎস ।

★

৩

যে সব দর্শনিকেরা ভগবৎকে মায়া বলে ভ্যাগ করেন তাঁরা নিশ্চয় জানী, তপস্বী, সাধু, কিন্তু মায়া মায়ে আবার আনন্দ নহে না হয়েও পারে না যে তাঁরা একটু নিঃস্বার্থ বেন, ভগবানের হাতে তাঁরা অতিরিক্ত মহত্বই নিজেদের প্রভাবিত হতে দিয়েছেন।

★

আমি মনে করি আমার অধিকার আছে ভগবানের উপর এই দাবী করার যে তিনি যেমন নিজেদের ভগবতের বাহিরে দিয়ে দিতে পারেন, তেমনি ভগবতের ভিতরেও নিজেদের দিয়ে দিতে পারেন। যদি সে দাবির তিনি এড়াতে চান, তবে আশে ভগৎ স্বষ্টী করলেন কেন?

★

মায়াবাদী আমার সাকার ভগবানকে স্বপ্ন মাত্র দিয়ে থাকেন, তিনি বরং স্বপ্ন দেখতে চান নিরাকার সত্যকে—যেহেতু ত' এটিকেও কল্পনা বলে ন্যায্য করে, পছন্দ করে বরং নিঃস্বার্থের স্বপ্ন, পুণ্যের আনন্দ। এ রকমে সব স্বপ্নদর্শীরাই পরস্পরের ধর্মকে নিন্দা করতে এবং নিজেদের নিজেদের স্বপ্নকেই সর্বসমস্য-সীমাসংক বলে ঘোষণা করতে বাধ্য। কিন্তু মনের কাছে তাই হ'ল চরম সত্য, অস্বপ্নায়া যাতে পেরেছে পরম আনন্দ।

★

সাকার ভগবানের উদ্ভূত মায়াবাদী মধ্যে অনির্দেশ্যতা সং—তাকে অনুসরণ করে আমি গিয়েছি দেখানো, স্পেণ্ডি কৃত্তকে সেই উদ্ভূত তাঁর অনির্দেশ্যতা আকারে।

★

যখন আমি প্রথম কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই, তখন তাঁকে ভাববেলেছি বহু হিসাবে, যেমন সাধী হিসাবে—কিন্তু তিনি শেষে আমার প্রভাবণা করলেন। তখন আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম, তাঁকে ক্রমা করতে পারলাম না। পরে আমি তাঁকে ভাববাসনাম প্রেমিক হিসাবে, সেবারও তিনি আমার প্রভাবণা করলেন—আমিও পুনরায় হয়ে উঠলাম ক্রুদ্ধ—কিন্তু এবার তাঁকে বার্ষন্য করতে হ'ল আমার।

★

নিজে শোধ করে, তিনি মনবহুটি করেই তাঁর ক্রমা আদায় করলেন আমার কাছ থেকে, ক্ষতিপূরণ করে নয়, নতুন নতুন ঘোষ করে।

★

যতদিন ভগবান আমার বিরুদ্ধে তাঁর ঘোষ সবার জন্য ক্ষতিপূরণ করতে চেয়েছেন, ততদিন দুজনে নিয়মনত কলহ করে চলেছি—কিন্তু যখন তিনি তাঁর ভুল আবিষ্কার করলেন, তখন কলহ থেবে গেল, কারণ আমাকে তাঁর একান্ত বশবদ হতে হ'ল।

★

ভগবান আমার। তাঁরা সকলে বলে আমি পাগল, কারণ জোয়ার বধো আমি কোন

জটিল দেখি না—কিন্তু সত্যই তু আমি পাগল, তোমার প্রেমে—আমি আমার স্বপ্ন অবস্থা দিয়ে পেতে চাই না।

*

“ভুল, মিথ্যা, পদস্ফন্দন”—যেখণে করছে জ্ঞান। ভগবান! কি উদ্ভ্রমল, কি ভুলের তোমার ভুল সব। তোমার মিথ্যা হ'ল জীবন্ত সত্য—আর তোমার পদস্ফন্দনেই জগৎ পরবোধকর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে।

*

“জীবন, জীবন, জীবন”, ওনি চিন্তাকর করে প্রাণাবেশ—অন্তরায়ের উত্তর “ভগবান, ভগবান, ভগবান”। জীবনকে কেবল ভগবানরূপে যদি তুমি না দেখ, না ভালবাস, তবে জীবনও তোমার কাছ থেকে তার আনন্দ বদ্ধ করে রেখে দেবে।

*

“পুরুষ বেয়েকে ভালবাসছে,” ইন্ডিরেয়া বলে—কিন্তু অন্তরায় বলে, “ভগবান, ভগবান, ভগবান”। স্বপ্নের সর্বব্যাপক সূত্র হ'ল এই কথা।

*

তুমি যদি হেরতন জিনিকে, ধূমাত্তর পাশীকে না ভালবাসতে পার, তাহলে কি করে তুমি বিশ্রাম করতে পার যে ভগবানকে তুমি তোমার আন্তরচেতনার গ্রহণ করেছ?

*

জগৎকে বাদ দিয়ে ভগবানকে ভালবাসা দন ভগবানকে তীব্র বটে কিন্তু অসম্পূর্ণ পূজা অর্পণ করা।

*

ভালবাসা কি ইর্ষার কন্যা না সদ্দিনী? কৃষ্ণ যদি চন্দ্রাবলীকে ভালবাসে, তবে আমিও কেন তাকে ভালবাসব না?

*

তুমি শুধু ভগবানকেই ভালবাস, তাই তোমার দাবি হওয়া স্বাভাবিক যে ভগবানও তোমাকেই ভালবাসবেন, আর সকলকে প্রায় বাদ দিয়ে। কিন্তু এটা ভুল দাবি—যাযাত্যের বিরোধী, জিনিষের প্রকৃতির বিরোধী। কিন্তু ভগবান একই, তুমি হলে বহুর অন্তর্গত। বরং এক হও হৃদয়ে অন্তরে—সকল জীবের সঙ্গে, তাহলে ভালবাসবার জন্যে তুমি একা ছাড়া আর কেউ তার থাকবে না।

*

অগতে কৃষ্ণকে ও আরাকে ছাড়া আরো অনেককে যখন দেখেছি তখন আমার সঙ্গে ভগবানের মীনা গোপন রেখেছি—কিন্তু যখন দেখতে শুরু করলান সর্বত্রই রয়েছি শুধু শ্রীকৃষ্ণ আর আমি তখন থেকে আমি নির্ভুল আর বাচাল হয়ে উঠেছি।

*

৫

আবার পরিভের যা কিছু তা আহারও—হুতরাং তাঁর মেওরা অলংকার আনি
দেখিয়ে বেড়াই বলে আনাকে তিরস্কার কর কেন ?

*

আবার প্রিয় তাঁর মাথা থেকে বুকট, গলা থেকে রাজ্যের হার খুলে নিয়ে আবার পরিভে
দিলেন—সাব্ সন্তদের সুনিমিত্ত আবার নিশা করলে, বললে, “লোকটা সিদ্ধাই-এর পিছনে
ছুটেছে।”

*

জগতে আবার প্রিয়ের আদেশ, আবার অধিকারীর ইচ্ছা আনি পালন করেছি—কিন্তু
জন্ম তেঁজিয়ে উঠলে, “কে এই বুঝকের নষ্ট করছে, সপাচার ধ্বংস করছে ?”

*

হে সাধুজন। জোনাদের প্রশংসা যদি আমি গণ্য করতাম, হে সন্তবর্গ ! আবার নানবন
যদি পোষণ করতাম, তবে আবার প্রিয় আমাকে কখন তাঁর বুক থেকে গ্রহণ করতেন না, তাঁর
গোপন-কবের স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য আবার বিতেন না।

*

আবার প্রিয়ের রত্নগানশে আমি এত রত্ন হয়ে গিয়েছি যে জাগতিক বগন আমি ছুঁড়ে
ফেলে নিলাম আবার যা থেকে, বেরিয়ে পড়লাম জগতে রাজপথে। সাংসারিকেরা উপহাস
করে, ধর্মস্বতীরা বৃথা ফিরিয়ে নেয়—কি এসে যায় তাতে আবার ?

*

তোমাকে যে ভালবাসে, ভগবান, তাঁর কাছে ভগবতের উপহাস যেন স্বাভাবিক নহে, আর
জনতার লোষ্ট্রবর্ষণ তার উপরে যেন নিদাঘের বৃষ্টি। কারণ তুমিই কি উপহাস করছ না, লোষ্ট্র-
বর্ষণ করছ না, সে লোষ্ট্রের মধ্যে থেকে তুমিই কি আবার আঘাত করছ না, বিকৃত করছ না :

*

ভগবানের মধ্যে বুটি তিনিই আছে যাকে মানুষ নাম দেয় অশুভ—যা তারা কিছুই
বোঝে না আর যা তারা ভুল বোঝে এবং জেনেওনে ভুল ব্যবহার করে। যে তিনিময়ের
পিছনে তারা বৃথা ছুটে বেড়ায় আর বোঝে অশ্লষ্টভাবে, তাকেই তারা নাম দেয় শুভ এবং
সৎ—কিন্তু আবার কাছে তাঁর মধ্যে যা-কিছু সবই প্রের।

*

নির্বোধ বাবা আবার প্রিয়কে ভালবাসে না, আবার কলহ তাদের সঙ্গে, আবার রত্ন
তাঁর ভালবাসার অংশী বাবা তাদের সঙ্গে নয়।

*

ভগবান যাদের ভালবাসেন, তাঁরা জোনার আনন্দের পাত্র—কিন্তু যাদের তিনি
ভালবাসেন না বলে জান করেন, তাঁরা হয় যেন জোনার কাঁচপোর পাত্র।

*

৬

নাস্তিককে তুমি বুঝা ক'ব কি, যেহেতু সে ভগবানকে জানবাসে না ? তখনে তুমিও কি হবে বুঝা যেহেতু তুমি ভগবানকে জানবাসেতে পার না ?

*

বিশেষভাবে একটি বিষয়ে ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মানুগমন অপপত্তির কাছে আত্মদান করেছে। সে হল তাদের অভিলাষ-বর্ষণে। মহাবাহী পুরোচিত যখন মারণ-উচ্চাটন ময় পাঠ করে তখন আমি দেখছি যেন সে অপপত্তির পূজা করছে।

*

মহাবাহী যখন অভিলাষ দেয়, সন্দেহ নাই, তখন সে নিশ্চয়ই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে—কিন্তু সে হল কোথের তনিস্রার ভগবান—যার কাছে সে তার পঞ্চর সঙ্গে নিজেকেও উৎসর্গ করে দেয়—কারণ ভগবানের দিকে যে ভাব নিয়ে যে আসে, ভগবানও তাকে সেই ভাব নিয়ে গ্রহণ করেন।

*

অপপত্তি আমাকে অনেক বিরক্ত করেছে কিন্তু শেষে আবিষ্কার করলাম সে হল ভগবান নিজেই, আমাকে প্রলোভন দেখাচ্ছেন।—তখন তার হেতু আমার যে বর্ণনাতনা তা চিরকালের জন্য অপসৃত হয়ে গেল।

*

অপপত্তির উপর ছিল আমার শত্রুত্ব বিষয়ে—তার প্রলোভন আর নির্বাসন আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল—জানি না তার বিদ্যায় কঠে কি না(বুঝ) ছিল যে বারবার যখন সে কিরে আগত আর আমার কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করত, সেন তাকে প্রত্যাখ্যান করতে আমার দুঃখই হত। আবিষ্কার করলাম যে এ ত কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর ছন্দাকনা নিয়ে ঘিরে এসেছেন, আমার বিষয়ে পর্যাবসিত হ'ল হালো।

*

তখনে অপর আছে, কারণ, লোকে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে, অপপত্তি ভগবানের বিরুদ্ধে কয়ী হয়েছে—যদি কিন্তু আমার দ্বিয়ের সম্বন্ধে উচ্চতর ধারণা রাখি। আমি বিশ্বাস করি, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটে না—স্বর্গে হোক, নরকে হোক, স্থলে হোক, জলে হোক ।*

* Thoughts and Aphorisms-কে। অনুবাদ—ইসলামাবাদ ৩৫

উষা-স্তোত্র

[অঙ্ক ১—১১০]

এই যে এসেছে সকল জ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতি,
বহুধা প্রজ্ঞান জন্মেছে সর্বব্যাপী হয়ে ।
উষার জন্ম সবিতার জন্মদানের জন্য,
তেননি উষার জন্য রাত্রি তার জঠর উন্মুক্ত করেছে । ১

আরজিন সন্তানকে নিরে আরজিন হয়ে এসেছে ওজা নাতা
কৃষ্ণা নাতা তার কৃষ্ণ কক্ষ সব উন্মুক্ত করেছে ।
উভয়ের এক বহু, উভয়ে অবর, পরস্পরকে অনুসরণ করে চলে তারা,
স্বর্গকে পৃথিবীকে, এদের আবরণকে পরিণাম করে চলে তারা । ২

ভগ্নীমূগলের একই অঙ্গীন পক্ষা, চলে যায় থাকে ধরে
একের পরে অন্যো দেবাবিষ্ট হয়ে—
মিশে যায় না, বেবেও পড়ে না, স্থপদক তারা,
রাত্রি ও উষা, স্থপ বিভিনু, মন এক । ৩

কীপ্তিনরী, শিশারিনী, সত্যের ক্রিয়া সব জাগিয়ে তোলে,
আবাসের জন্য বিচিত্র দুয়ার বত খুলে ধরেছে,
জগৎকে সমুখে এগিয়ে নিরে চলেছে, আনন্দ-সম্পদ আনন্দের খুলে ধরেছে,
উষা বিশ্ব-ভুবন ব্যক্ত করে ধরেছে । ৪

পারিত ছিল যে কুটিল হয়ে, তাকে তুলে চানিরে নিঃশেষ, যে বিভনরী,
ভূমি দাও ভুক্তি, প্রগতি, ভূমি ।
আর যারা বেবে ক্ষুত্রকে তাদের হয়ে ভূমি বেবেছে বৃহৎকে—
উষা বিশ্ব-ভুবন ব্যক্ত করে ধরেছে । ৫

কাতরপঙ্ক্তি তোমারই, তোমারই বিধাশ্রুতি, মহৎ প্রগতিও তোমারই,
 আনাদের যাত্রার জন্যে সন্ধ্যা হলে তুমি।
 বিবিধ-বিভিন্ন জীব সব তার দৃষ্টিপথে এসে দিয়েছে,
 উষা বিশ্ব-ভুবন ব্যস্ত করে রয়েছে। ৬

এই যে স্বর্ণের দুহিতা আনাদের সম্মুখে দেখা দিয়েছে
 জন্মবসনা ভরসী আগে উঠেছে।
 বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী, পাবিষ সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী,
 যে উষা, ভোগ্যময়ী, উদয় হও এখানে। ৭

চলে যায় যাত্রা তাদের প্রথম,
 অনন্ত ধারায় আসে যাত্রা তাদের অনুসরণ করে চলে,
 উষা উদিত হয়ে, জীবকে উদ্বেগ নিয়ে চলে,
 ভাগ্যের মৃত একজনকে। ৮

হে উষা! তুমি অগ্নিকে যে এনেছ প্রজলিত করে,
 সূর্যের দৃষ্টি দিয়ে সব যে প্রকাশ করেছ,
 মানুষকে যে তুমি জাগিয়ে তুলেছ ব্যস্ত করবার জন্য—
 এই হ'ল সেবতাদের উদ্দেশ্যে কৃত তোমার শ্রেয়স্কর কর্ম। ৯

কতকাল তিনি আনাদের সান্নিধ্যে আসছেন—
 কতবার তিনি উদয় হয়েছেন আর এখনো উদয় হয়ে চলেছেন।
 পূর্বগামীদের আকাঙ্ক্ষা করে তিনি চলেছেন তাদের অনুসরণে,
 সম্মুখে দীপ্তি ছড়িয়ে তিনি আবার অন্য সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ১০

পূর্বভার উষাকে উদয় হতে বাধা দেবেছিল সেনার বর্জ্য-জীব চলে গিয়েছে;
 বর্জ্যনানে আনাদেরই সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে অন্য উষা,
 আবার অপরাপর উষা বাঘের দৃষ্টিগোচর হবে,
 তারা আসছে আনাদের পরে। ১১

যেটোষের পদন করেন যিনি, সত্যকে পালন করেন, সত্য হতে অন্য ভীষ,
 স্বধর্মী তিনি, সত্যের শ্রেয়সাঙ্কে তিনি অনুপ্রাণিত করেন;

বদনবতী, তুনি দেবায়তন ধারণ করে, তোমার শ্রেষ্ঠত্বরূপ ধরে,
এখানে এসে উপর দণ্ড, উষা। ১২

দেবী উষা : পূর্বে তুনি চিরকাল উপর হয়েছ,
আজ তাই এই সমস্তকে ব্যক্ত করে ধর, ঐশ্বর্যবতী !
আবার আগামী সব দিবসেও পূর্ণানুকূলে তিনি উপর হয়ে চলেন—
অজর অনর তিনি, তিনি চলেন তাঁর স্বর্গের ব্যাঘ্র। ১৩

দ্বানোকের সব প্রকারে তিনি তাঁর প্রভা ছড়িয়ে উপর হলেন,
খুলে ফেলে গিলেন দেবী তাঁর স্বনক্স পরিধান ;
সকলকে প্রবুদ্ধ করে, উষা এলেন তাঁর রথে,
তার অগ্রে অরুণাশু সূর্যবদ্ধ করে। ১৪

তিনি বহন করে এনেছেন বরবীর বস্ত্র বস্ত্র আনাদের পুষ্টি সাধন করে,
সজাগ করে ধরেন তিনি, বিবিধ-বিচিত্র জ্ঞান তিনি সৃষ্টি করেন।
অনন্ত রূপে যাগা চলে গিয়েছে তাদের প্রতিমা, আর যাগা উপর হতে চলছে
তাদের প্রথমে এই যে উষা তেজঃসম্বদ্ধ হয়ে উঠেছেন। ১৫

উঠে চল, জীব ! বীৰ্য আনাদের এসেছে,
তবঙ্গা মূলে চল গিয়েছে, এই যে জ্যোতি এগেছে।
সূর্যের জন্যে চলবার পথ খুলে গিয়েছে,
আবঙ্গা এসেছি জীবনধারা বেখানে নিরন্তর এগিয়ে যার। ১৬

জ্যোতির্গর্ভ জ্যোতি সূর্যনোবর বাক্ষ বহন করে চলেছে,
দীপ্তিবতী উষার উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করে চলেছে।
যে ঐশ্বর্যবতী, বন্ধপাঠকের কাছে উপর দণ্ড,
তার অস্তরে প্রজ্জ্বলিত কর সূক্ষ্মা জীবনধারা। ১৭

এই বস্ত উষা জ্যোতির্গর্ভ, সর্ববীৰ্যবর, অঙ্গা উপর হয়েছ বর্ষা প্রসাদার জন্যে।
তারে বেন বাবুদেব স্বয়ং—সত্য-প্রেরণা স্বধন উৎসাহিত হয়ে,
উদ্ধৃ উঠে চলেছে, তবন সেই প্রাণশক্তিমান্রীষের উপভোগ করতে পারে
পরিপূর্ণ সৌভাগ্য সেবক করেছ যে। ১৮

দেবকুলের নাড়া তুনি, অদিতির অকৌহিনী তুনি, তুনি যজ্ঞীয় প্রভা,
বৃহৎ হয়ে উদ্ভাসিত হও তুনি।

আনন্ড প্রসঙ্গবাক্ উচ্চারণ করি, আনন্দের জন্য উদর হও।

হে বিশ্ববরগাত্রী! আনন্দের জন্ম হও জন্মের মধ্যে। ১৯

যজ্ঞকর্তার জন্য, যজ্ঞবক্তার জন্য,

উষা-স্রাজি বয়ে নিরে আসে যে কর্ণ তাই শ্রেষ্ঠকর।

তাকে যেন আনন্দের জন্যে রক্ষা করে চলে

নিজ বরুণ, অদিতি, সিদ্ধ, পৃথিবী আর সৌ। ২০

অনুবাদক—শ্রীমলিনীকান্ত ভট্ট

উক্ং জ্যেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতির্গাং

জিহ্বাঃ প্রাক্তো অত্ৰনিষ্ট বিভূ।

যথা প্রসূতা সবিভূঃ সবার

এবা রাজ্যুযসে যোনিমারৈক্ ॥ ১

কৃষ্ণং কংসা ক্লমতী বৈত্যাগাং

আরৈক্ উ কৃষ্ণা সগনানি অন্তাঃ।

সমানবচ্ছ অয়ুতে অমৃতা

জ্ঞানাবর্ণং চরত আমিনানে ॥ ২

সমঃনো অথবা স্বপ্রোবনস্ত

স্বমস্তান্তা চরতো দেবশিষ্টে।

ন যোথেষ্টে ন তদ্বচ্ছুঃ সুযেক

নকোষালা সমনসা বিজ্ঞপে ॥ ৩

ভাষতী নেতী নৃত্ততানামচেতি

জিহ্বা বি জ্বরো ন আধঃ।

প্রোপাঃ জগচ্ছু নো বারো অধাং

উবা অজীপর্ষনানি বিধা ॥ ৪

জিন্মন্তে চরিতবে নমোদী
 আভোগয় ঈষ্টয়ে রাগ উ বম্ ।
 দম্ঃ পশ্চাত্তা উষি যা বিচক্ষ
 উষা অজীগভূবনানি বিষা ॥ ৫

কত্রায় বঃ জবসে বঃ মহীয়া
 ঈষ্টয়ে বমর্থমিব বমিতো ।
 বিসদৃশা জীবিতান্তিপ্রেচক
 উষা অজীগভূবনানি বিষা ॥ ৬

এষা দিবো হুহিতা প্রোভাদনি
 বৃচ্ছন্তী বুভতিঃ শুক্রবাগাঃ ।
 বিশ্বক্লেশানা পাথবস্ত বয
 উষো অস্তেহ স্তভগে বৃচ্ছ ॥ ৭

পরায়তীনামহেতি পাথ
 আয়তীনাঃ প্রথম। নশতীনাম্ ।
 বৃচ্ছন্তী জীববদীরয়ন্তী
 উষা যুক্ত ককন বোধয়ন্তী ॥ ৮

উষো যদগ্নিঃ সন্ধিথে চকর্থ
 বি যদাবশ্চকনা সূর্যাস্ত ।
 যন্তাপ্তবান্ যক্ষমাণান্ অজীগ
 ত্তদেবেষু জুবে শুভ্রময়ঃ ॥ ৯

কিরাভাঃ যৎ সমগ্ৰা ভবান্তি ৫
 যা বৃহুর্বাচ্চ নুনঃ বৃচ্ছান্ ।
 অম্র পূর্বাঃ কৃপতে বাবশানা
 প্রদীপানান্নোক্ষস্রাভিরেতি ॥ ১০

ঈমৃষ্টে যে পূর্বতরামপশ্চম
 বৃচ্ছন্তীস্থিতঃ সত্যাসঃ ।

অশ্রাদ্ধিকৃৎ প্রতিজ্ঞাকৃতং
 ও তে যন্তি যে অপরাধী পশ্যন্ত ॥ ১১

যাবয়নং যথা স্বতঃপা
 স্মৃৎসংগীভিত্তী দেববীতিম
 ইহাভোযঃ জ্ঞেয়তমঃ ব্যাচ ॥ ১২

শব্দং পুরোহিত্যাম্
 অথো অশ্রদ্ধদম্ বাবো মনোনি ।
 অথো ব্যাচাহারান্ অশ্রু স্মৃৎ
 অজরামৃত্যু চরতি অশ্রদ্ধিঃ ॥ ১৩

বাজ্জিভিদিব অশ্রদ্ধাভোঃ
 অপ কৃত্যাম্ নিগিৎ দেবাবঃ ।
 প্রবোধয়ন্ত্যরুণেতি রথৈ
 রোহা যতি স্মৃজা বধেন ॥ ১৪

অবশ্যো পোহ্যঃ বর্ধানি
 চিত্রং তেতুং কণুতে চেকিতানি ।
 ঈশ্বরীণামপমা শব্দতীনাম্
 বিভাজীনাং প্রথমায়া বর্ধনং ॥ ১৫

ঈদীর্ঘং জীবো হুর্ন আগাৎ
 অপ আগাৎতম অ জোতিরেতি ।
 অরৈক্ পশ্যৎ যাতবে সূর্য্যায়
 গম্য যত প্রতিরত্ন আয়ুঃ ॥ ১৬

স্বামনা বঃ উদ্বিগতি বহুঃ
 স্তবানো বেষ্ট উষসো বিভাজীঃ ।
 অজ্ঞা তত্চক্ গুণতে মনো
 জ্ঞানো আয়ু নি দিবীহি প্রজাবৎ ॥ ১৭

যা গোমতীকবসঃ পর্বতীরা।
 বুদ্ধান্তি দাক্ষবে মর্ত্যার।
 বায়োন্নিব নৃনৃতানামুৎকর্কে
 তা অশ্বনা অন্তকং সোমশুষ্ক। ১৮

মাতা দেবানামসিতেরনীকম্
 যজ্ঞস্ত কেতু বৃহতী বি ভাহি।
 প্রশস্তিকৃৎ অক্ষপে নো বুদ্ধা
 নো জনে জনয় বিশ্ববারে। ১৯

যজ্ঞিমমম উবসো বহুতী
 জ্ঞানায় শশমানায় জহম্।
 তন্নো মিত্রো বরুণো দামহস্তাম্
 অনিতিঃ সিদ্ধুঃ পৃথিবী উত জ্যোঃ। ২০



পোনেরোই আগষ্ট

[ঐক্যবন্ধ জন্মোৎসবে সঙ্গীতার্থ]

নিমিকান্ত

তোমার জন্মউৎসবে আজ সকাল থেকে পড়ে বনে,
তখন তোমার হ'য়েছিল এইদিনে কোন্ শুভক্ষণে ।
এই নিবনে কোন অতীতে
ধরা দিলে ধরনীতে ।
সেদিন তুমি গোপন ছিলে মর্ত্যকালের আশ্রয়ে ।
পড়ে বনে,
তোমার জন্ম হ'য়েছিল এইদিনে কোন্ শুভক্ষণে ॥

আনন্ড তখন যুবের যোরে ! সেবেছিল চন্দ্র তপন,
মানবশিশু বনিন্দ্রপে নিখিলজ্যোতির অবতরণ ।
ধরিত্রীনা তোমার নিরে
ভাসতবারের কোলে দিবে,
সেদিন তোমার বেগেছিলেন বঙ্গভূমির কোন্ ভবনে ।
পড়ে বনে,
তোমার জন্ম হ'য়েছিল এইদিনে কোন্ শুভক্ষণে ॥

যাগুন কি আর চাপা থাকে, আনো কি রর যত্নকারে !
চিরস্থায়ীনা সত্য কি রর অধীনতার কারাগারে ।
হঠাৎ যজ্ঞশাভের মত
সাধিলে বিপ্লবের ব্রত ।
ভারতসুপ্তিদিবল এলো তোমার জন্মদিনের সনে ।
পড়ে বনে,
তোমার জন্ম হ'য়েছিল এইদিনে কোন্ শুভক্ষণে ॥

যোন্নের হৃদি লুপ্তকরা সে বিপ্লবের যজ্ঞানলে
ক'ত প্রবীৰ-প্রাণের হবি আত্মদানের স্বপ্নে 'বলে ।

অরবিন্দ-নবজ্বারে

রবীন্দ্রনাথ ডাই ত্রোনারে,

দিলেন বিশুবানীর অর্থ ত্রোনার উদর-উষোধনে ।

পড়ে নবে,

ত্রোনার জন্ম হ'য়েছিল এইদিনে কোন্ শুভক্ষণে ।

দেশবুক্তির দীপন দিবে, জীবনবোধের পদ্ম দিলে ;

বহুদূরার সত্যত্বের মহাপঞ্জির শরণ দিলে ।

জগৎ-ওজ, যে যোগেশ্বর,

ত্রোনার বিভায়ে আনরা অবর ।

ত্রোনার পূজায় প্রদীপ্ত হই এইদিবসের সন্নিদানে ।

পড়ে নবে,

ত্রোনার জন্ম হ'য়েছিল এইদিনে কোন্ শুভক্ষণে ॥

৫৫

স্মৃতির পাতা

এক

সাতানব্বই সালের ভূমিকম্প খ্রিস্টাব্দোক্ত শত

৫

আমার বয়স প্রায় আট। নিলকানাবী মহকুমা শহর। মহাবনের দিন। ইছুল চুটি। অপরাহ্নে মহাবনের বিজিল চলেছে সাতা দিগে—তাজিয়া নিয়ে। আমরা ছুটে গেলাম ছেলেরা একদল, কাড়া-নাকাড়া, হৈ-চলোড়ি, হাসেন-হাসেন হোপ—আমরাও সবাই বিশেষ গিয়েছি সেই দলে, কোলাচলে। তর্জনকার দিনে এরকম বেশ চলত—নাথে নাথে একটু আধটু লাঙ্গা-চাঙ্গা সবের। তিন্মুরা মূলনানোর পর্বে যোগ দিত—মূলনানোরও হিন্দুর পূজায় উৎসবে উপস্থিত থাকত।

এই প্রসঙ্গে একটি মজার কথা বলি তবে। আমাদের সঙ্গে পড়ত দু'চার জন মূলনান বালকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল আমার বন্ধুদের। তাদের একজনের বাড়িতে যাওয়া-আসা করতাম নাথে নাথেই। একবার আমরা তাকে তিনাসা করে বললাম, “তোদের লঙ্কা-সরন বেগা-পিড়ি নেই—তোরা নিজে বোনকে দিয়ে কবিস!” তেঁদের বলল সে, “কি দোষ এতে? তোদের যত কুসংস্কার। বোন বলে ত ভালবাসি, বৌ চলে ডবল ভালবাসব।” আমরা ত হতবাক!

বোন বলতে অবশ্য সহোদরা বোঝায় না—বোন হল এখানে cousin, first cousin পর্যন্ত, অর্থাৎ পুত্রপুত্র জ্যেষ্ঠপুত্র ভগ্নী। দক্ষিণ ভারতে গোড়া হিন্দুদের মধ্যেও এক সম্মতভাবে বাবা-ভাগ্নীকে বিবেচনা করা হয় শ্রেষ্ঠ বৈবাহিক-সহচ। বাঙ্গালীরা কম্পনা করতে পারে? এই আলোচনা বৈদিক ঋষিরা পর্যন্ত করে গিয়েছেন—বন-যবী সংবোধ—অবশ্য সে ক্ষেত্রে বনে রাখা পরকার তাঁরা সামাজিক সমস্যা আলোচনা করেননি, সামাজিক ব্যবস্থা, কি অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনা তাঁদের চক্ষে ছিল উপমা বা রূপক একটা আন্তর অনুভূতি বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রকাশ করবার জন্যে। এসব উদাহরণে সহজেই বোধগম্য হবে যে আমাদের সাধারণ নীতিবোধ, পাপপুণ্য বোধ, ধর্মজ্ঞান—বাক্যে বলা হয় বিবেক—তা একটা আপেক্ষিক সভ্য নাত্র, তা গড়ে উঠেছে আমাদের সামাজিক প্রয়োজনের বশে—

তাতে শাশ্বত বিশ্বব্যাপী কিছু নাই। সত্যাকার নীতিবোধ চল অধ্যাক্ষবোধের সহোদর—
তাই ত অধ্যাক্ষ-সাধকেরা সর্বদা বলে থাকেন স্বশ্রীত হতে হবে, ওহু হৃদয়-বোধের স্বশ্রীত
নয়, পাপপুণ্যেরও স্বশ্রীত।

মাত্রাক, বনভিনান নহরনের নিছিল অনুসরণ করে চলেছি আনন্দ—প্লাম সহরের
বাহিরের সৌন্দর্য্য অবধি। সেখান থেকে ফিরলি, ফিরতি পথে শোভাধরা করতে করতে
চলেছি আরও সকলে, এমন সময় বুট্টী এল গুঁড়ি গুঁড়ি—কখন যে দেখ করে এসেছিল টের
পাইনি। দিল্লী ছুট, বাড়ীতে পৌঁছতে হবে। পৌঁছে গোলাব—বাড়ীতে ঢুকে উঠানে
পা দিয়েছি, অবনি শুনি নারের উৎকণ্ঠ কণ্ঠ পাশের বাসা থেকে, আনার নান ধরে ডাকছেন।
আনি ভুটে গোলাব সেখানে। বাড়িরে গোলাব—কিন্তু এ কি, পা টলছে কেন? নাটি
সবে যাচ্ছে কেন পায়ে তলা থেকে? দোড়ের উপর ছিলান এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, থাকে
বলে করছি মেঘগর্জন এ ত সেরকম নয়। মেঘগর্জন হয় আকাশের একটা দিক থেকে আর
কেশব বৈশাখ পট্টিকা—কিন্তু এখন শুনি যে বব, তা সময় আকাশ ভুড়ে কোথা থেকে
আসছে যেন, গাঢ় বন গুরুগুরীয় শব্দাকা চাপা আওয়াজ সর্বত্র সর্বদিক থেকে উঠে আসছে
যেন, ভীতিকর হোল একটা। সময় পরীক্ষা দুলছে, পাঁজিতে পারছি না। সবাই জ্বা
হরেছে উঠানে, একজন বলে উঠল—ভূমিকম্প। ভূমিকম্প! বসে পড়। বসে পড়।
আমি বসে পড়িনি, পাঁজিরে চাল মানলে নিচ্ছিলান—balance রাখছিলান যেন, সোলনার
চড়ে। চলল কয়েক মিনিট এরকম। তারপর দেখি চল উঠছে ফোয়ারার নত চারদিক
থেকে। সাননেও নাটি কেটে গেল, এক হাত বেড় হাত চওড়া, উঠানের এক পাশ দিয়ে,
একখানা বাটির ঘরের ভিত দূ'ভাগ করে চলে গেল যেন একটা গভীর খাদ—বরষা ঘিষা হও
কথাটির অর্থ কি চাক্ষুষ দেখান—আর তার ভিতর থেকে টগবগিয়ে উঠছে চল আর চল—
সব আরগা বলে ভরে গেল, যেন বন্যার জল। হতভম্ব হয়ে দেখছি আর দেখছি। তারপর
খামল ত 'ভুইচাল' (বঃপুরের স্থানীয় ভাষা)। এখন তবে খতিয়ান দনা থাক কি হল আর
না হল। প্রথমেই দেখা গেল চল সব কোথায় সরে গিয়েছে, এক কোঁটাও কোথাও কিছু
নাই—কুয়ো সব খুনা, বালিতে পূর্ণ। ও আরগাতে মলী মাই, পুকুরও বিশেষ কিছু নাই।
কুয়োর উপর নির্ভর করে সকলে—প্রত্যেক বাড়ীতে একটি, দুটি, তিনটি পর্যন্ত কুয়ো থাকে।
কিন্তু দেখা গেল সব কুয়ো বুকে গিয়েছে সহরে। চল বহন কোথাও নেই, তেঁটাও তাই
বেড়ে যায়। ভাগ্যবশত একটা কুয়ো দূরে কোথাও পাওয়া গেল যার মধ্যে হাত খানেক জল
আছে—তার থেকেই সকলের কোন প্রকারে কিছু সংগ্রহ করে সাময়িক তৃষ্ণা-নিবৃত্তি করা হল।

ভূমিকম্প কিন্তু তখনো শেষ হয়নি একেবারে—অর্থাৎ রাজা বাহুকি মাথা ঝাঁকুনি
দিচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। অনেক সবার হরত সববেত ভীতির কম্পনাতেই তা অনুভূত
হচ্ছিল—আর সব আরগা থেকে যুগপৎ বিপুল লক্ষ্মণবনি আর হনুমান—ভজব জোর
চলছিল যে আর একবার খুব শক্ত হকম হবে। আমাদের পাড়ার সকলে বাড়ী দর ছেড়ে

সহরের বাইরে একটা বিপুল বাড়ি ছিল সেখানে জন্মায়ত হয়েচে। পরশ ঘুচে গেছে, বেয়ে ছেলে সব একসাথে—বেলা বসেছে বেন। তবে একটা পৌতাস, সহরে দালান কোটা তখন একরকম ছিলই না—সব বাড়ির ঘর, বাটির, বাচার, বাঁশের খুঁটি সব ভূমিকম্পের ফলে হেলেছিল বলেছিল যথেষ্ট কিন্তু ভেঙ্গে পড়েনি দু'একটা ছাড়া। তবে যে মাঠের কথা বললাম, সেখান তর চেলাকা বলে গিয়েছে, আগে ছিল সবটা প্রায় সমতল, এমন যেখা একটা দিক উচু হয়ে গিয়েছে অনেকখানি, আর একটা দিক নিচু—চেউ খেনে গিয়েছে। সম্ভ্যার পর আমরা সব বনে ফিরলাম। কিন্তু সারারাত্রি বেন ওনেছি সেই রকম বিকট আওয়াজ আকাশে মাঝে মাঝে, মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি—সাবান হলেও। সারারাত্রি ঘুম হয়নি, সান্ধ্যাণা ষাওয়ালাওয়া কোন রকমে নম নম করে সারা হয়েছিল।

পরে ওনেছি রংপুর সহরে, সেখানে পাকাবাড়ী অনেক সেখানে, কত বীভৎস কাণ্ড সব ঘটেছে; বাড়ী ভেঙ্গে চুরবার হয়ে গিয়েছে, কত লোক যে হত আশ্রয় হয়েছিল তার ঠিক নেই। ওনেছি এ রকম ঘটনা—রাষ্ট্রা নিয়ে বাড়ীসহ গরুর গাড়ী চলেছে, হঠাৎ রাস্তা দু'ভাগ হয়ে গেল, সেই কীক সিনে গরুরের অতলে তলিয়ে গেল বাড়ী গাড়ী সব। দু'একটা ছায়গায় গরুরের পাশে বাড়িরে আনি দেখতে চেষ্টা করেছে কি আছে নিচে—হতুস দেখা যায়, দেখা যায় শুধু যতকাব আর যতকার। সমস্ত উত্তরবঙ্গে ও আসানে বিশেষভাবে এই কল্পন হয়েচে—আসানের পূর্বাঞ্জে পাছাড়ের ভূগর্ভে কোথাও নাকি ছিল এর কেন্দ্র। রংপুরের বর কাচিনী ওনেছি এবং চির সব স্বচকে দেখেছি। তাজতাইল বাজা গোবিন্দলাল ঘন থেকে বেন হয়ে গিয়েছেন প্রায়, বরভাল উপরের বিলাল ভেঙ্গে পড়ল তাঁর পায়ের উপর—জখন হয়ে বইলেন, কোনরকমে বেঁচে বইলেন কিছুকাল, পরে তাতেই হয় তাঁর মৃত্যু। একটি সম্ভ্রান্ত ও জনিয়ারগোচের পরিবার ছিল, চকবিলাল পোতলা দালান তাঁদের বাসস্থান—স্বচকে আমরা দেখেছি, একটা বিপুল ধ্বংসস্থলে পরিণত হয়েচে, একটা প্রাণীও বাঁচে নি সেই পরিবারের। জুরে যাওয়াব পথে বরবার ডাকিয়ে দেখেছি এই নিতরু ধ্বংসস্থল—পড়ে রয়েছে একখানে, কোঁচ গ্রহণ করবারও লোক নেই। স্থপতি ক্রমে গাছ-গাছড়ায় বনে ছতনে ভরে উঠছিল। মানুষী আশাভরসার, জীবনের সকল সাধের এই পরিধান? বনে পড়ে যায় হেনচাত্তর কল্পণ চিত্রাণি

পড়ে থাকে দূরগত

জীর্ণ অভিনাষ বত

ছিনু পতাকার বত

ভগ্নদূর্ণ প্রাকারে।

আরো ওনেছি, কৃষিচারের মহারাজ তাঁর দু'টি পুত্রকে (ঝিৎ ও হিৎ বা বিতেজ ও হিতেজ) দুই কীকে নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন বোডলা খেকে। কিন্তু অকৃতভাবে যত্নত ছিলেন ডিন জনেই।

তবে অস্তুত থেকে একটা শুভও অনেক সময়ে দেখা দেয়। রংপুর জেলা—উত্তর-বঙ্গ নামেই—ছিল ম্যানেরিয়ায় ডিপো। ছোট ছোট ছেনেপিলে হাত পা শুকনো, পেট-বোটা, পিলে যকৃতে পরিপূর্ণ, ফ্যাকাশে বর্ণ—এ সকল দৃশ্য রাস্তায় ঘাটে সর্বদা নিমন্ত। আমি নিজে যে কত সের কুইনিন খেয়েছি, কত বোতল কডলিভার খাষাঃকরণ করেছি তার ইচ্ছা নেই। ভূমিকম্প এসে এ দেশে অনেকখানি দূর করে দিয়েছিল ম্যানেরিয়ায় প্রকোপ—ওদিককার মাটিতে আকাশে বাতাসে একটা ঝাঁটার কাছ করে গিয়েছিল।

এখানে বলি তবে এক নজর ঘটনা এই ভূমিকম্প সম্পর্কেই। ভূমিকম্পের ঠিক আগের দিন—প্রায় সন্ধ্যা। আমার পিতাঠাকুর যাবেন নিলকানারী থেকে নাটোর—পাঁচ সাত ঘণ্টার রাস্তা। কি একটা প্রতিনিধিদের অধিবেশন ছিল—বোধ হয় উকীলদের, তাই পিতাঠাকুর এবং আরো কয়েকজন যাচ্ছেন নিলকানারী থেকে। বলেনি, প্রায় সন্ধ্যা—দুগারে প্রস্তুত গাড়ী (কিনেব গাড়ী তোঝা কখন করতে পার ?), গরুর গাড়ী। সে-সময়ে ষোড়ার গাড়ী পর্যন্ত হয়নি আরামের ও সহরে—ষোড়ার গাড়ী নাই, রাস্তায় আলো নাই, তোলরা বলতে পার প্রায় মধ্যরাত্ৰ। পিতাঠাকুরের অস্বীর্ণতার স্বরূপ ছিল কিছু। তখনকার দিনে এ স্বরূপের সঙ্গী ছিল 'সোজা ওয়াটার', হুতরাঃ তিনি বলতেন একটা সোজা ওয়াটার খেয়ে বসনা হবেন। সোজা ওয়াটারের বোতল ঘরেই ছিল—খাটের উপর বসে, বোতলটি টিনি নিজেই খুলবেন ঠিক করতেন। বা ও আমি পাণেই দাঁড়িয়ে। খোলার জন্য 'সিপি' দিয়ে যেট চাপ দিয়েছেন অবনি বিয়াট পল্ল করে বোতলটি ভেঙ্গে ছুরবার হয়ে গেল—কাচের টুকরাগুলি চড়িয়ে পড়ল এমিক ওমিক। কিন্তু দেখা গেল কারো কিছু হয় নি। পিতাঠাকুর বলে উঠলেন, "বাধা পড়ল, নাঃ, আর যাওয়া হবে না।" আমার না আশ্চর্যান্বিত ও কিছু অসম্বষ্ট হয়েই বললেন, "সে কি, সব তৈরী, লোকেরা অপেক্ষা করছে, শেষ যুগুর্ভে বলা হল যাঃ না—সেটা কি উচিত ?" পিতৃদেব উত্তর করলেন, "যাই বল তুনি, আমি যাচ্ছি না, আমার কাছে নির্দেশ হুস্পষ্ট।" গাড়ী ফিরিয়ে দেওয়া হল, পোখাক-পরিচ্ছন্ন ছেড়ে পিতৃদেব আরাম উপভোগ করতে বসলেন।

পরের দিন ঠিক ওই একই সময়ে হল ভূমিকম্পের দূর্ঘটনা। তখন পিতৃদেব স্বরণ করিয়ে দিলেন নাকে, "কাল আমি চলে গেলে তোমাদের কি অবস্থা হত এখন ?" ফলতঃ যাত্রা ওখান থেকে চলে গিয়েছিল তাদের বাড়ীতে মহা হসুদুল বেধে গেল—সংবাদ জানবার জন্য, কি চল তাদের। কোন সংবাদ নেই, টেলিগ্রাম বন্ধ! কি উৎকণ্ঠা! কি অস্বস্তি! নিঃস্বাধীন রাত্রি! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই দিন দুই পরে—খবর পাওয়া গেল, সব স্বস্থ অবস্থায়।

সাতানক্শই সালে ভূমিকম্প, আটানক্শই সালে আমি নিলকানারী বহকুনা-নগর ছেড়ে জেলা-নগরে চলে আমি আমার কাক্যবশাইকের কাছে। তিনি ছিলেন ভাঙার। বহকুনা বকঃবল—প্রায় গ্রান—ছাড়ান এই জন্যে যে ফুলটি সেখানে সুবিধার ছিল না। সকলসেই

বসন্ত 'পচা ফুল'—সেখান থেকে প্রথম বিভাগে যদি পাশ করে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তবে সেটা miracle বলে গণ্য হয়। ন্যায়ের স্বাভাবিক অবস্থা বলতে হয় যে উত্তরকালে এই ফুল থেকেই বের হয়েছিলেন গাভুরী পরিবারের প্রকোপের হেরষ গাভুরী। ডট্টাচার্য পরিবারের বাড়ির প্রকোপের হিরোপ্রমাণ এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ী দেবেপ্রমাণ, আরও বিশাল পরিবারের (এরা পরে বিশাল পদবীর পরিবর্তে মান্যাল পদবী গ্রহণ করেছিলেন, আমরা যেমন মুসলমানী পদবী সরকার ছেড়ে সামাজিক বাণগত পদবী গুপ্ত গ্রহণ করেছি) ব্যারিষ্টার ন' বেহর হেরবান মান্যাল। তবে এ হল বেন পাশচাত্য পণ্ডিতেরা যেমন বলেন গ্রীসে "বেরো-দিয়া" (Berotia) নামক বর্ষের ভূমিতে পিণ্ডারের (Pindar) নত বিদ্বৎ কবির আবির্ভাব। এই 'পচা ফুল' আবার আগুন নেড়ে পেল পুড়ে। ফুলটি ছিল পুণ্ডিত ধরনের এক বিরাট আট্টাচালা ঘর—নোটের উপর সূক্ষ্মশাই বলতে হবে আর বেশ শক্ত সমর্থ। তার ছাদের মধ্যে বাস করত আবার ডজন দু'তিন পাখি—হিরোপদনের বিশাল পালনীয়ত্বের মত। নীচে বসত ছেলের দল, আর মাথার উপরে ছাত্তের ভিতর পাখির দল। দুই ছাত্র দু'একজন আগুন লাগিয়ে দিল ফুল ঘরে, ফুল না থাকলে পড়াশুনাও আর থাকবে না, বৈতে বাবে সম্বৃত্ত করে কান—এই রকম কিছু উদ্দেশ্যে। এই আগুনে যেচারা পাখিও গেল সব—ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়—মনে আছে সেবেছি ফুলগৃহের ভিতরগিরি মধ্যে নিশ্চিত হয়ে আছে পাখীদের সাদা সাদা ছাড় সব। দুই ছেলে বর্তমান যুগের একচোটিয়া নয়, সে যুগেও ছিল—হয় ত সর্বমুখেই তাকি স্থান করে নেয়। রংপুর জেলা ফুল, মানকরা ডাল ফুল—বলেছি অন্যত্র, অতুলচন্দ্র গুপ্ত বানাকাল থেকে এই ফুলের ছাত্র, অধ্যাপক বোহিনীমোহন ডট্টাচার্য এই ফুলের ছাত্র, পুস্তকাত্মিক বলাবন ডট্টাচার্য এই ফুলের ছাত্র। আমাদের তাই এখানে আমরা হই। ভূমিকম্পের ঞক বৎসর পরে এলাক, কিন্তু সেপি সর্বত্র ভাঙলানান হয়েছে তার চিহ্ন সব—কত সব কত রেখে গিয়েছে সহরের গাঁয়ে। রংপুর জমিদারবটল স্থান, সকলেরই দালান কোঠা—সবগুলি বিধ্বস্ত। ভাঙছাতের কথা ইতিপূর্বে বলেছি। তদুপায় অট্টালিকার আশেপাশে খুঁড়ের বা টিনের ঘর করে তাকি বাস করছে।

রংপুরের একটা লক্ষণীয় জিনিস হল সহরের ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে একটা খাল। তার নাম মাঘাট না 'কে ডি কানাল' (K. D. Canal)—K. D. অর্থ কৃষ্ণদান—কৃষ্ণদান যোগ শ্রীঅন্নবিশেষ পিতা। তিনি এখানে প্রধান সরকারী ডাক্তার ছিলেন এবং বহু সংকর্ষের জন্য তাঁর নাম সর্বজনবিদিত ছিল—খালটি তাঁরই উদ্দেশ্যে, স্বৈনিক জমিদারের অর্থানুকূলে, কাটান হয়, সহরের জন নিঃসারণের জন্য, ন্যায়েরিরা-প্রশমনের একটা উপায় হিসাবে। ভূমিকম্পে খালটি প্রায় বুজে গিয়েছিল—বর্ষায় তবু সেটি একটা স্বাভাবিক নদীর মত হয়ে বেড়ে।

(২)

"মাঘট" নামটা স্মৃতির একটা পর্বা তুলে ধরল। "মাঘট" বলে একটা নদীই আছে

ওদিকে, রাপুণ সহরের বাইরে, নাইল পাঁচ ছয় মূগে—এখনো অর্ধাংশ তখনো প্রবাহিত দেখেছি যদিও মল্লঃ মল্লঃ । ওনেছি বাল্যকালে পিতামহ সনকালীন্দ্রের মুখে যে এই নদী বেয়ে ওখানে এসেছিলেন দক্ষিণবর্ত থেকে উৎসের কন্যাকানন । পদ্মাপার হয়ে, পদ্মা পার হয়ে, নন্দনদী বাল বিন ধরে ধরে তাঁরা আসতেন এই দুব দেশ—তখনো উত্তরবর্তে রেল হয় নি—আগতে লাগত তিন চার মাস—এখন যেখানে উড়ে আসা যায় দু'তিন ঘণ্টায় । তবে দেখা দিয়েছে ঝড়-ঝুগান, চোর ডাকাতি—বীভূত দুঃসাহসের ব্যাপার সে পদ্ম-মাত্রা । আমারও বাল্যকালে আমি দেখেছি বগড়া থেকে আমার এক ঠাকুর্দা আমাদের দেশের রাজ-বাড়ীতে (অর্থাৎ পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের সম্মেলন কাছ প্রায়) বরাবর নদীপথে পাঠাতেন দুর্গা-পূজার যাক বলে ডাকের মাঝ—সে সব নন্দনদীর মধ্যে বনে আছে বগড়ার করতোয়া, করিমপুরের চন্দনা এবং গড়াই, আর রংপুরের বাঘট ।

দক্ষিণবর্ত থেকে উত্তরবর্তের দিকে সে মূগে এই রকম ছিল যেন একটা লোক চলাচল (migration) । জনপাইগড়ি, দিনাজপুর, রংপুর, বগড়া—এ সব নিয়ে বাংলার যে উত্তরবর্ত তখন ছিল প্রায় পতিতভূমি । স্থানীয় লোকেরা অশিক্ষিত, অমোগ্রস্ত এবং স্বাধীনপন্থ বটে । তারা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে ছিল, কানাকড়ি পাট করত কারত্রেপে । আজ-কাল প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন যে এক প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই পূর্ব ভূমণ সংস্কৃত ছিল কি আদ্য-প্রদানে সমৃদ্ধ ছিল নানয় বীপপুত্রের সঙ্গে, অষ্ট্রেলিয়া এবং সবগ্র পলিনেশিয়া ধরে সমস্তটি ছিল একটি ভিন্নতর পূর্বতর সভ্যতার অন্তর্গত । সামান্য-মহাত্ম্যের পুণ্যপাদিত্যে এসেই লক্ষ্য করে হয়ত বলা হয়েছে নিম্নোক্তরাজ্য । দুব সম্ভব এরাই ছিল শ্রীমানপূর্ববর্তী মানবতা । শ্রীমদবিশ্ব বলেছেন শ্রীমান হলেন স্বর্গীতে মানবসমাজে দাবিক মানবের আবির্ভাব বা অবতরণ ; তার পূর্বে ছিল রাজনিক অর্থাৎ প্রাণাব্যেগপ্রধান মানুষ—পরবর্তী উন্নততর মানুষ এসেবই যম্বর, দাক্ষ, অর্ধপন্থ (বানর) জাতি বলে বর্ণনা করেছেন । একটা জাগতিক প্রলয় বা বিপর্যয়, বিপুল একটা ভূমিকম্পের ফলে সে স্থর ও স্থিতি পর্বদন্ত হয়ে যায়—তার ভগ্ন চূর্ণ মই পতিত অংশ সব খুব সম্ভব হল এখন যাদের আমরা বলি পক্ষন বর্ণ, বা আদিন কি আদিবাসী ।

যা হোক, বলচিনাম এই সব ফাঁকা জয়গায়, শিকার দিক দিয়ে ফাঁকা, চরিত্রধর্মের দিক দিয়ে ফাঁকা—বন সহর গড়ে উঠতে লাগল, আদ্যকৃত পানা স্থাপন শুরু হল, তখন সে সকল কেন্দ্রে কেন্দ্রে দক্ষিণ থেকে অধিকতর শিক্ষিত কমিষ্ট বধ্যবিত্তেরা অনেক এসে ছড়িয়ে বসল, ভাণ্ডা-যম্মেখমে, মূলত জনিয়ারগী চাকরীর লোভে । আমার পিতৃকুল মাতৃকুল থেকে পূর্বপুরুষ এইভাবে এ দিকে এসেছিলেন এবং প্রায় দ্বাদশ হয়ে গিয়েছিলেন ।

এখানে একটু গবেষণা করা দাক—স্বযোগ পাওয়া গেল বনন । সমলে দেশভাগ দেশভক্তের দিকে (migration) মানবসমাজে এক বিচিত্র ব্যাপার (অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও যে অনুরূপ কিছু নাই, তা নয়)—জবে মানবজাতির মধ্যে এ বস্ত্যটির রয়েছে একটা

বিশেষ প্রাধান্য, এর পরিধান স্তম্ভপুসারিত এবং গভীর পরিবর্তন-সাধক। হেতু এর নানাবিধ—অভাব অভিযোগ উৎপাদন আকাঙ্ক্ষা ঘূর্ণিত ইত্যাদি। একদল ইংরেজ গেল আনেরিকার, সেখানে গড়ে উঠল ক্রমে ইয়াকী-মাজ, আর একদল গেল অষ্ট্রেলিয়ার, স্ট্রী করল নতুন এক ব্রিটিশবর্ণ। কানাডা এই রকমে চলেছে ইন্ড-করাসী গাভ। সেন থেকে, পোর্টুগাল থেকে একদল বণ্ডানার্ক (বাংলায় যাকে বলে বাপে-শেখান মায়ে-ভাড়া) সব থেকে বেয়িয়ে গিয়ে কি রকমে একটা ব্রহ্মজ্ঞ ইতিহাস এবং অভিনব জাতি স্ট্রী করেছে দক্ষিণ আনেরিকার তা যাবত সকলেই জানি। পৃথিবীর চেহারা এভাবে কলে গিয়েছে। আধুনিক ইউরোপ, তার বিভিন্ন দেশ-জাতি-ভাষা গড়ে উঠেছে এই রকমের একটা লোক চলাচলের কলে। উত্তর, উত্তর-পূর্ব থেকে এসেছে গথ, ভাঙল, ভাতার প্লাবন—দক্ষিণ থেকে কিন্তু উত্তরে উঠেছে আরব-অভিযানের কলে বিশৃঙ্খল। এসিয়াতে আনাদের ভারতে ভাতার মোদল পাঠান তরল বিপুল শ্রোতে চলে এসেছে। ভারতের ইতিহাস কলে গিয়েছে।

কিন্তু এসব বৃহৎ পরিপ্লাবন ছাড়া স্মৃতির পরিবর্তন যে বহু শোভিত-গমন ঘটছে তারও মোটকল শেষে হয়েছে বিপুল—আমি এখানে দৃষ্ট আকর্ষণ করতে চেষ্টাছি সেই দিকটার উপর, তা বেশ চিন্তাকরক ও শিক্ষাপ্রদ। এই যেমন আমি শুনেছি যাবার পিতৃপুরুষদের পূর্ব-অধিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রায় পশ্চিম প্রান্তে—বুনিদারাদের নবাবী আমলে তাঁদের কেউ কেউ এক সময়ে নবাব সরকারে কাজ-কর্ম গ্রহণ করেন (তাই আনাদের সামাজিক পদবী “গুপ্ত”র পরিবর্তে “সরকার” হয়েছিল)। কিন্তু নবাবের পতনে তাঁদের এক শাখা ধসে ও ভেসে পড়ে—ভাগীরথী বা গঙ্গা বেয়ে বেয়ে ঠেকল গিরে প্রায় পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের মোহনায়—গোয়ালন্দ (আনার পিতা, পিতামহের জন্ম সেইখানেই)। আমি বলছিলাম বাংলার লোক চলাচলে এই রকমে একটা পূর্বাভিষুখী গতিই ছিল বিশেষভাবে। এবং এই ক্রম-গতির একটা লক্ষণ ও পরিণাম হল ক্রম বুলাহাস, সামাজিক বর্ণাশ্রম অপস্রব। আনরা জানি সমস্ত বঙ্গদেশ—এট পূর্ববঙ—ছিল আর্থধর্ম-আর্থজাতি-বহির্ভূত—বলা হত পাণ্ডবজিত দেশ। এখানে বাস করত সম্প্রদায় অনার্যেরা—যাদের বংশধন হরত আজ-কালকার চাড়ী-ভোন-মাগদি-বেদে জাতি সব। সেই জন্যই দেখি রাজা বাল্লভ সেন বহন শাস্ত্রীয় বজ্রানুষ্ঠান করতে চাইলেন তখন সম্ভ্রাজ্ঞ তাঁর মিলন না দেখে—পশ্চিম থেকে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ, কানাকুল থেকে) তিনি নিয়ে এলেন পঞ্চব্রাজ্ঞ। কিন্তু কিছুদিন পরে সেখা গেল বাংলার আবহাওয়ায়—ব্রাজ্ঞেরাও বাছ খাওয়া হ্রস্ব করে গিলেন—ভ্রাম্যক অশাস্ত্রীয় ব্যাপার, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে (দু’ একটা কোণে ছাড়া)। তারপর এই ব্রাজ্ঞ-কুলও বিভাগ হয়ে গেলেন—গঙ্গার পশ্চিমে রইলেন বীরা আর বীরা এগিয়ে গেলেন পূর্ব-পারে—রাণী ও বারেন্দ্র। রাণীরা হলেন তাঁরাই যদি অক্সির ব্রাজ্ঞ, বীরা পূর্বের দিকে চলে গিয়েছেন তাঁদের পূর্ব বর্ধাঙ্গ আর নাই। বৈদ্যবংশও দেখি (আমি নিজে এই বংশজাত) পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্য নিজেদের উচ্চতর পদবীতে স্থাপন করেন পূর্ববঙ্গের বৈদ্যদের

চেয়ে, উভয়ের মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধ চলে না—আমি আজকালকার কথা বলছি না বলা বাহুল্য। কার্যতঃ মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ সরাজে বৈদ্যকুল অধিকতর আচারানুষ্ঠানিক ছিল—তার নিত্যের প্রায় ব্রাহ্মণ বলেই বিবেচনা করত (অষ্ট ব্রাহ্মণ)। বৈদ্য নামে পৃথক জাতি (বর্ণ) ক্রমে গড়ে ওঠে সেই সব ব্রাহ্মণদের নিয়ে যাঁরা বৈদ্যব্র্তি গ্রহণ করেন এবং পুরুষাণুত্বে ঐ ব্র্তি অনুসরণ করেন। আনন্দের জ্ঞানি আনন্দের কবিগুরু সম্ভবতঃ এখানে বিশেষভাবে সংস্কৃত পঠনপাঠনে অভ্যস্ত এবং ব্রাহ্মণেরই মত পুণ্যাত্মিক ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানে অনুরক্ত। আবার নিজেরও ব্রাহ্মণেরই মত উপনয়ন সংস্কার হয়েছিল এবং আমি আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ধ্যায় ত্রিরা. গায়ত্রী-জপ করেছি বৎসরাধিক হয়ে। পূর্বা গতি যে হীন গতি তার আরো প্রমাণ এই যে পূর্ববঙ্গেরও পশ্চিমবঙ্গে বৈদ্য কারণে বিবাহ হয় না।—কিন্তু অতি পূর্বাঙ্গের কুসিদ্ধা শ্রীচর্চা এ রকম বিবাহ প্রায়সন্নত—অর্থাৎ আচারসন্নত। যত পূর্বে চলি ততই কি জাতির বর্ণের বিশৃণু হয়ে গিয়েছে? ভ্রুও কিন্তু মুসলমানের সঙ্গে সে বিশৃণু হয়ে নাই।

উত্তরভারতের ইতিহাসপটে বেশি উল্লেখের পর ভারতের জনশ্রুতি যেন হয়ে গিয়েছে তার উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত থেকে পূর্বপ্রান্ত অবধি—গাজের খাত ধরে, সমতল আশ্রয় করে যেন এসেছে, যেন গিয়েছে, অবশেষে পৌঁছল গিয়ে যখন আসানের পাশাড়ে পড়তেন। মুসলমানী পালন ও এই রকমে উত্তরভারত ভাসিয়ে দিয়ে হয়ে গিয়েছে আসানীর গিরিশ্রেণী অবধি, জনশ্রুতি হয়েছে সেখানে গিয়ে—সেইজন্যই কি পূর্ববঙ্গ ও আসানের উৎসঙ্গ মুসলমান ভূমিষ্ট, মুসলমান প্রভাবান্বিত হয়েছে এত?

সরল কথা ও কাহিনী বলতে বলতে চলে এসেছি তরঙ্গতুল গুরুগম্ভীর গবেষণার—মুত্তরাং আর বেশি অগ্রসর না করে আজ এখানেই নিরন্ত হওয়া যাক।

দ্বি

স্বদেশীর দীক্ষা

১৯০৫ সালে ভারতীয় স্বদেশী আন্দোলন একটা অতি আশ্চর্য ঘটনা—একটা তাৎক্ষণিক ব্যাপার, miracle, বলতেই হবে। প্রাকৃতিক প্রকোপের মত তা যেন আকস্মিক, জেনি পূর্বায়।

প্রভৃতি, প্রচেষ্টা আগে ত হয়েছিল বহু—কিন্তু কল ত প্রায় কিছুই হয় নাই। এই যে বিরাট বিপুল অতিকার জনরাশি কুত্রকর্ণের মত পড়ে রয়েছে, তা পড়েই রয়েছে শত শত

বৎসর ধরে। এখানে-ওখানে এখন-তখন তার কাছে অগ্নিবস্ত্র ফেলে দেবার চেষ্টা হয়েছে,
স্বাধীনতা-দীনতায় কে ঝাঁপিয়ে চায় রে
কে ঝাঁপিয়ে চায়

কিন্তু

ত্রিশত কোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস—

আরো

ভেগেছে চীন ভেগেছে আপান...
ভারত শুধুই ঘুরায় রয়

হতাশ হয়ে প্রায় বন্য হয়েছেন

না জাগিলে আর ভারত-নলনা,
এ-ভারত আর জাগে না জাগে না—

সিপাহী-বিদ্রোহকে যদি স্বাধীনতার পুটেটাই নাম দেওয়া হয়, তবে তা নিশ্চয় প্রস্তুত-
রূপে ঝাঁকু নাম যেন। দু'একটা গোলাগুলি খুনস্বারানি (চাপেকার জাতীয়) মশকের
দংশন মাত্র।

কিন্তু এ কি হল? একদিন—প্রায় রাত্রায়াতি, সবস্ত অসীমতঃ তনোরাণি খেড়ে
ফেলে, দুগ্ধবেগে

উঠিয়া দাঁড়াল জননী...

সবস্ত দেশের উপর দিয়ে চলে গেল বিপুল বল্লার শ্রোত্র, কিন্ন একটা ভূমিকম্পের সর্বব্যাপী
উষ্মলতা। আমরাও চেয়ে চেয়ে বিস্মিত হয়ে দেখলাম, বলে উঠলাম সমবেত কণ্ঠে,

আজি বাংলাদেশের ক্ষয় হতে কর্খন আপনি

ভূমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী,

ওগো না, তোমার দেখে দেখে আঁখি না ফিরে—

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার নগরে!

ব্যক্তিগত ভাবেও আমরা কি ছিলাম আর কি হয়ে গেলাম—প্রায় রাত্রায়াতিই।
ছিলাম অতি সাধারণ, অতি অল্প ভাবস জীব, হয়ে উঠলাম সত্যক সচেতন—জীবনে দেখা
দিল উদ্দেশ্য লক্ষ্য অর্থ। গড়্যানিকা-প্রবাহে চলেছিলাম—নিষেকে এনিরে ছড়িয়ে
ছড়িয়ে। পরিবর্তে জীবনটা সংহত হয়ে উঠল, একটা মুখ নিয়ে। দলে ভিড়ে গিয়ে
শ্রোতে ভেসে গিয়ে হওয়ার কথা বড়োদের ভেপুটি প্রকাশের * উকীল ডাক্তার—সচল

* আমি কবিতা দ্বারা এইরূপে (প্রথম প্রেরণা হল এইরূপে—সামান্যতঃ ব্যক্তিগত বা দুই-তিনজন) ভাব

সংসারী। কিন্তু এদুই মূহুর্তে কি ওলট-পালট হয়ে গেল একটা ভূমিকম্পে জীবনটা ধুঁতাপ হয়ে গেল। ওপাশের হয়ে গেল অতীতের মৃত মৃতব্যক্তি জীবন আর এপাশের বর্তমানের ভবিষ্যৎ-মুখী কৰ্ত্তব্যপ্রাপ্তি সমুদ্র জীবন।

কলিকাতায় তখন চলছিল বিরাট বিক্ষোভ—কাগজে পড়ে, সভায় সমিতিতে, উৎকর্ষ কলরবে ‘স্বাধীনতা’ ‘স্বাধীনতা’ ‘বহিকার’ ‘বহিকার’—কর ইংরেজকে বহিকার, চাই ইংরেজ-বহিত্তি ভারতবর্ষ। পার্কে পার্কে, উন্মুক্ত স্থান যেখানেই একটু সেখানেই লোক জনায়েৎ হয়েছে—ছল-কলনের ছাত্রলব্ধি বেশি—আবাসের সময়ে ছাত্রীরা বাহিরে এসে যোগদান করে নি—বজ্রতা ও ঘোষণা। স্বদেশী, বরকট, দেশীয় শিক্ষা, পল্লীগঠন—সর্বত্র এই সূচীর ব্যাঘাত হত। আর তলে-তলে গোপনে বিদ্রোহ-বিপ্লবের, সশস্ত্র আক্রমণের প্রস্তুতি।

বাল্মীকি জীবনে একটা নোড়-ঘোরা, ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়া খুব বিরল জিনিস নয়, আবাসের সেশে। পরিচিত ও বাবুলী ব্যাপারের মধ্যেই ও-ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু একটা গোটা দেশ “ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর” বলে ছুটে বের হন—এ এক অভিনব দৃশ্য। ফরাসী বিপ্লবে—বাল্মীকি-সারা আক্রমণে—এই রকম একটা জিনিস দেখেছিলেন কিছু—কিন্তু ভারতীয় জগৎয়ের স্বভাব ও স্বরূপ তিনু।

আমি নিজে অনেক সভায় যোগ দিয়েছি, বিকেলে কলকাতার পরে—বিশেষতঃ গোল-চিহ্নি, হেন্সা আর ‘পাস্তির মাঠে’। পাস্তির মাঠে এক সভায় রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি জাতীয়তায় পুরোধা বা পুরোধিত একজন—ধীর সোনা পাশ্চ বহুবাহু অথচ উদীপনায় অগ্নিবর্ষী ওজস্বী ভাষণ তাঁর। আর এক দিন দেখেছি শ্রীশ্রবিলম্বকে, গোলচিহ্নির এক সভায়, গোপালিন নিরায়ান আলোকে। একখানা আলোচনায় দিয়ে আপাতদৃষ্টক ঢাকা প্রায়—বোধ হয় কিছু অসুস্থ ছিলেন তখন। তাঁর কণ্ঠ মৃদু, কিন্তু প্রতিটি বাক্য স্থপতি ও সূক্ষ্ম। উন্মুক্ত আকাশতলে বিপুল জনসমাজ নির্বাক নিম্নরূপ—বাকে বলে ছুঁচটি পড়লেও তাঁর শব্দ শোনা যায়। আমার মনে আছে ওই এই কটি কথা তাঁর—হাতুভাষার বাংলায় তিনি বলতে পারছেন না, মুখের ও লজ্জার কথা, তাঁর শিক্ষা ও পরিবেশ এমন ছিল যে বিদেশী ইংরেজী ভাষাতেই তাঁকে আরপ্রকাশ করতে হচ্চে—তিনি দেশবাসীর নিকট ক্ষমা-প্রার্থী। আর মনে আছে তাঁর সবসময় ভাষণের মধ্যে কি একটা সঙ্গীতবলত ছন্দবাহুর্বা নীলান্বিত হয়ে চলেছে। শ্রীশ্রবিলম্বকে এই সর্বপ্রথম আমি চাক্ষু দেখলাম।

আর এক দিনের ঘটনা মনে পড়ছে। বোধ হয় ৭ই আগস্টের প্রথম বরকট ঘোষণা। সভাস্থান টাউন হল। সে কি জনবাহিনী, কি উৎসব চকল সাগর! অতুল গুণ—তিনি ছিলেন

আমার সহপাঠী একজন ছাত্রকে ‘ব্রেকল’ দায় দিচ্ছিল এক ভাই বয়েই ডাকত। আমি first boy কি second boy ছিলাম না তোর দিন খুলে—হুজুং সেজত বর। আমি অত ভাল ছিলাম না খুলে। পরে দেখে ছলাম আমার দ্বন্দ্ব কিছু হয়ে বর, তখন আমার সঙ্গে দেখা হলে আমাকে হুজু করিয়ে দেয়—কেনব আমি ওবিদ্যে-বাক্তি করিনি এ

আমার ছাত্রজীবনে Friend, Philosopher and Guide—আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। আমি তাঁর সাক্ষর সর্ববিষয়ে—দেশসেবার, পড়াশুনার। তাঁর পাশে নিয়ে আমাকে বসালেন, আমাকে তিনি নিয়ে রাখলেন। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে একটা প্রস্তাব সমর্থনে বলে উঠল এক সঙ্গে all all—আমাকেও তাই করতে হল। তখনই বলবে drama, নাটক! কিন্তু জীবনের সমূল নুহুত সবই শু ভ্রাম—এর মধ্যে মিথ্যাচার নাই, প্রকাশের ভিত্তি ওই রকম। একটা তিনিই উল্লেখ করবার মত এখানে। সে-সুপের অনেক বস্তার কঠ ওনেছি। সে-কঠ আজ হারিয়ে গিয়েছে—মাইকের কপায় কল্পায়। স্বপ্নের বাঁড়ুতো, অধিকা নতুনবার, শচীন বসু—বিপিনচন্দ্র পালের ত কপাই নাই—কি সমুচ উদাত্ত কঠ—কি সীমায়িত ভক্তি তার, এমন শক্তি এমন বীর্য অথচ এতখানি মাধুর্য মানুষের কঠে থাকতে পারে। প্রাচীন কালের Cicero, Demosthenes—এর কথা পড়েছি—ফরাসীর বিরোধে, দাণ্ডন—বিনাতের Burke, Gladstone—এর গুণকীর্তনও ওনেছি—কিন্তু স্বকর্ণে ওই ভারতীয় মানুষী কঠের সঙ্গে পরিচয় একটা অভিজ্ঞতা। আজকাল হাজারটি মানুষকে শোনাতে হলে ‘মাইক’ ছাড়া গতাত্তর নাই—সেখানে ৮৭ টাকার লোক অবলীলাক্রমে ওনেতে পেত এই সব লোকোত্তর কঠ। বেশি বুনে যাওয়া কেন? তখনই সাহানার কঠ ওনেত—সে যুগে যে-কঠ ব্রহ্মাঙ্গনাথের প্রাণ-মন কেড়ে নিয়েছিল। আর একটা মহার কাচিনী বলি তবে এখানে—বটনাটা হয়েছিল যদিও অনেক পদে। একটা গানের আসর—চিলীপের কোন আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ী, খুব সম্ভব তার নামার বাড়ীতে। আমিও নিমন্ত্রিত। বেশ লোক ওনেছে। গাইয়ে ছিল একজন ওস্তাদ—নাম আমার ননে নাই—বেশ বিখ্যাত ধরনের ওস্তাদ আর সাহানা। কথা উঠল কার গান আগে হবে—সাহানার না ওস্তাদের। দিক হল আগে সাহানারই হোক, তাইপল ওস্তাদ। ওস্তাদের হার শু শেষে! সাহানার গান হল। ওস্তাদের পান। এল। ওস্তাদ বলে বসলেন, এরপর আর আমার গান চলে না! অবশ্য তিনি গান গেয়েছিলেন পরে। তে হি মো শিবসা গতা: ॥

রাক, সূত্র ধরি আবার তবে। চুটিতে কিরে এসেছি নিচ্ছের বাড়ীতে, রংপুরে। এখানেও ওই একই আশোলন, আশোলনের ওই একই নুতি। রাত্তর ঘাটে গান গেয়ে অর্ধাং চৌরিরে গলা ফাটিয়ে বেড়িয়েছি, প্রভাতফেরী কবেছি—

“জাগ জাবতমাসীয়ে কত বুনে হবে রে”, ইত্যাদি ইত্যাদি।

একদিন বিশেষ প্রতিজ্ঞার দিন এল—খুব সম্ভব অক্টোবরে। সেদিন অরুচন হবে, কোন বাড়ী থেকে বেঁচো উঠবে না—বে বাড়ীতে বেঁচো উঠবে তাকে কোনো দাগ দিবে রাখতে হবে, লেশম্রোহী বলে। আমি সেদিন একেবারে নির্জনা উপবাস করি—জীবনে ওই একদিন ও-কাজ করেছি, প্রথম ও শেষ। চব্বিশ ঘন্টা এক কোটা ভ্রম পর্যন্ত গৃহণ করি নি। কিন্তু তাই বলে বলেও থাকি নি, রাত্তর রাত্তর ‘বলে মাতরন’ করে বেড়িয়েছি নিজিলের সঙ্গে সঙ্গে। প্রাণে বে উৎসাহ উকীপনা তাতে কোন কিছুই তোয়াক্কা রাখে না।

একদিনের একটু বিশেষত্বপূর্ণ ঘটনা। সহরে চকুম জারি হয়েছে—সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে কয়েকজন নেতৃগণীয়দের উপর প্রবেশন করতে বাধা দেয়। কেউ বেন বিছিল বেন না করে বা উত্তেজিত না দেয়। চকুম অমান্য করে চকুম অমান্য করাটাই ছিল করণীয় কর্মপুত্রির অতর্কিত তখনকার দিনে, ছেনেদের গল বেরিয়ে পড়েছে, রাজ্যের রাজ্যের গান গেয়ে চলেছে। কিন্তু ওই পর্বত, কোন রকম শান্তি-ভাঙ্গ হওয়ার কারণ ঘটে নাই—চৌকানিতে যেটুকু শান্তি ব্যাহত হয় সেইটুকু বাদ—জুও 'বলেনমানব' শব্দটির লড়াইয়ের হিংসার চিত্রের প্রতীক, সরাসরি চক্রে। জাই পুলিশ মোড়ে এল আবারের পিছনে, চকুম দিল খসে পড়তে। আবার সদর রাজ্য থেকে বেনে, পাশে একটা খোলা মাঠে, কতকটা বাগানের মত জায়গায় জড় হলান। অনেক চলেও গেল। প'খানেক সেখানে বসে পড়ল—যাণিও হয়ে গেলাম তাঁর মধ্যে। রাইচরণ দারোগা বীরবিক্রমে এসে পড়লেন, সঙ্গে কয়েকজন কনেষ্টেবল। আবারের এক এক জনের মাথার হাত দিয়ে বলে চললেন তাঁর রাজকীয় ইংরেজীতে, তুমি arrest, তুমি arrest। আবারের নিয়ে বাগড়া হল ব্যাঙ্কিষ্টেরে কুঠিতে। বেলা পড়িয়ে এলে আবারের কেইন-এ কালান দেওয়া হল। কোর্টে বোকাফনা উঠল। আবারের গলের নেতা, ring leader, হলেন অতুল গুপ্ত। আবারের উকিল বললেন অতুল গুপ্ত একজন বিশিষ্ট পদ্ম ব্যক্তি (তিনি তখন এন এ পড়তেন) সুতরাং তাঁকে আসামীর কাঠগড়ার পাড় করিয়ে না রেখে একথানা চেয়ার দেওয়া উচিত। ব্যাঙ্কিষ্টেট সাহেব কর্পাস করলেন না এ-অজুহাতে, লাকচ করে দিলেন। অতুল গুপ্তের পিতা ছিলেন একজন স্বদেশী নেতা সহরের, তাঁর বাড়ীতে প্রবেশন-নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। সুতরাং অতুল গুপ্তের অপরাধের নাজা শিগুণ শিগুণ হয়ে গেল—তিনি শিকিত, তিনি নেতৃগণীয়, জেনেজনে সজ্ঞানে খেচরার সব করেছেন। সুতরাং তাঁর শান্তি হল সবচেয়ে বেশি—একশ' টাকা জরিমানা। এই রকমে তিনি লাগী হয়ে পড়লেন এবং ভবিষ্যৎ-জীবনে যখন তাঁর হাইকোর্টের জজ হওয়ার কথা উঠল তখন তাঁর বিরুদ্ধে উঠে ধাঁড়াল এই দাপ। তিনি জজ হতে পারলেন না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে—হয়ে গেলেন উকিল হয়ে। কিন্তু এতে তাঁর কিছুনাশ ক্ষতি হয় নাই, না পদমর্যাদার, না অর্থপৌরবে। আবারের মধ্যে আর এক জন ছিলেন, তিনি ছিলেন থাকে আবার বলতাম চৌ চৌ কোম্পানীর মেয়র অর্থাৎ পড়াশুনা কাজকর্ম কিছু করতেন না, আবারের চেয়ে বরষে বেশ কিছু বড়। তাঁকে কোর্ট জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি কর?" উত্তরে তিনি তাঁর বাহাদুর নরীনা লোষণা করে বললেন, "General merchant," ব্যাঙ্কিষ্টেট জাই তাঁর কথার মাগেই তাঁকে খুঁকে দিলেন পকাশ টাকা জরিমানা। পকাশ টাকা। বোকারীর পাঁচ পরসারও সংস্থান নাই। আর আবার হরত কিছুই হত না, নগণ্য বালক বলে—কিন্তু হয়ে গেল পঁচিশ টাকা জরিমানা। হেতু এই, আবারকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল আবার সরকারী হুকুমের কথা জানতাম কি না, আবার অবদীনাভাবে উত্তর দিয়েছি 'জানতাম বৈ কি'।

জেনেওনে আইন অনান্য কথা ! আমার অপরাধ কনাই নয় । পলে আলিপুর বোমার নামলায় আমার বিরুদ্ধে এই ঘটনাটি সবকারী পক্ষ দাঁড় করান, আমি 'দাগী' চোর' প্রমাণ করবার জন্য । কিন্তু আলীপুরের জজ বাচস্পতি আমার উপর কেবল দুই তুই হয়েছিলেন । তিনি ও-কথাটা গ্রাহ্য করলেন না, উড়িয়ে দিলেন এই বলে schoolboy bravado । বাহোব সেদিন আমার এই স্বীকারোক্তি অনেক বুঝতা নান দিয়েছিল । ওধু বলতান যদি 'সরকারী চকুনের কথা আমি জানতান না কিছু,' তবে নিবিবাসে খানান পেয়ে যেতান । আমি উত্তরে কনছি, একটা সংকর বৃহৎ কর্তব্য করতে বাচ্ছি, তার গোড়াতেই আরম্ভ করব বিখ্যা দিয়ে !

রাইচরণ দারোগার নান উল্লেখ করেছি ; কিন্তু সানান্য দারোগা হলোও তিনি ছিলেন একজন interesting, colourful personality—আর শক্ত মানুষ বলে তাঁর প্রভাব প্রভাপও তিন বেশ । সামানের তখাকথিত 'arrest' করবার পরেই, আমার পরিচয় যখন পেলেন, বলে উঠলেন, “আরে, তুই ব্রজবী বাবুর ছেলে, বলনি না কেন, আগে জাননে ছেড়ে বিতান—এখন ত কিছু করবার নাই ।” তিনি আমার পিতার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন, নিলকানারীতেও তিনি দারোগা ছিলেন । বনছি রাইচরণ দারোগা ছিলেন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানুষ, তাঁর ছবি আমার চোখের সম্মুখে ভাসছে : চলেছেন ষোড়ার চড়ে টমকিয়ে, বুক ফুলিয়ে, পিছুনে তাঁর অশ্বের পুচ্ছ প্রসারিত, সম্মুখে তাঁর নিজের আবকলখিত ‘মশু’ বাহ্যানে ষিখাভিনু বিস্ফারিত । রাইচরণ দারোগার অশ্ববনও ছিল সুবিখ্যাত পৌড়ের ষোড়া । রংপুরের বিরাট বরলানে (আমা বলতান কানেক্টরীর নাঠ) ষোড়ালৈড হত মাঝে মাঝে । তাতে রাইচরণ দারোগার ষোড়াই সর্বপ্রথম হত, তিনি নিজেই ছিলেন Jockey ।

এই ভাবেই জীবনে পেয়ে গেলাম নব দীক্ষা এক ।

অনতিবিলম্বেই দেখতে পেলাম মনটা একমন হুবে গিয়েছে, চাত্রজীবনে নন নেই, সাধারণ জীবনে নন নেই । দেশের সেবক, মায়ের সন্তান হতে হবে চিরদিনের জন্য, এই লক্ষ্য ও সাধনা একমাত্র । তা হলো ?

ভায়েন সব ছাড়তে হবে । ছাত্রজীবন ত বটেই, পিতা-মাতা তাই-বোন সব । আমার যে এই পণ, এই যে অনঘো দিচ্চাম, নন হল পিতামাতাকে জানান কর্তব্য । কিছু না আনিবে, হঠাৎ কিছু করে ফেলা, কৃতবৃত্তা হবে বনে হল । পূর্বপানীরা বলে গিয়েছেন বটে, যবহরেববিরক্ষেণ তবহরেব প্রতিক্ষেণ । যে নুহুর্তে জোনার বৈশাগ্যের উদয় হবে সেই নুহুর্তেই বের হয়ে পড়বে । বুদ্ধ তাই করেছিলেন, চৈতন্যও তাই করেছিলেন, তবে শক্ত তাঁর মায়ের সঙ্গে একটা বোখাপড়া করতে চেয়েছিলেন প্রথমে ।

আমার মনে হল ভাদি তবে কথাটা পিতৃমেবের কাছে । দৃশ্যটা স্পষ্ট নন আছে । আমি তৃতীয় বাধিকে পড়ি, বরেন সডেরো হবে, নেহাৎ ছোট নয় । একদিন রাত্রিতে

বাঙালী-শাওয়ান পালে, শিহুসেব বিজানায় ওয়ে আছেন, আমিও পাশে এসে বসলাম। দৃঢ় সম্বরণ করেছি নবব, তবুও ইচ্ছাতঃ করছি কি-ভাবে কি-ভাবে বলি কথাটা। বলতে পারি না, “আমি সংসার চেড়েছুড়ে বেশেব কাজ করতে বেরিয়ে পড়ছি।” চোখকান বুজে বললাম কথাটা এইভাবে, শিহুসেবকে খুবই সসীহ কর্তান আমবা, “আমি প্রেসি-ডেন্সীতে আর পড়ব না, পড়ব National College-এ।” তখন ছাত্রী বিদ্যালয়ে যোগদানের একটা চিঠিক পড়েছিল, তাই ব্যাপারটা ওই ভাবে least offensive হবে মনে হয়েছিল। ওই একটি বাক্য বলেই আমি ছুপ। শিহুসেব ওনে আরত্ব করলেন তাঁর ভাষণ “যা করবে খুব ভেবেচিন্তে করবে। হঠাৎ কোকের মাথা দিছু করবে না। পরে তাতে অনুশোচনা অনুতাপ আসতে পারে। প্রথমত্ব হবে রাখবে তুনি কোর্ট, আবার বৃদ্ধ হতে চলেছি, তোমার ছোট ছোট ভাই কোন সব আছে, তাঁদের ভার তোমারই নেওয়া কর্তব্য, তা না হলে তারা পথে গিয়ে দাঁড়াবে। তারপর দ্বিতীয় কথা, তনি বেশেব কাজ করতে চাও, সে ত ভাল কথা, আমি ত বাধা দিই না। তবে তুনি যদি মানুষের মত মানুষ হয়ে দাঁড়াও, শিক্ষার ও পাবে, তবে ত আরো ভাল কাজ বড় কাজ করতে পারবে, তোমার শিক্ষালীকার বেশ হতে ত বেশি সেরী নেই, দুই ডিমটা বংসর। পক্ষ হলে তুনি কেবল সামান্য কবী নয়, leader হতে পারবে তোমার বিদ্যা দিয়ে বৃদ্ধি দিয়ে। সেখনা যতুন গুপ্ত—সে ত পড়াচনা ছাড়ে নি, এই এন এ পাশ করল, ন’ পড়তে, মান যণ হয়েচে, লোকের মত লোক হয়ে বেশেব কাজ চলগুণ ভাল করতে পারবে। তারপর আরো কথা, তোমার যদি সস্তা সস্তা বৈবাণ্য চলে থাকে, শঙ্কলের মত কি চৈতন্যের মত, তাহলে অন্য কথা, সে ত আমাদের সংসারের গৌরবের কথা হবে। কিন্তু ভাল করে নিজেকে দেখেওনে নিও সে সামর্থ্য। সে যোগ্যতা তোমার হয়েচে কি? হঠাৎ যেমান যদি চর তা, তবে ত পরে দুঃসের সীনা থাকবে না...”

এই বকন আরো দিছু বললেন। আমি নির্বাক নিস্তব্ধ প্রত্যবসায়ের মত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বৃদ্ধ, আমার যা বলবার বলেছি, আমার কর্তব্য করেছি। আর যা সিদ্ধান্ত তা দ্বির অটুি, বাবচচত্ৰস্বিকারী।

মনে পড়ল পার্বতীর কথা (কালিদাসের কুমারসম্ভবে)। ছদ্মবেশে এসে মহাদেব পার্বতীর মন ভূলাতে চেষ্টা করছেন, বলছেন, “তুনি যাকে পঙ্কল করেচ, সে একটা ভূত, একটা প্রেত, একটা নোঃা চানোরায়, তোমার কি পোতা পায় এমন একটা হয়ে হীন স্বীচীতাকে পত্ররূপে গ্রহণ করা ?” পার্বতী বলছেন উত্তরে, “তুনি বাই বল না কেন, মন আমার বলে গিয়েছে, আর উলছে না।” ভাবের এক-রসে স্থিতি লাভ করেছে সে মন, দ্বিতীয় প্রতি নাই তার, সমাত্র ভাবৈকরসঃ মনঃ স্থিতঃ।*

* আত্মসের মালক-মালিকানের দ্বারা পঠিত।



যোগসম্বন্ধ-প্রসঙ্গ

অনির্বাণ

[দ্বিতীয় পাদ—স্বাধ্ব-জ্ঞানযোগ]

২৫

পরী ও অপরা বিজ্ঞা

এতদূর এসে জ্ঞানযোগের পরিচিতি শেষ হল। এখন তার লোকের একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আনুমানিক করেকটি বিষয়ের আলোচনার পর এ-প্রসঙ্গে বাক্তি চানব।

জ্ঞানযোগের প্রধান লক্ষ্য ব্রহ্মোপলব্ধি। অথও অনন্ত স্বভাৱ চৈতন্য আনন্দ এবং শক্তি হল ব্রহ্মের স্বরূপ। উপলব্ধির স্বরূপ হল তাঁতে আবিষ্ট হওয়া এবং তাঁর স্বাভাৱ আবিষ্ট হওয়া। উপলব্ধি শুধু লোকোত্তরে নয়, লোকেও। এইখানেই ব্রহ্মকে সন্তোষ করতে হবে সেদে প্রাণ মন এবং অভিমান্য বিজ্ঞান দিয়ে। বিশেষ বচন বেলার অনুভব করতে হবে সেই এককে, অনুভব করতে হবে নিজেকে। অনুভব হবে অর্থও—সত্ত্ব-রজ-তামস-রূপ-অরূপে সাত্ত্ব-অনন্তে স্পন্দ-অস্পন্দে কোনও বিরোধ থাকবে না।

দ্বিতীয় লক্ষ্য হল, এই উপলব্ধির ফলে প্রসূতির রূপান্তর। চাই শুধু সামুদ্যানুভূতি নয়, সাধনানুভূতি। ব্রহ্মকে পেয়ে সর্বতোভাবে ব্রহ্ম হতে চাই—এইখানে। সেন-প্রাণ-মনোরূপ বিগ্রহকে করতে চাই সৎ-চিত্ত-আনন্দধন, ব্রহ্মের বিভূতি এবং বিনাশ। স্বাভাৱ জেলে হয়ে সাত্ত্বসত্তা স্বাভাবিকের সকল মহলে ওষ্ঠা-মানার নিরন্তর স্বাচর্য্য অর্জন করতে চাই। এক কথাই, ব্রহ্মের অনুভবে এবং আবেশে চাই এই জীবনেরই দীর্ঘ রূপান্তর।

এই হল আশাদের লক্ষ্য। লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় কি, তা নিয়ে সবিশেষ আলোচনাও করেছি। কিন্তু জ্ঞানযোগের একটা দিকের কথা এখনও বলা হয়নি, এইবার তা বলব।

*

*

উপনিষদে দুটি বিদ্যার কথা আছে—পরী এবং অপরা। অপরা বিদ্যার ভগবৎকে জানা যায়—যাইরে রেখে, বৃদ্ধি দিয়ে; আর পরী বিদ্যার ভগবৎকে পরমতরকে জানা যায়—অন্তরে, বোধি দিয়ে। সাধারণত দুটি বিদ্যার মাঝে একটা বিরোধ করণা করা হয় : বলা হয়, পরী বিদ্যার অনুশীলনই আশাদের একমাত্র পুরুষার্ধ, অপরা বিদ্যার চর্চা নিরর্থক। কিন্তু

বস্তুত সব বিদ্যার লক্ষ্য সেই পরমতত্ত্বের পোঁছনো। বিশুদ্ধে ধৰ্মে জ্ঞানের অনশীলন করতে-
করতেই মানুষ বুদ্ধির পলিপাকে বোঁকে বিশুদ্ধতত্ত্বের দিকে। বিজ্ঞানী অপর বিদ্যাকেও
জানবেন পরা বিদ্যার সোপান এবং বিভূতি বলে।

অপর বিদ্যার নোটাবলী বিষয় হল ভূতবিদ্যা (জড়কে তিষ্ঠি করে প্রাণ ও মনের
তত্ত্বানুসন্ধানও এর অন্তর্গত বলে ধরা যেতে পারে), ধর্মনীতি, দর্শন, কলাবিদ্যা, ইতিহাস
এবং প্রত্নতাত্ত্বিক। প্রত্যেকটি বিদ্যার লক্ষ্য হল আমাদের বিক্ষিপ্ত অনুভবের মাঝে
একটা সামরাসাদান, বহুর মাঝে একটা এককের সূত্র আবিষ্কার করা এবং সেই সূত্রের সহায়ে
অন্তরে-বাইরে প্রাকৃত শক্তিকে শাসনে আনা। মানুষ এইটি সম্পন্ন করে বুদ্ধির অভিনিবেশ
দিয়ে। আগেই বলেছি, বুদ্ধির প্রধান সাধন হল সানানাত্তান। সানানাত্তান যেন বহু
বিশেষের আধাররূপে এককে আবিষ্কার করে, তেননি আবার বিশেষের বিভিন্ন বর্ণের
(group) মাঝে অন্যান্যসম্বন্ধও স্থাপন করে। অধুনা প্রাকৃত বিজ্ঞান এই কাজটিই করছে :
তার সাধনাও মুখ্যতঃ অশ্বতের সাধনা। প্রাকৃত দর্শনও আত্মকাল এই বিজ্ঞানেরই অনুগামী।
বিশুদ্ধতত্ত্বকে যদি পরব্রহ্ম বলি আর বিশুদ্ধে বলি অপরব্রহ্ম, তাহলে প্রাকৃত বিজ্ঞান ও দর্শনের
অনশীলনকে বলতে পারি অপরব্রহ্মবিদ্যার অনশীলন। পর এবং অপর উভয় ব্রহ্মকেই
জানতে হবে। সানানের প্রাকৃত জীবনে অপরব্রহ্মের প্রকাশ। প্রাকৃত জীবনকে মানবা
যেন আঁকড়ে থাকতে চাই না, তেননি তাকে বাদ দিতেও চাই না —চাই তার দিবা রূপান্তর।
সুতরাং জ্ঞানযোগের মাঝে অপরব্রহ্মবিদ্যা বা অপর বিদ্যারও একটা স্থান আছে। জীবনে
সে অভ্যাসের সাধক। অভ্যাসকে যুক্ত করতে হবে নিঃশেষের সঙ্গে, অপরবিদ্যার চক্ষকে
নেলাতে হবে পরা বিদ্যার চক্ষের সঙ্গে। বিদ্যা এবং জীবনের সাধনা অনেকই পূর্ণ হবে।

*

*

পূর্ণতার সাধনায় অপর বিদ্যা হবে পরা বিদ্যার অনুগামী। মুখ্যতঃ চেতনার
বিস্তৃতি চতে অপর বিদ্যার উদ্ভব। তার একটা মূল্য আছে বই কি। কিন্তু চেতনার
অন্তরাবৃত্তি চতে উদ্ভূত সে পরা বিদ্যা, তার মূল্য তার চাইতেও বেশী। মানুষের সার্বক
সাম্রাজ্য বাইরে নয়, অস্তরে। পাইরের ঐশ্বর্যে অস্তর যদি দেউলিয়া হয়ে যায়, তবেই সর্বনাশ।
জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টাকে অস্তরের চক্ষে না গাঁপতে পারলে কল্যাণ নাই। অপর বিদ্যার
বহুল অনুশাসনে মানবা যুক্ত এবং মনস্বান্ সবার্জই গড়ব, সানানের লক্ষ্য শুধু এই নয়।
আবরা গড়ব যোগ্যের সনাক্ত। জীবনে যোগের প্রয়োগ না হলে জীবন অপূর্ণ।

পর বিদ্যা অজিত চর যোগের পথে। তার সাধন আধারত্বই একাগ্রতা এবং
সামুদ্র্যবোধ। এদের নিয়ে বিদ্বৃত আনোচনা আগেই করেছি। হাগ যের আর সোহ
হল চিত্তের মন। সনাসক্তি তিষ্ঠিকা ও নিত্যসমন্বিততার দ্বারা এই হল মূর্ত করতে হবে।
প্রভাষের নির্বল চিত্ত আপনা চতেই তখন অন্তরাবৃত্ত হব চেতনার উর্ধ্বতন ভূমিতে স্থিতি
এবং সমাধিত হবে। সমাধিত হতে আসবে চেতনার উর্ধ্বারন এবং পরমতত্ত্বের সঙ্গে

সাব্যস্ত। সাব্যস্তাবোধের পরিপাক প্রকৃতির রূপান্তর—যেননা আগনের যাবোনে উদ্ভবের আগুন হয়ে যাওয়া। এই হল পরা বিদ্যার সিদ্ধি। এই সিদ্ধিই আনন্দের পন্থা পুরুষার্থ। অন্যান্য সিদ্ধি এর অতীত হলেই আনন্দের কল্যাণ। আরি বুদ্ধির বৈজ্ঞানিক দার্শনিক সাহিত্যিক শিল্পী মানবদয়ী সকলিছুই হতে পারি। কিন্তু মানুষ যদি না হতে পারি, মানুষের সেয়া মানুষ যোগী না হতে পারি, তাহলে সবই ব্যা।

অপর বিদ্যার অনুশীলনকে তাই করতে হবে পরা বিদ্যার অনুগামী। সব বিদ্যাই পবিত্র, সবার মাঝেই বুঝলে পরে চেতনার উন্মোচনের সজ্জিত পাওয়া যায়। প্রাকৃত বিজ্ঞান যারাকে নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু করতে পারে, দর্শন আনতে পারে চিত্তের উপারজা এবং বৈশ্ব, কনার অনুশীলনে স্বপ্নের উপাসনার চিত্ত নির্বল এবং ভ্রমের হতে পারে, সেবার ভাব ও সজ্জাপের তত্ত্ব ঘটতে পারে। এক কথায়, প্রাণ ও মনের কে-কোনও বৃত্তির অনুশীলনকে উৎসাহিত করে যথায় যোগসিদ্ধির অনুকূল করা যেতে পারে। তা তো আমরা করবই, অধিকন্তু অস্তর্যন্ত একাগ্রতায় পথে আত্মানুসন্ধানেরও তৎপর হব। জ্ঞানবিশ্বকে, জ্ঞানবিশ্বকে, জ্ঞানবিশ্বকে। বিশ্ণুভীত বিজ্ঞানে আত্মজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে জীবনকে অত্যাশ্রয়ে সদ্ধ এবং নিঃশ্রেয়সে চিন্তন করব।

কি সাধনার কি সিদ্ধিতে, পূর্ণযোগ অপর এবং পরা বিদ্যার মাঝে বিরোধের কোনও দ্বন্দ্বাবনা দেখতে পার না। পরা বিদ্যার একান্ত সাধক বলেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। তেননি অপর বিদ্যার একান্ত সাধকও বলেন, জগৎই সত্য, ব্রহ্ম একটা আনন্দ। দুইই একদেশনীর কথা। বস্তুত জগৎও সত্য ব্রহ্মও সত্য, ব্রহ্মের সত্যতায় সিদ্ধান্তের কাছে জগৎ আরও গভীরভাবে সত্য। সুতরাং জগৎজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান দুইই আনন্দের পুরুষার্থ। জগৎজ্ঞান হতেই আমরা ব্রহ্মজ্ঞানে পৌঁছতে পারি যদি চিত্তপ্রকর্ষকে তার লক্ষ্য করি। অপর বিদ্যার চরম চর দর্শন—জগৎদর্শন এবং জীবনদর্শন। বিদ্যার অনুশীলনে বুদ্ধির তত্ত্ব এবং দীপ্তিতে আমরা যদি এক সর্বসমস্ত অধৈতভাবে পৌঁছতে পারি, তাহলে সেই দর্শনই আনন্দের সামনে পরা বিদ্যার পথ উন্মুক্ত করে দেবে। তেননি পরা বিদ্যার সিদ্ধি দৃষ্টি যদি অপর বিদ্যার সকল বিভাগে সংক্রামিত হয়, দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্য শিল্প প্রভৃতির ভাবনা যদি যোগচেতনা হতে উৎসারিত হয়, তাহলেই তারা মানুষের যথার্থ অভ্যুদয়ের সাধক হতে পারে। অভ্যুদয় তখন আর নিঃশ্রেয়সের সাধক নয়, তার সাধক এবং সিদ্ধ পরিণাম।

২৬

সমাধি

বিজ্ঞানভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া জ্ঞানবোধের লক্ষ্য। বিজ্ঞান মনের ওপাশে। স্বতন্ত্রা এখেকে ধারণা হতে পারে, মনোবল ছাড়া কেউ বিজ্ঞানে পৌঁছতে পারে না।

মনোমনের অনেক নাম সন্নাধি। সাধারণত তাকে জ্ঞানযোগ, রাসযোগ এবং হঠযোগের অপরিহার্য সাধন বলে ধরা হয়—যদিও সন্নাধি বস্তুত রাসযোগেরই একটি অঙ্গ। সন্নাধি ভক্তিব্যোগের শাক্যং লক্ষ্য না হলেও তাবাবশ্যে আত্মহারা হওয়াকে ভক্তেরাও একটা বিশেষ অর্থ্যাদা দেন। মোটের উপর এদেশের সবচেঁ সাধকের কাছেই সন্নাধি একটা মন্ত্র আকর্ষণ।

প্রশ্ন হলে, পূর্ণযোগে সন্নাধির স্থান কোথায়? আত্মহারা হবার চরণে ভুলে যাওয়াই যদি সন্নাধির একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহলে দেখতেই পাচ্ছি, সন্নাধি কখনও পূর্ণযোগীর চরম লক্ষ্য হতে পারে না—যদিও তাকে কেতবিশেষে যোগাঙ্গ বলে মানতে তাঁর আপত্তি নাই। পূর্ণযোগী চান জীবনে এবং জগতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে। ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য চেতনাকে উৎখাত করা নিশ্চয় প্রয়োজন; কিন্তু আগেও বলেছি, উৎক্ষেপ ছাড়াও তার পথ আছে। আশরের (inner depth) কোনও সংস্কারকে উন্মূলিত করবার জন্য উৎক্ষেপের সাময়িক প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু একান্ত উৎক্ষেপের দ্বারা জগৎ থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়া পূর্ণযোগের লক্ষ্য নয়। তাছাড়া একথাও মনে রাখতে হবে, সন্নাধিরও প্রকারভেদ আছে, নিরোধসন্নাধিই একমাত্র সন্নাধি নয়।

*

*

বলেছি, চেতনার যন্ত্রাবস্থা বা প্রত্যাহার দ্বতেই যোগের ভিত্তি। লক্ষ্য কবলে দেখা যাবে, আনন্দের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রত্যাহারের ক্রিয়া প্রতিদিনই হচ্ছে। আনন্দের বতকণ ভোগে থাকি, ততক্ষণ চেতনার বেশির ভাগ বাইরে ছড়িয়ে থাকে—যদিও নিজেদেরই প্রত্যেক এর মধ্যে সানিক্ত। চেতনাকে আনন্দের ভিতরে ওঠিয়ে আনি (যেন ভাষনা স্মৃতি মস্তিষ্কবিশেষ ইত্যাদিতে)। কিন্তু আনন্দের সারাক্ষণ জেগে থাকি না। ভাগ্যবশতের পর আসে নিদ্রা। তার দুটি স্থর—প্রথমটি স্বপ্ন, দ্বিতীয়টি স্মৃতি। নিদ্রাতে চেতনা অস্তর্য-বৃত্ত হয়। স্মৃতিতেও একলক্ষণ অস্পষ্ট বোধ থাকে, জাগ্রতে আনন্দের তার নিশানা পাই সৈদ্যস্মৃতিতে (organic memory)। বিদ্যুৎ বোধকে ধরে তাহলে আনন্দের চেতনার চারটি স্থর পাই—জাগ্রৎ স্বপ্ন স্মৃতি এবং তুরীয়। প্রাকৃত চেতনার প্রথম তিনটির অনুভব সবাই পায়, শেষবারটির অনুভব স্পষ্ট হয় যোগচেতনার।

নিদ্রা-ভাগরণে চেতনার এই স্বাভাবিক অস্তর্যাবস্থা আর বহিরাবৃত্তিকে যোগের প্রয়ো-জনে লাগানো উপনিষদের ধর্মদের একটি অনন্য কীর্তি। তাঁদের শ্রমের নিদ্রা হল স্বাভাবিক সন্নাধিব্রতি। জাগ্রতে আনন্দের বিবিধ বোধ অস্পষ্ট; তাকে যদি নিদ্রাতেও সংক্রান্তি করা যায়, তাহলে তা-ই হবে যোগের সন্নাধি। জাগ্রতেও কোনও একটা বিষয়ে তন্ময় হয়ে আনন্দের বাস্তবজ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারি; এ-অবস্থাটা স্বপ্নের মতন। তন্ময়তা আরও গাঢ় হলে নিজেদেরও যদি হারিয়ে ফেলি, তাহলে অবস্থাটা হবে স্মৃতির মতন। তাহলে সন্নাধির পথ হল বস্তুত জেগে ঘুমানোর পথ। জাগ্রতে বোধ বধন স্পষ্ট থাকে, তখন অস্তর্যবৃত্ত সানিক্তাবনার দ্বারা আত্মচেতনাকে খুব স্পষ্ট করে তুললে তাকে প্রাকৃত

স্বপ্ন এবং স্মৃতিভিত্তিক বস্তু বাধা চলে। যোগের ভাষায় তাকেই বলে 'ত্রিমু চতুর্থ' অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং স্মৃতি এই তিনটি অবস্থার মাঝে তৃতীয় বা চতুর্থ অবস্থাকে 'অনিদ্র' বা অসুপ্ত বাধা।

এর আগে কে-কোশের কথা বলেছি, তাদের সঙ্গে এই অবস্থাগুলির সঙ্গতি আছে। পুরুষ বধন অনুসর কোশে, তখন তাঁর জাগ্রৎ অবস্থা। বধন তিনি শ্রাবনই এবং মনোমর কোশে, তখন তাঁর স্বপ্নাবস্থা। আর বিজ্ঞানবর এবং মানসবর কোশে স্মৃতিপ্রবস্থা। সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখতে গেলে স্বপ্নচেতনার দুটি ভাগ—একটি মনের অধিকারে, আরেকটি বিজ্ঞানের অধিকারে। যোগেরটির সঙ্গে মানবা পরিচিত, এতে বাবুলি স্বপ্নগুলি জোটে। দ্বিতীয় বরনের স্বপ্ন ফোটে অসুপ্তচেতনার, যাতে কোনও তথ্য বা তত্ত্বের সঞ্চার হয়। পাঁচটি কোশের উপর উপনিষদের আছে তিরন্দর কোশের কথা, যাতে আর্যচেতনা বা ব্রহ্মচেতনা বা তুরীয়েচেতনার অধিষ্ঠান। গোড়া নেতিবাচী যোগ, তুরীয়েচেতনা তাঁদের নক্ষা, সেখান থেকে তাঁরা আর ফিরে আসতে চান না। বেদান্তে একে বলে 'অনাবৃতি'। উপনিষদে কিন্তু চারটি অবস্থা। নিয়েই আমরা বলা হয়েছে চতুর্থাৎ : জাগ্রতে তিনি বৈশ্বানর, স্বপ্নে ভৈরব, স্মৃতিতে সর্বেশ্বর সর্ববোধি প্রাজ্ঞ আর তুরীয়ে শিবস্বরূপ। চতুর্থাৎ মানে 'চারপো' বা পূর্ণ। শিবের আত্মশক্তির তিনটি পরিণাম, শিব-শক্তি যুগলই।

*

*

নিদ্রাতে মানবা হাটলে সর্বাধির আভাস পাই। কিন্তু নিদ্রা অবশ আর সর্বাধি স্ববশ, নিদ্রা মন্ডান আর সর্বাধি বিজ্ঞান, নিদ্রাতে চেতনার কোনও উৎসর্গ ঘটে না কিন্তু সর্বাধিতে ঘটে—এইগুলি হল নিদ্রার সঙ্গে সর্বাধির পার্থক্য। যোগনিদ্রাতে দু'রকমের সর্বাধি হতে পারে—স্বপ্নসর্বাধি আর স্মৃতিসর্বাধি। একটির পরিণামকে অবশেষে দেখা দেয় জাগ্রৎ-সর্বাধি বা সচক্ষুসর্বাধি। সংক্ষেপে এদের পরিচয় দিচ্ছি।

প্রাকৃত স্বপ্নে আর যৌগিক স্বপ্নে তফাত আছে। যোগেরটির উৎস হল প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের গান। চিন্তা। একসময় এসব স্বপ্নকে অনুলব মনে করা হত, কিন্তু মনো-বিজ্ঞান এখন তাদেরও মূল আবিষ্কার করেছেন আনন্দের অবিস্মৃতিচক্র ধারণের মধ্যে। কিন্তু যৌগিক স্বপ্ন এরবনের নয়। স্বপ্ন তখন অজ্ঞানের খোঁজালুপুপু নয়, বিজ্ঞানের স্ফুটি। চেতনার জাগ্রৎ ভূমিতে যেমন মানবা তথ্য এবং তথ্যকে জানি ও ব্যবহার করি সজ্ঞানে, স্বপ্ন-ভূমিতেও তেমনি করা যায়। যৌগিক স্বপ্নচেতনার বা স্বপ্নসর্বাধিতে প্রথমত বাইরের জগতের সঙ্গে কোনও যোগ থাকে না, সাধকের মাঝে কুটে ওঠে নিভেরই অন্তঃচেতনা অথবা ভাবলোক এবং তাদেরই তথ্য ও তথ্য নিয়ে তার কারবার চলে। কিন্তু বিজ্ঞানের স্ফুটি অব্যাহত এবং স্ফুটিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়শক্তিরও স্ফুটি হয়। তখন জা দিগের বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। তখন সাধকের মধ্যে পুরুষপন পুরুষপন প্রদর্শন আবেশন ইত্যাদি নানাব্যবহারের জ্ঞান-ও ক্রিয়া-বিভূতির স্ফুটন হয়। প্রাকৃত

চেতনা ট্রান্সনির্ভর বলে অতীন্দ্রিয়ের প্রগাঢ় অপবোধানুভব তার হয় না, সে এই লৌকিক ভূমি এবং তার আশেপাশেই বিচরণ করে। কিন্তু স্বপ্নসমাধিতে চেতনা বুদ্ধি পায় নোকো-ন্ডরে, অতীন্দ্রিয় অধিচেতন (subliminal) এবং পরিচেতন (circumconscient) ভূমির দ্বারা তার কাছে বুলে যায়। এইসব ভূমি থেকে লৌকিক ভূমির প্রশাসনও তখন আর যোগীর পক্ষে অসাধ্য হয় না, কেননা বিজ্ঞান বস্তুত প্রজ্ঞা-বীৰ্য, জ্ঞানের সঙ্গে শক্তি সেখানে সুগন্ধ হয়ে আছে। অতএব ইচ্ছা করলেই স্বপ্নের ছন্দে তার প্রয়োগ করা চলে।

তবে এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল। বিভূতির প্রয়োগ বস্তুত যোগের না হলেও ঐশ্বরের খেলায় বেতে বাওয়া কিন্তু যোগের লক্ষ্য নয়। যোগীশ্বরের পিছনে ছোটো সূক্ষ্ম অহংএই পরিতর্পণ; ওতে অস্তরের অন্তরচাই পুশুর পাথ, বিঘাতাবের উন্মেষ হয় না। শক্তি চাই বই কি—কিন্তু চাই নতু হরে, শুভ্র হয়ে নয়। যোগের সাধনার শক্তির অন্তরা-বর্ডনের ফলে ঐশ্বরের প্রকাশ হবেই, কিন্তু তাকে হস্ত্য করে আমাদের সহজ হতে হবে। চেতনার কে-কোনও ভূমিতে শক্তির বিকল্প শেষপর্ব স্বাসাদ অতএব পতনের কারণ হয়ে পড়ায়। তাই শক্তিসাধনার চাই বিকল্পের প্রবর্তন নয়, বিচ্ছুরণের সার্বলীনতা। চেতনাকে সুগন্ধ পতীর উত্তর এবং পরিবাপ্ত করতে না পারলে এটি সস্তব হয় না। আকাশের নতই সবার উপরে অথচ সবার গভীরে থেকে সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়তে হবে। এই প্রত্যয়ের মাঝে স্বপ্নপরিপ্রাপ্তি য-স্বাচরুণা আছে, স্বপ্নসমাধিতে তাকে আরও গভীর করতে হবে। আত্মচেতনোর স্বপ্রতিষ্ঠা মন্দিরকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করতে পারলে স্বপ্নশক্তির বিকরণ কখনও স্বতচ্ছন্দ হয় না।

যেমন প্রাকৃত স্বপ্ন আপনাতাই স্বপ্নহীন স্ফুটিতে পর্ববসিত হয়, তেননি স্বপ্ন-সমাধির গাঢ়তার পরিধান হল স্ফুটিসমাধি। আত্মচেতনা তখন অনুপ্রবিষ্ট হয় সচিচন্দ্রা নলের মধ্যে। বিজ্ঞান আনন্দ শক্তি এবং অতিশ্রুতি—এইগুলি হল এই সমাধির লক্ষণ। এদের মধ্যে গাঢ়তার তারতম্য আছে। প্রথমটার চেতনা স্বপ্ন উদান বইতে পাকে, তখন একটি ভূমির পুরন হয়ে তবে আরেকটি ভূমির উপর হয়। দ্বিতীয় সন্ধিস্থলে দেখা দেয় একটি সর্বগ্রাহী শূন্যতা, যা প্রথম-প্রথম সাধকের ভয়ের কারণ হয়। কিন্তু অনুভবের অভাঙ্গ বা পৌনঃপুনিকতার ফলে এই 'নোকতীতি' সহজেই কেটে গিয়ে সাধক জন্মে স্ব-বন। তখন তাঁর চেতনার মহাকাশে দেখা দেয় সর্বতোভাষ্য চিত্তস্বের স্বিরদীপ্তি। স্বপ্নসমাধিতে কে-বিজ্ঞান বিন্যাসের খনক-খনক প্রকাশ পেতে, এখানে তা এক দলীভূত অথচ সবব্যাপ্ত প্রত্যয়ে রূপান্তরিত হয়। এই প্রত্যয়ের গাঢ়তা জন্মে পর্ববসিত হয় বিশুদ্ধ আনন্দের বোধে। আনন্দের বিশ্রান্তি গাঢ়তা হয়ে জাগে অকুণ্ড অথচ নিশাশ শক্তির অনুভব—হিরবাহের উচ্চৈঃস্বরভূষণের নিশাশ চাপের বড। তারও পরে থাকে অনির্বচনীরের (ineffable) জনিবোধ অভিশূন্যতা—বৈবস্বত বৃত্তার বড।

উপনিষদে সমাধির এই প্রকারভেদকে বোঝানো হয়েছে স্বপ্ন আর স্ফুটির প্রতীক

দিয়ে। বলা বাত্না, উপনিষদ সোথানে প্রাকৃত নিস্তার কথা বোটেই বরচেন না। প্রাকৃত নিস্তা বোপনিস্তার নৃচক নাজ, দুয়ের মাঝে তফাত কোথায় তা আগেই বলেছি। আসলে সমাধি হল জেগে ঘুমানো বা ঘুনের নরো জেগে ওঠা। আগেরটি হল নিরোধের পথ,— জাগ্রৎ অবস্থাতেই শ্রুতির চাকলাকে একাগ্রতার দ্বারা নিবৃত্ত করে বাইরের সব আসো বিবিধে দেওয়া। পরেরটি হচ্ছে, ঘুনের সময় স্বভাবতই যে বৃত্তিনিরোধের প্রবণতা আগে, তাকে আনয়ন করে বিবিক্ত চেতনাকে জাগিয়ে তোলা। পরিণামে দুয়েরই লক্ষ্য হল চেতনাকে সব অবস্থাতে জাগিয়ে রাখা। নিরোধ দ্বারা অবশেষে চেতনাকে জাগিয়ে তোলাকেই সাধারণত সমাধি বলা হয়, জাগ্রৎসমাধির কথাটা হিসাব থেকে তখন বাদ পড়ে যায়। নিরোধসমাধির একটা ক্রটি হচ্ছে, তাকে সবসময় বজায় রাখা কঠিন। তাইতে সমাধিতে আর বাঁথানে অনেকসময় বেড়াড়ারকনের ঝাঁক থেকে যায়। আবার একনাগড়ে সমাধি বজায় রাখতে গিয়ে শেষে তা পৰ্যবসিত হয় জড়সমাধিতে। এইধরনের সমাধিসাধনা হতেই জগৎ-বিবৃথ নানা পার্শ্বনিক নতবাসের উদ্ভব হয়েছে। এ যে অর্থও বর্জন নয়, সে- কথা আগেও বলেছি।

সহজসমাধির কৌশল কিয় অনারকরের। নিত্যজাগ্রত চেতনাকে লাভ করাই স্বৰ্ণ সমাধির উদ্দেশ্য, তখন এই প্রাকৃত জাগ্রৎভূমি থেকেই সমাধির সাধনা শুরু করা বাবে না কেন? সমাধিলভা তুরীয় চেতনা তো জাগ্রতেও আছে। আনার চেতনার একটা অংশ যেমন নিত্যপরিণামী (ever-changing), আরেকটা অংশ তেমনই 'উপালীন' বা 'কুটম্ব'। বিবেক দ্বারা অস্তরে সাক্ষিভাবনা এবং বাইরে আকাশভাবনার দ্বারা আমি জাগ্রতের সকল অবস্থাতেই এই কুটম্ব চেতনোর সংস্কারকে পাকা করে নিতে পারি। তখন আমি অস্তরে আত্মসাহিত্য বোধই, অথচ বাইরে স্বাভাবিকভাবেই কর্ণনত। প্রাত্যহিক হিত-প্রজ্ঞের সমাধির দ্বারা এই অবস্থাকে লক্ষ্য করা হয়েছে : হিতপ্রজ্ঞ কুটম্বকেই সমাসাটী হয়েও সমাধিস, কেননা মহাযোগেশ্বর পুরুষোত্তম তাঁর জীবনরথের সারথি।

এনিত্তর নিত্যজাগ্রত অভিনিবেশের কলে জিয়ারত অবস্থাত্তেও সাধকের মাঝে ভাব আর শক্তি স্বচেষ্টা সক্রিয় হয়। তিনি কাজ করেন অজ্ঞানে নয়, দজ্ঞানে—কর্মেব মূলে যে দ্বিবাশক্তি প্রেরণা এবং দ্বিভাবাবনার দীপ্তি, তা তাঁর চেতনার তখন স্বপরিণামিত। তাঁর জাগ্রৎ তখন যুগপৎ তুরীয় প্রাজ্ঞ এবং তৈজসের চেতনার দ্বারা আবিষ্ট। এই আবেশ গাঢ় হলে জাগ্রৎ বশু আর হৃদয়তির মাঝে কোনও আড়াল থাকে না। সাধক তখন ঐ তিনটি ভূমির যে-কোনও ভূমিতে আর-এটি ভূমির চিন্ময় সক্রিয়কে স্বচ্ছন্দে অনুভব করতে পারেন।

এই হল সহজসমাধির অবস্থা এবং পূর্ণযোগ-সিদ্ধির তা সম্পূর্ণ অনুকূল। তবে নিরোধসমাধির সাধনা এতে ব্যতিল হয়ে যায় না। প্রাকৃত ভূমিতেও স্বচ্ছন্দচারী চেতনাকে যেমন প্রয়োজনবশে কোথাও-কোথাও বিচিট করতে হয়, তেমনি উৎকর্ষচেতনার কোনও-

কোনও ভূমিকে সারথ্য করার জন্য পূর্ণযোগীকেও নিরোধসম্মতির প্রস্তাব করতে হয়।
ভবুও নিরোধ তাঁর লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে আকাশের মত সর্বাভাব্যতা এবং সহজ হওয়া।

২৭

হঠযোগ

এতক্ষণ সম্মতির কে-বিবরণ দিলান, তাঁর প্রধান অবলম্বন হল 'ঔপনিষদ-ভাবনা'।
এ-সাধনা সাধারণত সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগের অনুকূল। এছাড়াও সম্মতিসাধনার আরও
দুটি বিশিষ্ট পথ আছে—হঠযোগ আর রাজযোগ। এনেশে যোগ বলতে প্রাধান্য আনরা
এদেরই বুঝি। দুটিইই লক্ষ্য হল বনোন্মিত। যেখানে মন থাকে না, শুধু বোধ থাকে,
সেইখানেই আমি আমারকে সত্য করে জানতে পারি। যোগের ভাষায় একে বলে পূজকের
স্বল্পপদ্ধতি বা কৈবল্য। পুরুষ তখন প্রকৃতির গুণপরিবারের বহন হবে মুক্ত। তাঁর
আত্মসম্মতি বা আপনাত্তে আপনি থাকার যে প্রশান্ত নিরন্তর সোধ, তাইই প্রজ্ঞা।

প্রজ্ঞাবিহীন পূর্ণযোগীরও কান। কিন্তু এই দ্বিতিকে ভিত্তি করে তিনি চান শক্তির
বিচ্ছুরণ। তাই হঠযোগ বা রাজযোগের বা চরম লক্ষ্য, তা তাঁর কাছে প্রাথমিক সিদ্ধি।
তাহাড়া এই সিদ্ধিকে সাধন করার অন্য পথও থাকতে পারে, তাই আভ্যাস যোগের অধ্যায়ে
লিখেছি। তবুও হঠযোগ আর রাজযোগের বিশিষ্ট পদ্ধতির সম্পর্কে পূর্ণযোগীরও বৌদ্ধি-
মুষ্টি একটা গ্লান থাকা ভাল, কেননা আংশিকভাবে বা ক্ষেত্রবিশেষে এদের প্রয়োগ তাঁর
সাধনাত্তেও প্রয়োজন হতে পারে।

গোড়াতেই বলে রাখি, যোগের কে-পথই বহি বা ভেদ, তিনিই যোগাত্মকে তাঁর মুখ্য
সাধন বলে আমাদের মনে নিতে হবে—আবারওছি, শক্তির একাগ্রতা, যার তুচ্ছ বিষয়ের
প্রতি আনক্তি বর্জনের দ্বারা চিন্তের বিস্ফোরণ। এই ত্রিলীতে দেখে-চেতনা পূর্ণ-চেতনা
এবং মনোচেতনা পরিণত হয়ে বিজ্ঞানে উত্তীর্ণ হবার সামর্থ্য লাভ করে। বিজ্ঞানভূমি থেকেই
সব যোগের শুরু।

*

*

রাজযোগের সাধন যেমন নয়, তেমনি হঠযোগের সাধন হল বেশ। এইজন্য হঠ-
যোগের আরেক নাম 'কারাগার'। যোগীদের মাঝে একটা কথা চলতি আছে, রাজযোগ
করবার শক্তি বাহ্যিক নয়, হঠযোগে তারই অধিকার। মন সুস্থ, তাকে বেশে আনা কঠিন ;
কিন্তু যেহেতু মন, তাকে নিয়ে কারবার করা কতকটা সহজ। কিন্তু মন হলও হঠযোগী
সেহেতু দেখেন যোগের দুটোতে। যেহেতু শক্তির কে-প্রাণশক্তি কুণলিত হয়ে আছে, তাকে
মুক্ত করে এই সেহেতুই পরম চিত্তপ্রকাশের বাহন করে তোলা তাঁর লক্ষ্য। হঠযোগের
ভাষায় একে বলে 'পিও-মুক্তাভ্যাসের একসাধন'। প্রাচীন কোষবিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর একটা

গভীর যোগ আছে। তবে স্নেহচেতনার চাইতে স্নেহ প্রাণবর্তী নার্ভাস সিস্টেম (nervous system) উপর বেশী জোর দেওয়া হয় বলে হঠাৎযোগের সাধনা স্থূল ও মাত্রিক চলেও বেশ কষ্টসাধ্য এবং অনেকসময় বিপজ্জনক।

রাজযোগের আটটি অঙ্গের মধ্যে হঠযোগ প্রথম করেছে প্রধান চারটি। তারও মধ্যে বন-নিরন বা চারিত্রিক বিভক্তির দুটি অঙ্গের জারগার সে বসিয়েছে ঘটিকর্ম বা নাড়ী-শোধন। তাইতে হঠযোগের মূখ্য সাধন ধাঁড়ালেই নাড়ীশোধন আসন এবং প্রাণায়াম—এই তিনটি। রাজযোগের আর তিনটি অঙ্গ প্রত্যাহার ধারণা আর ধ্যান চল বিশেষ করে বনের সাধনা। তাই সাধ্যভাবে হঠযোগে এদের স্থান নাই। হঠযোগীরা বলেন, আসন এবং নাড়ীশোধনের দ্বারা প্রাণের নিরোধ করতে পারলে বনের নিরোধ আপনা থেকে হয়ে যাবে এবং তার ফলে উৎপন্ন হবে নিরোধসান্নিধি—বা রাজযোগেরও অষ্টম অঙ্গ এবং লক্ষ্যসান্নিধি।

সেই প্রাণ আর বন নিয়ে আমাদের প্রাকৃত আধার। এদের মধ্যে চেতনার উৎকর্ষ দেখা দিচ্ছে বনে। সব যোগই আসলে বনের যোগ—উপনিষদের ভাষায়, সাধনযজ্ঞে বনই হল যজ্ঞমান। কিন্তু বনশেতনার বিকাশের পক্ষে বাধা হল স্নেহের জড়তা আর প্রাণের চাকলা। এরা নানা অবিগতি আর বিকারেরও কারণ। বস্তুত স্নেহ আর প্রাণের গভীরে প্রচণ্ড শক্তি লুক্কায়িত আছে, কিন্তু প্রাকৃত জীবনে তারা মুক্তি পাচ্ছে না। হঠযোগের উদ্দেশ্য হল, কৌশলে এই শক্তিকে মুক্ত এবং উল্লেখ্যোক্তা করা।

স্নেহের জড়তার অর্থ হল তার মধ্যে চিৎপ্রকাশের কৃষ্ঠা। নইলে স্নেহ জড় হলেও কিন্তু নিষ্কল নয়। বিশ্বজোড়া প্রাণশক্তির স্পন্দনে স্নেহও নিত্যস্পন্দিত। এই স্পন্দনের মাঝে একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে, যা দিয়ে প্রকৃতির একটা বিশেষ উদ্দেশ্য বেশ সহজেই সার্থিত হয়। উদ্ভিদ বা ইতরপ্রাণীর জীবনে এই স্বাচ্ছন্দ্যকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। বনশেতনা তাদের যাচ্ছন্ন কিংবা অস্পষ্ট, কিন্তু স্নেহ আর প্রাণ বেশ ঘন। গোল বাঘে মানুষকে নিয়ে। মানুষের মধ্যে বন আছে, কল্পনা আছে, স্বপ্ন ইচ্ছার তাগিদ আছে। এগুলি যখন একত্বিক দিয়ে তার মধ্যে চিৎপ্রকাশের চেষ্টা, আরেকত্ব দিয়ে এগাই আবার স্নেহ আর প্রাণের নানা বিকারেরও হেতু। বনশক্তি উল্লেখ্যোক্তা হতে দিয়ে প্রত্যাহার সভাবে নানা বিকল্পে ছিন্তিত পড়ছে। তাকে গটিয়ে না আনতে পারলে জীবনে পরা-প্রকৃতির ছন্দকে আবিষ্কার করা যায় না। তাইতে বনকে গটিয়ে আনা, এমন-কি ইচ্ছান্নায়ে তাকে নিষ্কল করতে পারা সব যোগেরই প্রাথমিক সাধন। স্নেহ প্রাণ আর বনের মাঝে একটা ওতপ্রোত সম্বন্ধ রয়েছে। হঠযোগী দেখলেন, বনের চাকলা দেখতেও চমক করে, আবার স্নেহকে স্থির করতে পারলে বনও স্থবির হয়ে আসে। স্থবৃত্তিতে মানুষের মধ্যে বনের ক্রিয়া থাকে না; তখন প্রাণের ছন্দোবন ক্রিয়া ছাড়া স্নেহের অবস্থা কোনও চাকলাও থাকে না। স্নেহের আগ্রহেও যদি স্নেহের মধ্যে স্থবৃত্তি-সময়ের নিষ্কলতা নিয়ে আসা যায়, তাহলে স্নেহ-স্নেহ বনও পাশ হয়ে আসবে। এই ভাবনা হল হঠযোগের আসনসাধনার ভিত্তি। *

বস্তু আসনসাধনা হল দেহের বৈশেষ্য সাধনা। তার দুটি ফল এক, আধারের গভীরে নিগূঢ় প্রসঙ্গ সৈহাচেষ্টনাকে আবিষ্কার করে তার দ্বারা আবিষ্ট পাকা দ্বিতীয়ত, এই উদ্ভূত চেতনার দ্বারা প্রাণের ক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছন্দ ও সতেজ করা। যৌগিক উপারে দেহ-সচেতন হতে গেলে ক্রিষ্ট গুণ আসনের কসরত করলেই হয় না, সচে-সচে ভাবনাও করতে হয়। চঠযোগে এই ভাবনার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু স্বচ্ছযোগে আছে। ভাবনার সূত্র হল প্রসঙ্গশৈথিল্য (complete relaxation) এবং অনন্তসমাপত্তির (expansion of the consciousness into infinite space) দ্বারা স্ববসর বৈশেষ্য উপলব্ধিতেই আসনসিদ্ধি। এই সূত্রটিকে যোগবীজ বলা যেতে পারে।

চঠযোগে অনেকরকম আসনের কথা আছে। তার সবগুলিই যে যোগাসন, তা নয়। অনেকগুলির উদ্দেশ্য, দেহের আড়ষ্টতা ভেঙে দিবে নাকীপথে প্রাণশ্রোতকে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হতে দেওয়া। ভাবনাসহ অনুশীলন করলে পর আসনসিদ্ধির ফলে নানা কার্যসম্পদ—যেমন দৈহিক তিত্তিকা আরোগ্য বল লাভ্য বহুপুত্রতা তাক্ষ্য—সাধকের আরম্ভে আসতে পারে। অথবা এগুলি কার্যিক বিভূতি। পরবার্হসাধনার সচে বৃত্ত না হলে এদের কল্য ঋষ বেনী নয়, তা বনাই বাহনা। আর বিনা ভাবনার অনুশীলন করলে আসন ও মুক্তির সাধনা উনুতধরণের পারীতিক ব্যাধানে পবর্ষসিত হয়। স্বচ্ছযোগের সূত্র ধরে আসনের সাধনা করলে পর সৈহাচেষ্টনার পরিপূর্ণ বিকাশের ফলে অগ্নি-গগ্নি এবং নহি-নহি নামে কার্যিক সিদ্ধির আবির্ভাব হতে পারে। আগের দুটির ফলে আছে সংমন ও বৈশেষ্য ভাবনা, আর পরের দুটির ফলে অনন্তসমাপত্তির ভাবনা।

*

*

চঠযোগের আরেকটি প্রধান অঙ্গ হল প্রাণায়াম। আসন যেমন ফল ইঞ্জিরপ্রাচ্য দেহকে আশ্রয় করে বৈশেষ্য সাধনা, প্রাণায়াম তেমনই সূক্ষ্ম নাকীসঙ্কারী প্রাণের বশীকারের সাধনা। চঠযোগীরা দেহের বৈশেষ্য যেমন বনঃবৈশেষ্য অনুকূল বলে মনে করেন, তেমনই আরও সূক্ষ্মভাবে প্রাণবৈশেষ্যকেই বনঃবৈশেষ্য প্রকৃত সাধন বলে ধরে নেন। প্রাণ সর্গ-সেহব্যাপী এবং তার ক্রিয়া বিচিত্র; তার মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে চঠযোগীরা সাধনার প্রধান আনয়নরূপে গ্রহণ করেছেন। আসনের ফলে সবস্তু দেহ চূড়ো যে লম্বা এবং বৈশেষ্য বোধ, একটা অভিনিবেশের ফলে তার মধ্যে শ্বাসের গতিকে যেন বচসাধার প্রবাহিত একটা শক্তিশ্রোতের নত অনুভব করা যেতে পারে। এই শক্তির অনুভব যত স্পষ্ট হয়, ফল-সেহের অন্তরালে অববপাতার শিরাঝালের যত একটা সূক্ষ্ম নাকীনের দেহের অনুভবও ততই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। যোগীর কারবার এই নাকীত্বসঙ্কারী প্রাণকে নিয়ে—শ্বাসের ক্রিয়া প্রাণকে ধরবার একটা উপলক্ষ্য মাত্র। নাকীর ভিতর দিয়ে প্রাণের চলাচল স্বচ্ছন্দ ও স্ববন হবে, কোথাও আবর্ত সৃষ্টি করবে না এবং তার গতি ক্রমে বশীভূত হয়ে এক আপূর্ণীক মহাপ্রাণসূত্রে ধরে দ্বারিত হবে—এই হল সাধকের লক্ষ্য। প্রাণের গতিকে

স্বচ্ছন্দ করবার জন্য চঠবোধী মূল দৃষ্টান্তের দ্বারা 'নাড়ীশোধনের' সাধনা করেন এবং প্রাণের প্রতিবিচ্ছেদের জন্য 'কুস্তক' যত্নাস করেন। 'কুস্তক' নাম দ্বিতীয় চঠবোধী প্রাণের সকল ক্রিয়াও বাহ্যদৃষ্টিতে নিরুদ্ধ হয়ে যায়। আর প্রাণবৃত্তির নিরোধে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়ে জড়-সামিহি উৎপন্ন হয়। তেজ এবং প্রাণকে ধরে চঠবোধী এমন করে রাজবোধীর নক্সা কেঁকবনা বা পূজকের পরপরিভি, তাতেই পৌঁছবার চেষ্টা করেন।

নাড়ীবিজ্ঞান চঠবোধীদের একটি বিশিষ্ট আবিষ্কার। বিজ্ঞানটি যতিপ্রাচীন, বেদেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়। চঠবোধীদের হাতে এর বিশেষ উন্নতি হয়, যার পরিণামে আমরা পেরেছি কুণ্ডলিনীযোগের বিশিষ্ট পদ্ধতি। এইখানে চঠবোধী এসে নিলে গেছে রাজযোগের সঙ্গে।

২৮

রাজযোগ

সেহ আর প্রাণ যেন চঠবোধের মূখ্য সাধন, তেননি রাজযোগের মূখ্য সাধন হইল মন। সেহ আর মনের নামে একটা এতপ্রোক্ততার সম্বন্ধ আছে, একথা স্বীকার করে নিলেও কিন্তু চঠবোধী আধুনিক জড়বিদ্যা বা মনোবিদ্যার মত মনোবৃত্তিকে বৈদ্যক্রিয়ের পরিণাম বলে মনে করে না। যোগের দৃষ্টিতে মন সেহের চাইতে সুকৃতিত তব, স্বতন্ত্র; মনের পক্ষেই সেহের প্রশাসন বোধীর কাছে অস্বাভাবিক বা অসম্ভব কোনও ব্যাপার নয়। স্বতন্ত্র সব যোগই মনোনির্ভর, একথা আগেও বলেছি। সাধনসিলাবে চঠবোধী সেহ আর প্রাণের প্রাণনা, আর রাজযোগে মনোব—মূলের নামে প্রারম্ভের এই তত্ত্ব।

চঠবোধী প্রাণবৃত্তির নিরোধের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধের কথা আগের অধ্যায়ে বলেছি। এতদ্বারা চঠবোধী আরেকটি সাধনা আছে—কুণ্ডলিনীযোগ। তাকে বলা যেতে পারে প্রাণকে উর্ধ্বস্রোতা করে বিক্ষয়িত করবার সাধনা। এও একটি খুব প্রাচীন সাধনা। বোগাসনে বলে চিত্তকে অন্তর্ভুক্ত এবং একাগ্র করলে পর স্বভাবতই সেতে একটা তাপের অনুভব হয়। বেদে এই তাপকে দেহস্থিত প্রাণাধির শিখা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অগ্নিশিখার মতই যে-কোনও উর্ধ্বগত ভাবনার এই তাপ (বা 'তপ:পক্তি') উর্ধ্বস্রোতা হয়ে বাবার নিকে চলে যায়—চলতি কথার বাক্যে আমরা বলি 'বাহু চড়া'। আধুনিককালে পটীকার মনে দেখা গেছে, বেঙ্গলও ঠিক করে দ্বিহ হয়ে মনে পরও একটা বিদ্যুৎস্রোত বেঙ্গলগের তিতর দিয়ে বাবার নিকে উল্লিখে চলে। শারীরবিদ্যার এই তথ্যকেই চঠবোধীরা প্রাণের উর্ধ্বগমনের কাছে লাগিয়েছেন। সেহের নাড়ীজ্ঞাকে তাঁরা একটি গুলটানো পাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন: 'মক্তি হল তার মূল, সারাদেহবাসী নাড়ীজ্ঞান তার ডালপালা, আর বেঙ্গলগটি কাণ্ড। কাণ্ডটির নাম 'স্বপুংগকাণ্ড'। বৈদিক কল্পনা' হল,

চিন্মূৰ্শেণ একটি বশির সুরুরক্ৰম তিত্তর দিগে স্বযুৎপার খাত বেগে মানুসের নধো অতিনিবিষ্ট হয়ে আছে। এই স্বযুৎপাই হল আঙনে-ছাওয়া দেবদান পথ। এই পথ হবে দেবজ্ঞা আধারে নেনে এসেছেন। স্ততরা; তাকে ধরে মানুস বৃত্ত্যতে যদি প্রাণ্যোত্যকে উজিয়ে নিতে পারে, তাহলেই সে দেবতাকে পাবে। হঠাৎযোগের সাধনা এই বৈদিক ভাবনারই প্রপঞ্চিত রূপ। তাঁরা বলেন, প্রাণের আঙন ছড়িয়ে আছে সমস্ত জেহে; ভাবনার দ্বারা তাকে 'চরম' করতে হবে ঐ স্বযুৎপকাও। বেরলগটি তখন হবে অগ্নিগর্ভ। বেরল-দগুগ স্বচাইতে নীচের প্রান্ত হল 'মুলাধার'। প্রাণপঞ্জি সেখানে যেন সাপের বত কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরিয়ে আছে। ঘুরিয়ে আছে বলেই আনাদের আধারের বত বায়িক ক্রিয়ার 'আশর' বা উৎস হল ঐরান। বৃত্ত পঞ্জিকে ঐরান থেকে জাগিয়ে স্বযুৎপকাওের তিত্তর দিগে তুলে নিতে হবে নক্ষিকের নিতম-জাগ্রত বিক্ষারিত চৈতন্যের ভূমিতে। চৈতন্যের এই ভূমি যেন একটি 'সহস্রার' চক্র বা সহস্রদল পদ্ম। মুলাধারে প্রাণচেতনা যেন ক্রিষিত, সহস্রারে তেননি বিক্ষারিত। মুলাধার ও সহস্রারের মাঝে স্বযুৎপার ঘাটে-নাটে ক্রমস্কুট চেতনার আরও পাঁচটি ভূমি বা চক্র বা পদ্ম আছে। ওয়া নিচ নাতি এই তিনের সমান্তরাল তিনটি চক্র হল প্রাকৃত চৈতচেতনার ভূমি। আহার বৈধুন এবং নিদ্রাতে অঙ্ক আনক্তি হল সে-চেতনার প্রকৃতি। নাতিতে একটি গ্রহি আছে, নাম ব্রহ্মগ্রহি। তাকে ভেদ না করতে পারলে এই অসঙ্গি কালির ওয়া যায় না, যোগীও হওয়া যায় না। আর তিনটি চক্র ক্রমোৰ্ধ চেতনার ভূমি—রূপের কঠ ও মূৰ্শার সমান্তরালে। প্রাণ্যোত্যকে তাদের তিত্তর দিগে উজিয়ে তুলতে হবে মূৰ্শাচেতনার ভূমিতে—সহস্রারে। অস্তের ভাবার মুলাধার পঞ্জি তখন সহস্রারে শিখের সঙ্গে সঙ্গ হবেন এবং তাঁদের গাবরগোর আনলধারায় পিও-রপী কুহুমহাঃ প্রাণিত হয়ে যাবে। বেগে একে অগ্নি-গোবের নিলন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

মুলাধার পঞ্জিকে হঠাৎযোগী প্রপনত জাগারের চেষ্টা করেন আসন বহু মুদ্রা এবং প্রাণ্যগোবের দ্বারা। স্থল অবলম্বনে সাধনা চলে এইপৰ্যন্তই। তারপর 'পঞ্জিচালনার' জন্ম ভাবনার আশুর নিতেই হয়। তখন সাধনা চলে নন দিয়ে—বিশেষত রাজযোগের পঞ্চম অঙ্গ 'হাদপার' প্রয়োগ এক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই এইখানে এসে হঠাৎযোগ রাজযোগের সঙ্গে নিলে যায়। কুণ্ডলিনীযোগের একটা বৈদিক ভিত্তি ছিল বলে অস্তের রাজযোগের নধো স্থব সহজেই এর অনুপ্রবেশ কটেছে। চক্রের ভাবনা তাতে আরও জটিল হয়েছে। তাছাড়া পঞ্জিচালনাতেও কুণ্ডলিনীযোগের প্রয়োগ দেখা যায়।

*

*

রাজযোগের আটটি অঙ্ক। প্রথম দুটি অঙ্ক হল 'বব' আর 'নিরব'। দুটিই চিত্ত-জড়ির সাধনা। স্ততরা; প্রথম থেকেই রাজযোগ জোর দিচ্ছে বনের উপর। অহিংসা সভ্য অস্তের ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি হল বব'। এগুলির উদ্দেশ্য হল বাবহারিত্ত্ব।

অন্তরঙ্গজ্ঞির জন্য পাঁচটি নিয়ম—পাঁচ সন্তোষ উপঃ স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপূর্ণিধান। সবট বনের সাধনা। বনের সাধনার উপর রাজযোগী এতট ভোর নিরোডেন যে তাঁর নতে অষ্টাঙ্গযোগের কে-কল অবদ্যাদি ক্রেশের কয় এবং সমাধিভাবনা, তা ক্রিয়াযোগের দ্বারাই সিদ্ধ হতে পারে ; আর ক্রিয়াযোগ চল নিয়মের শেষ তিনটি—উপঃ, স্বাধ্যায় (ভপ, মনন বা অনুস্মৃতি) আর ঈশ্বরপূর্ণিধান (তৎপ্রত হরে ঈশ্বরের অনুধ্যান)। ক্রিয়াযোগ চলতে-কিনতে যোগ, জীবনের সহজ যোগ।

অষ্টাঙ্গযোগের আর দুটি যত হল আসন আর প্রাণায়াম। রাজযোগে এরা বহিরঙ্গ, স্বভাঃ হঠযোগের মত এদের নিয়ে রাজযোগে রকবারি কসরত করা হয় না। দুটি যজ্ঞের সাধনাতেই ভাবনা হল প্রধান : ভাবনার দ্বারা সিদ্ধির মূলমন্ত্র আবিষ্কার করে তার স্বচ্ছন্দ-প্ররোপ করতে হবে। আসনসিদ্ধির মূল কথা হল শিরস্তম্ভের সৈদ্যচেতনার আবির্ভাব ঘটানো। তার অনুকূল ভাবনার উল্লেখ আগেই করেছে। প্রাণায়ামের লক্ষ্য হল স্বস্ত-বৃত্তির অনুশীলনের দ্বারা চিত্তের সার্বিক প্রকাশের বাধাকে দূর করা—চিননি পরিণে মিলে লঠনের শিখা যেনন স্থির হয়ে অনতে থাকে, চিত্তের দীপ্তিকে তেননি করা। শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক চন্দকে অনুসরণ করে অথবা বৃহত্তর ভাবনার আবেশে ও হস্তবৃত্তিকে সহজে প্রবর্তিত করা বেতে পারে। রাজযোগে তা-ই করা হয়।

ষম নিয়ম আসন প্রাণায়াম—এগুলি হল রাজযোগের বহিরঙ্গ। যন্তনর সাধন হল প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান এবং সমাধি—যদিও পতঞ্জলি প্রত্যাচারকেও বহিব্রহ্মের মধ্য ধরেছেন। প্রত্যাহারের কারণ হল ননকে নিয়ে, ঐ থেকেই আসন যোগের শুরু। বহিব্রহ্ম ইন্দ্রিয়-বৃত্তি এবং ভাবনাকে অহংকৃত করা হল প্রত্যাহার। চিত্তের বৃত্তি ভাঃ একটি চিত্তস্ব (consciousness-stuff)—যেন জায়াবাক্সির পরলার মত আরেকটি চিত্তবৃত্তি—ঐ পরলার উপরেই সংহিতের দানা বেলা। সাধারণত আমরা ঐ বেলা নিজেই বেতে থাকি, পিছনের পরলার লিকে নজর দিই না। কলে বৃত্তির গতি হয় বাইরের লিকে। অথচ বৃত্তির অনুভবের সঙ্গে-সঙ্গে চিত্তস্বের অনুভবও দানেশাই হয়। ঐটিকে চেতনায় প্রস্ফুট করে তোলাই হল প্রত্যাচারের অর্থ। একটা কুল দেখে ভাল লাগল, এমন কুলের উপর থেকে নজরটা ঘুরিয়ে এনে ভাল-লাগার উপর নিবদ্ধ করা হবে প্রত্যাহার। সববিষয়েই এইধরনের অভ্যাস করলে পর কে-আসনচেতনতা এখন আনাদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে, তা শ্রষ্ট হয়ে-উঠবে। তাতে কোনও বিষয়ে চিত্তকে ধরে রাখবার কনতা বাড়বে। তার নাম বৃত্তি বা ধারণা। যোগের ধারণার লক্ষ্য হচ্ছে আকসচেতনতাকে বাড়ানো। তার জন্য ধারণার অভ্যাস করতে হয় সেহের কোনও চক্রে চিত্তকে গুটিয়ে এনে অথবা সেহের বাইরে চেতনাকে স্বচ্ছন্দে ছড়িয়ে দিয়ে (বিবেকধারণা)। ধারণার আরম্ভে শ্রষ্ট হয়ে উঠলে আপনহাতেই তাকে অবলম্বন করে চেতনার একটানা একটা প্রবাহ তিত্তকে-তিত্তর বইতে থাকে। তখনই ধ্যান হয়। ধ্যানের ফলে আরহারা হওয়াই সমাধি।

ধারণা স্থান সমাধি এই তিনটিন একত্বভাবে পারিভাষিক নাম দল সংঘন। সাধকের পুণ্য-পুণ্য আচর্যেতনার উপরই সংঘন করা উচিত বাস্তব আত্মবোধ স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। এমন-কি বাংলা ইষ্টভাবনার ভূততে চান, তাঁদের পক্ষেও এই বিধি। নিম্নেই না জানলে দেখতাকি ও ঠিক-ঠিক জানা যায় না, কেননা স্বস্তর দেখত আত্মচৈতন্যেরই স্বনভাব বা বিগ্রহ। ইষ্টভাবনা ঘাঁড়ের সাধা, তাঁরা সংঘবের ফলে আত্মবোধকে পুণ্য জাগিয়ে তুলে সেই বোধের ক্ষেত্রে ইষ্টের ভাবনাকে প্রবর্তিত করবেন। সে-ভাবনার গতি হবে বাইরের থেকে ভিতরের দিকে—যোগের ভাষায় গ্রাহ্য হতে গ্রহণের ভিতর দিয়ে প্রতীতির দিকে। পুণ্যময় জাগবে ইষ্টের সূন্যত্মগ্রাহ্য বিশিষ্ট বোধের তন্ময়তা, তারপর সূক্ষ্মত্মগ্রাহ্য সাধনাবোধের তন্ময়তা, তারপর চিত্তস্বের স্ক্রুৎজানিত আনন্দের তন্ময়তা এবং অবশেষে আত্মবোধ এবং ইষ্টবোধের সাধুজ্ঞানিত তন্ময়তা। যেমন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের বন্দ-স্পন্দ-রূপ-রস-গন্ধ ভবে গেলান, তারপর হরতো ভবে গেলান স্পন্দতন্ময়াহে; তারপর শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান আনন্দ, অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ আর আমি একাকার। এই স্তরগুলিকে যোগের ভাষায় বলে 'সমাধি'। চারটি সমাধিহিতে সম্বন্ধাত যোগ, বার ফলে তত্ত্বাত্মবোধের (knowledge by identity) দ্বারা বিষয়ের সত্যক পুজ্ঞান হয়। আরও গভীরে গেলে অসম্বন্ধাত যোগ। তখন আর সংজ্ঞা থাকে না। সে যেন না-জানা দিয়ে জানা।

রাজযোগের চরম লক্ষ্য হল এই অসম্বন্ধজ্ঞান বা চিন্তবৃত্তির সত্যক নিবোধ। তার ফল পুরুষের কৈবল্য। কেবল পুরুষ পক্ষিপরিণামের উর্ধ্বে। কিন্তু তাহলে তিনি নিঃপঙ্ক্তিক নন। পুরুষ আর প্রকৃতিকে চৈতন্য আর পঙ্ক্তিকে কোনও যবহাতেই আলাদা করা যায় না। একাগ্রতা এবং নিরোধের দ্বারা যোগী যবত্বমির প্রকৃতিপরিণাম হতে নিষ্কৃতি চান, কেননা সাধারণত ওগুলি মানুষের দুঃখের কারণ। কিন্তু এই একাগ্রতা আর নিরোধের ফলেই আবার চৈতন্যের পঙ্ক্তি বাড়ে। ফলে কৈবল্যসাধক যোগীর মাঝে দেখা দেয় বিভূতি বা ঐশ্বর্য। যেমন তাঁর জ্ঞান বাড়ে, তেমনি ভোক্তার এবং কর্তৃকর সামর্থ্যও বাড়ে। অনেক ক্ষেত্রে এগুলি হয় প্রকৃতির নতুন প্রলোভন, যার মধ্যে আটকা পড়ে যোগীর চরম লক্ষ্য কৈবল্য হতে বিচ্যুত হবার আশঙ্কা থাকে। যোগশাস্ত্রে তাই বিভূতি বা সিদ্ধির সম্পর্কে সাধককে সাবধান হতে বলা হয়েছে। পূর্ণপ্রজ্ঞ না হওয়া পর্যন্ত এ-সাবধানতার সার্বকত্র আছে বই কি। কিন্তু অভিন্যাসে প্রতিষ্ঠিত পূর্ণপ্রজ্ঞ পুরুষের সিদ্ধি পরমপ্রকৃতির কল্যাণী-পঙ্ক্তির বিভূতি। নিবন্ধন অন্তরের সিদ্ধিতে ভেঙাল থাকতে পারে, কিন্তু শিবের সিদ্ধি নির্মালা এবং বিজ্ঞা।

চর্যযোগের এবং রাজযোগের আলোচনা হতে এইটুকু বোঝা গেল, পূর্ণযোগের সাধনার ক্ষেত্রবিশেষে জ্ঞানের সাধা বা নেওয়া প্রয়োজন হলেও কি লক্ষ্য কি সাধন-পদ্ধতিতে তার সঙ্গে এদের সর্বাংশে ঐক্য সম্বন্ধের নয়।

॥ দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত ॥

(জ্ঞান)

মহামানবের নাগরতীর

(ঐশ্বর্যবিশ্ব অবলম্বনে)

সমঃ বক্ষ্যোপাখ্যায়

(৯)

তাহলে দেখা গেল গলায় গৈতে খোলাতে পারলেই যজ্ঞ বসা যায়, অর্থাৎ বিজ্ঞ নাত্রেই যজ্ঞে অধিকার স্বীকৃত, যদিও এখানেও একটুখানি জড়ভেদ হয়ে গেছে। যজ্ঞ-কর্তা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ; কৃত্রিম বৈশ্যকে যেন খানিকটা দয়া করে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু যজ্ঞে শুধু অধিকার থাকলেই হয় না, দীক্ষার প্রয়োজন। এই দীক্ষাটা কি বস্তু এবং দীক্ষিতের কর্তব্য কি, এসবই ব্রাহ্মণকারের কি নত একটু দেখা যাক।

অভিধানকারদের বিশ্বাস “দীক্ষা” শব্দের ব্যুৎপত্তি খুব সম্ভব “দক্ষ” থেকে, অর্থাৎ যার “দক্ষ” চবার টুছে সে যেন “দীক্ষা” গ্রহণ করে। স্বপ্নে “দক্ষ” শব্দটি ব্যবহার হয়েছে সাধারণতঃ নিম্নের বা ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা (higher discernment) এই অর্থে, যেমন, অগ্নিকে বলা হয়েছে “যজ্ঞ ই চ তে মনঃ, দক্ষঃ মধম উত্তমন্, তত্রা সমঃ কৃণবসে” (৬।১৬।১৭)। যারগার যারগায় অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক শক্তি (supernatural or occult Power) এই অর্থও দিয়েছেন শ্রীঅবধিলা যেমন ঋগ্বেদ ৪।৩।১৩ ব্যাখ্যায় (Hymns to the Mystic Fire, ২৩৯ পৃঃ)। ব্রাহ্মণ যুগে বোধ হয় দীক্ষার মধ্যে দুই উদ্দেশ্যই প্রচ্ছন্ন ছিল জ্ঞান এবং শক্তি অর্জন। অন্ততঃ দীক্ষা-গ্রহণের ফলে, অর্থাৎ যজ্ঞে বসবার সমর, দীক্ষিত ব্যক্তি যে ঠিক গাধাবণ মানুষের মত নয় এইরকম একটা ধারণা তখন প্রচলিত ছিল।

ঐত্তরের বনচেন “সর্বাভিঃ বৈ এষ দেবতাত্তাঃ আত্মানঃ আনতাত্তঃ যঃ দীক্ষতে... সর্বাভিঃ বৈ এষ দেবতাত্তিঃ আনতঃ ভবতি যঃ দীক্ষিতঃ ভবতি” (২।৩ : ২।৯)—যে দীক্ষা গ্রহণ করে সে নিজেকে উৎসর্গ করে সকল দেবতাদের কাছে...সব দেবতারা তাকে গ্রহণ করেন। শতশতেরও সেই মত। “ঊষপৃভীতে বৈ এষ অস্মাং লোকাং দেবলোকং অভি যঃ দীক্ষতে (৩।১।৪।১)—দীক্ষা নিলে মানুষ এই লোক থেকে দেবলোকের দিকে ওঠে। “জ্যোতিঃ বৈ এতে ভবন্তি, অমৃতঃ ভবতি যে সত্রঃ আসতে” (৪।৬।৯।১২)—যারা যজ্ঞে বাসে তারা জ্যোতিয়ান্ হয়, অমরক লাভ করে। “নিমঃ বৈ এতে পৃথিব্যাঃ অধিরোহতি

যে সত্ত্বা 'সমস্তে' (ঐ)—তারা পৃথিবী থেকে স্বর্গে আরোহণ করে। "সেবান্ বৈ এষ উপারততে যঃ শীকতে, স স্বেতানাঃ একো ভবতি" (শতপথ, ৩।১।১৮)—শীকিত-ব্যক্তি স্বেতাসের সন্তিকাবিত্তী হয়, স্বেতাসের একজন হয়।

কিন্তু স্বেতাসেব একজন হওয়া তো কথার কথা নয়। তার জন্যে কিন্তু স্বেতস্বভাব ভণ্ডা পাকা চাই।

এইখানে আমরা সে-যুগের একটা পরিচয় পাই যা ব্রহ্মবিশ্বের বিশি নিষেধের, ত্রিমা-কলাপের চাপে চাকা পড়ে যাওয়া চর্য্যতো খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু যার প্রমাণ খুঁজে বার করা বিশেষ শক্ত নয়। ব্রাহ্মণকার সমস্তো বেদের নিগূঢ় অর্থ ভুলে গেছিলেন—তার প্রমাণ আছে চুস্তে চুস্তে। কিন্তু তাঁরা অস্বস্তি: একথা জেনেন নি যে বেদের প্রথম এবং চরম কথা হলো সত্যের উপাসনা এবং সত্যের প্রতিষ্ঠা জীবনে, বর্মে, সমাজে, রাজনীতিতে। বৈদিক যুগের সে প্রচেষ্টা অবশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় নি। মানুষ সত্যকে গ্রহণ করে নি। ব্রাহ্মণ-কার সোটা ভাব করেই জানতেন কিন্তু তাঁরা এটাও জানতেন যে সত্যটাই প্রতিষ্ঠা এই পৃথিবীর—“ইয়ং সত্যো প্রতিষ্ঠিত, তস্যাং উ ইয়ং এব সত্যান্” (শতপথ ৩।১।১৮)। এবং মানুষ বসতি না কেন সত্যের পরিপন্থী হোক, স্বেতাসা যাচ্ছেন এবং তাঁরা সত্যের প্রতী। “ইয়ং বৈ ইয়ং, ন তৃতীয়াঃ অস্তি সত্যঃ চৈব অন্তঃ চ। সত্যাসেব স্বেতাঃ, অন্তঃ ননুযাঃ। এতৎ চ বৈ স্বেতাঃ প্রত্যঃ চরতি যৎ সত্যং” (ঐ ৩।১।১৮-৫)।

অতএব যে মানুষ সীকা নিয়ে স্বেতাবাপন্য চতে চায় তাকে অস্বস্তি: শীকিত অবস্থার সত্যবাদী চতে চাবে। কারণ স্বেতাসা মানুষের মনে কি আছে জানতে পারেন। “মনো স্বেতা মনমাসা আসানসি” (ঐ ৩।১।২৬)। কেনন করে? “মনসা সত্বত্পরতি, তৎ প্রাণঃ অপিপদন্তে, প্রাণো বাতঃ, বাতো দেবেতাঃ, যাচটে যথা পুরুষস্য মনঃ” (ঐ)—মনে যা উদয় হয় তা প্রাণে সংক্রান্ত হয়, সেখান থেকে বায় বায়তে, বায়ু গিয়ে বলে দেব স্বেতাসের কাছে কান মনে কি আছে।

অতএব মিথ্যাভাষণ ত্যাগ করতে হবে। বিশেষ করে যে আত্মত্যাগি তার পক্ষে এটা অবশ্যকর্তব্য। “ন বৈ আত্মত্যাগিনা অন্তঃ বলিতবান্” (শতপথ ২।২।২০)। মানুষ কিন্তু সত্যবস্তুই মিথ্যাভাষী, অতএব তার অন্তর অচি—“অনেন্দো বৈ পুরুষঃ যৎ অন্তঃ বসতি। তেন পুতিঃ অন্তরতঃ” (ঐ ৩।১।১০)। তার অনৌচ বসনের জন্য জানেন ব্যবস্থা, বেহেতু ভাল পবিত্র করে—“বেদ্যাঃ সৈ আপঃ, পবিত্রাঃ বৈ আপঃ ; তস্যাং বৈ স্মৃতি” (ঐ)।

অবত্থ মানের আরও একটা কারণ খেঁজা হয়েছে। ব্রাহ্মণযুগে দুই বিশ্বাস ছিল যে মানুষ কোন যোগ করলেই তাকে বরুণের পাশে আনত্ব হতে হয়। এ বিষয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রাজা চরিত্রভ্রষ্টের গল্পটি অনেকটাই চর্য্যতো জানেন, কেনন করে বরুণের প্রসাদে তাঁর পুত্রলাভ হয় এবং পরে বরুণের সন্ত পালন না করার জীকে বিকট ব্যাধি আক্রমণ করে।

বরুণ হলেন জলেন সাজ। অতএব বরুণকে সজতে তুষ্ট করতে হলে অবগাহন প্রাপ্ত। সেই কথাটাই খুলে বলছেন শতপথ এক নারায়ণ। “স যঃ স্বাবরঃ চুপঃ সাং তং অপো অভা-
বেহাং। এতা বৈ আপঃ বরুণপুতীভাঃ। বহুপোষ্যৈ অবভূখঃ, নির্ভুপতায়ৈ” (৪।১।৪।১০)
—যে পুকুরে জন পাবে সেখানে গেবে পড়বে, কারণ জন সব বরুণের হাতে এবং পুণ্যস্থান
বরুণের জন্যে, বরুণের হাত থেকে নিষ্কার পাবার এই উপায়।

এই সবকিছু একটা কথা এখানে বলে রাখি, একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও। অনেকই
বোধ হয় জানেন মোহেত্তমারোর বাটী খুঁড়তে গিয়ে আবিষ্কার হয়েছে একটা চনৎকার পুকুর।
জন অবশ্য অনেকদিন গুফিরে গেছে, কিন্তু তার বাটীটা এখনও বহুতরান। পণ্ডিতেরা নানা
গবেষণা করেছেন কি কাজে লাগতে পারত এই পুকুরটা। পাচ হাজার বছর আগেও
কি এখনকার বত শুইমিং পূনের ব্যতিক ছিল? তার চারপাশে আবার সাদি শুরি ছোট ছোট
কাপড় ছাড়বার নতন ঘরও ছিল বলে বলে হয়। কিন্তু একখাটা এখনও বিশেষ কারো
নামে আসে নি যে মোহেত্তমারো হরতো বা ব্রাহ্মণযুগের ব্যাপার। আর এই “শুইমিংপুল”
নামবার ব্যবস্থা ছিল অবভূখবানের জন্যে? এটা অবশ্য গবেষণা-সাপেক্ষ। যদিও আজও
শেষতে পাওয়া যায় দক্ষিণের বড় বড় নদীর পাশেই পুকুরটী।

যাক, বা বলভিনুর। পীকিতের যান করা এবং সত্য কথা বলা ছাড়া আরও কর্তব্য
সাছে। যেমন ঘূনের নিয়ম। ব্রাহ্মণকারের বিশ্বাস সেবতায় ঘূনোন না, কিন্তু তা বলে
মানুষের তো আর দুঃ না হলে চলে না—“ন বৈ দেবাঃ স্বপতিঃ, অনবরুহঃ বৈ এতস্য অযপুঃ
ভবতি” (শতপথ ৩।২।২।২২)। তাই একটা রকম হলো। “ন স্বপতঃ যত্মদিয়াং”
(ঐ ৩।২।২।২৭)—স্ব উঠে যেন কোনোদিন না লেখে ফেলেন যে সে তখনও ঘূনচে। কেন?
না তাহোলে তার সে চিনটা নারা বাবে, আর সে পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত নেই—“যৎ স্বপতঃ
যত্মদিয়াং অহঃ এনঃ তৎ অহরিয়াং। নাত্র প্রায়শ্চিত্তিঃ অস্তি” (ঐ)। আর একটা কথা।
ঘূনিরে পড়লে মানুষ হয়ে যায় আধবরা। তার প্রাণ এবং চেতনা, এমন কি অহরিতা পর্যন্ত
অন্য কোথাও চলে যায়, তাই আবার তাদের ফিরিয়ে আনতে হয় বিশেষ মন্ত্র পাঠ করে—
“জন্মাং আহ, পুনরনিঃ পুনঃ আনু না আগন্, পুনঃ চকুঃ পুনঃ শ্রোত্রঃ না আগন্”
(৩।২।২।২০)। পীকিতের বাক্‌সংঘনও একটা বিশেষ কর্তব্য। একটা কাণন হরতো হতে
পারে যে কথা কইলেই নিখো কথা বেহিয়ে পড়বে। তাই সকল গদ্যায় ধানিকক্ষণের
জন্যে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময়টা অত্যন্ত, তাকে কথা বন্ধ করতেই হবে। “পুত্রা
অজন্মাং আহ, ‘পীকিত, বাচঃ যচ্ছ’ ইতি। জাঃ অজনিতে বাচঃ বিস্মমতে। পুত্রা উদমাং
আহ, ‘পীকিত, বাচঃ যচ্ছ’ ইতি। জাঃ উদিতো বাচঃ বিস্মমতে সত্যত্যা এব” (৩।২।২।২৬)।
সাত্ত উপাসনার ব্যবস্থা বোধ হয় অতি প্রাচীন, এটা হরতো তারই এক নিদর্শন। আর,
কথা বলুক বা না বলুক, রাগ করতে পারবে না কোনোমতেই—“অক্রোধো হি এব
পীকিতয়া” (ঐ ৩।২।২।২৪)।

এই ত্রো গেল মোটামুটি ঠীকার ব্যবস্থা। এবার বজ্রে বহ্নের ব্যবহার লক্ষ্যে কি বিধান দেখা যাক।

ঐতরেয় ব্রহ্মসূত্র, “অথ বৈ বজ্রঃ যঃ অথঃ পবতে” (৪।৩৩)—এই যে বজ্র তা বহ্নে দ্বার দ্বোতেন বহত। কিন্তু তার একটা নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা আছে, একটা নয়, দুটো। “তস্য বাক্ চ ননঃ চ বর্তনো, বাচা চ হি ননসা চ বজ্রঃ অবর্ত্তত” (ঐ)—বাক্ এবং নন এই দুইটি বজ্রের পথ, বাক্ এবং ননব ধারাই বজ্র চলে। তার মানে এই যে বজ্র করতে বহ্নে পুরোহিতদের নয় উচ্চারণও করতে হয় আবার চুপ করেও থাকতে হয়, দুইয়েরই সমান পুরোক্তন। তেতা, অর্থঃ এবং উৎপাতারা নয় পাঠ করেন, ব্রহ্মা অর্থঃ যিনি প্রধান পুরোহিত তাঁর কাজ হলো ননে ননে নয় বলা। “তৎ বাচা ত্রয়ো বিদ্যায়া একঃ পক্ষঃ সংকুর্ধতি, ননসা এবং ব্রহ্মা সংকুরোতি” (ঐ)। ঐরা তিনজন ঐক্ বজ্রঃ সাব এই তিন বেদের নয় আওড়ে বজ্রের একটা দিক্ সামান্য, ব্রহ্মা ওধু নয় দিয়ে অন্য দিকটা।

কথ্যটা একটু ভেবে দেখবার বিষয়। বহ্নপ্রদীপ ঋষিদের কাছে ক্রিয়ারতন আনুষ্ঠানিক বজ্র ছিল একটা উপন্যাস যার, আভ্যন্তরীণ উপাসনাই ছিল বজ্রের প্রাণ। এই ত্রো সেদিনের কথা, আরও সবাই জানি শ্রীযামক্কের পূজাপদ্ধতির বিষয়; অনেকটা বোধচর সেইসকল। কিন্তু বজ্রে ত্রো ওধু ঋষিরাই বসতেন না, বেশীরভাগ সময় পুরোহিত দ্বারা হতো তাঁরা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ। তাড়াতাড়ি বর্তমান যখন পরমা ধরত করে এবং বিশেষ বড় বকন কিছু প্রত্যাশা করে বজ্রের আয়োজন করত, তখন তাঁর সন্তুষ্টির জন্যেও অস্বস্তি; পানিকটা বজ্রোচ্চারণের প্রয়োজন ছিল। দ্বার উচ্চারিত বহ্নের বহ্নির একটা বিশেষ মূল্য আছে তা আজও স্বীকৃত হয়। তাই বোধ হয় ব্রহ্মপথুগে বজ্রে বেদনস্পর্শের ব্যবস্থা। কিন্তু উচ্চারিত বহ্নের সঙ্গে যদি কোথাও ননের যোগ না থাকে তা হলে বজ্র নাট হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষায়, “তৎ যথা একপাৎপুরুষো, যৎ একতশ্চক্ৰো বা যথো বর্তমানো যথঃ নোতি, এক-বেদ” (ঐ)—যেমন মানুষ যদি এক পাতে চলতে চায় কিংবা বপের যদি একটা চাকা বুলে যায়, ঠিক সেটই বহ্নি হয় বজ্রের। তাই যিনি ব্রহ্মা, অর্থঃ বজ্রের প্রধান পুরোহিত, তাঁর হাতে তার সেওরা হয়েচে “ভূকী পঃ”, নানে চুপি চুপি বনার। তার ফলে, “স যজ্ঞো ন বিঘাতি, যজ্ঞস্য অরিষ্টেন্ন বহ্নমানো ন বিঘাতি” (ঐ)—সে বজ্রের কোনো ক্ষতি হয় না, বহ্নমানও নিরাপদ থাকে।

শতপথে আছে, “ননচ বৈ বাক্ চ বৃজো দেবেতাঃ বজ্রঃ বহতঃ” (২।৪।৪।১১) নয় আর বাক্ বৃজনে একতোট হয়ে তবে পৌঁছে দেয় বজ্রকে দেবতাদের কাছে। আরও শ্রুতি ভাষার আছে আর এক ব্যরণ্যর, “পথযো বৈ দেবানাঃ চন্দ্রাঃসি : তৎ যথা ইদং পথযো বৃজাঃ নন্যোভাঃ বহস্তি, এবং চন্দ্রাঃসি বৃজানি দেবেতাঃ বজ্রঃ বহস্তি” (ঐ ৪।৪।৩।১১)—চন্দ্রা হলো দেবতাদের বাহন : পথযা বেদন মানুষের জন্যে তার বহ, ঠিক তেমনি চন্দ্রাও দেবতাদের জন্যে বজ্র বহন করে নিয়ে যায়। ওধু তাই নয়, এই চন্দ্রের ওপেই দেবতারা

স্বর্ণে স্থান পেয়েছেন—“ছন্দোভিঃ হি দেবাঃ স্বর্গং লোকং সনাশু বহু” (ঐ ৩।৯।৩।১০) । কিন্তু সেবতারও জ্ঞানভেদ—মানুষেরা নিশ্চয় তাঁদের কাছ থেকেই শিখেছে—যে ওধু উচ্চ-স্বরে বহু পড়লেই হয় না, মনে মনেও পড়া চাই, তবে যজ্ঞ ফলবান্ হয় । একখাটা কিন্তু অম্বুরদের মাথায় চোকে নি, তাই তাদের অধঃপতন । অন্ততঃ ঐতরেয় তাই বলেন । “দেবাঃ বৈ যশেয যজ্ঞে অকূর্বন্ তং যমুহাঃ অকূর্বন্ । ততঃ সনাবর্ষীযাঃ এব আসন্, ন ব্যবর্তন্ত ; ততো বৈ দেবাঃ এতঃ তুষ্ণীং শংসং বহুং অপশান্ তং এভাঃ উদরচ্ছন্, তং এথাঃ অমুহাঃ ন প্রত্যাবুধ্যন্ত, ততো বৈ অভবন্ পরামুহাঃ (ঐতরেয় ২।৩১)—সেবতার যজ্ঞে যা যা করতেন অম্বুররাও তাই করতে লাগল, ফলে দুজনেই দুজনের সবকক্ষ হয়ে উঠল, কেউ হারে না ; তখন সেবতারের চোখে পড়ল “তুষ্ণী শংসং” রূপ অম্বু ; তাঁরা তখন এই অম্বু চাড়লেন, অম্বুররা জানতেও পারলনা, ইতিমধ্যে সেবতার হারে পেলেন জয়যুক্ত ।

এখন প্রশ্ন ওঠে, সেবতার যজ্ঞের মন্ত্র পেলেন কোথা থেকে ? ঐতরেয় (৫।১২) এর একটা বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, তার সারাংশ এখানে দেওয়া যাক্ । প্রজাপতি তপস্যার দ্বারা তিনটি মন্ত্রভ্যোতি সৃষ্টি করলেন, “অগ্নিঃ এব পৃথিব্যাঃ অজায়ত, বায়ুঃ অন্তরিক্ষাৎ, আদিত্যঃ দিবঃ”—অগ্নি থেকে ঋগ্বেদ উৎপন্ন হলো, বায়ু থেকে যজুর্বেদ, আদিত্য থেকে সাম । এই তিন বেদ থেকে ক্রমে তিনটি ব্যাহ্তির উৎপত্তি—“ভুঃ ইত্যেন ঋগ্বেদাৎ অজায়ত, ভুবঃ ইতি যজুর্বেদাৎ, স্বঃ ইতি সামবেদাৎ” এবং এই তিন ব্যাহ্তি থেকে এল ওজার । সর্বপ্রথমে প্রজাপতি নিচ্ছেই হোতা, অধ্বর্যু উদ্গাতার কাজ করবেন । তারপর যখন সেবতারের দ্বারে যত্নে তার এল, তাঁরা প্রজাপতির নতই তিন পুরোহিতের কাজ নিলেন । প্রজাপতি তাঁদের শিস্যে তিলেন বেদের মন্ত্রে ভুল হয়ে যেন ব্যাহ্তি ব্যবহার করা হয় । কারণ এই তিনটি ব্যাহ্তি দিয়ে সেমনস্ব বীণা হয়ে থাকে—“এতানি হ নৈ বেদানাঃ অন্তঃ-শ্রেণম্যানি যৎ এভাঃ ব্যাহ্তয়ঃ এভাভিঃ যজ্ঞস্য বিদ্বিষ্টঃ সংধাতি, সৈদা সর্বপ্রাশনচিতিঃ বসেভাঃ ব্যাহ্তয়ঃ” ।

শতপথে কিন্তু এই মন্ত্রোৎপত্তির ইতিহাসটা একটু অন্যভাবে বলা হয়েছে । শতপথ বলছেন, “মনো বৈ সনুহঃ, বনসো বৈ সনুহাৎ বাচা অভ্যা দেবাঃ এযীঃ বিদ্যাঃ নিরখনন্, এতৎ বৈ সনুহাঃ বাচঃ প্রজাতঃ যৎ এব এয়ঃ বেদঃ” (৭।৫।২।৫২ ; ৫।৫।৫।১২)—মনই সনুহ, সেই মানস-সনুহ থেকে সেবতার তিনটি বেদ খুঁড়ে বার করলেন, বাক্ ছিল তাঁদের বনিজ—এই তিনটি বেদ সেই বাক্-এর সহস্র সম্ভবিত । শতপথের এই বিবৃতির সঙ্গে ঐতরেয়ের কোনো বিশেষ বিরোধ আছে বলে মনে হয় না । দুই ব্রাহ্মণ দুটি পৃথক্ রূপকে একই কথা বলেছেন । বেদের মন্ত্র সেবতার দান, তার বাহুস্বর রূপ এসেছে বানসলোক থেকে, কিন্তু তার গভীরতর সত্তা আরও উচ্ছল্লোকে প্রসূত, সেখানে বড় বড় সেবতারের রাজস্ব—অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, প্রজাপতি । তাই বলা হয়েছে এই তিন সেবতার সৃষ্টি ত্রয়ী ।

সে যাই হোক্, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সেবতার বেদমন্ত্র পছন্দ করেন,

বিশেষতঃ বড়রূপে। “সেহান্ বৈ এষ প্রীণাতি যো যজতে। এতেন যজেন ঋগুজিরিব ঋৎ, যজুজিরিব ঋৎ, আততিজিরিব ঋৎ স সেহান্ প্রীষা তেযু অপিরী ভবতি” (শতপথ ১১৯।১।৩) —যে যজ্ঞ করে সেই দেবতাদের সমষ্ট করে; কিছুটা ঋক্, কিছুটা যজুঃ, কিছুটা আহুতি দিয়ে তাঁদের প্রীতি সম্পাদন করে, তাঁদের মধ্যে স্থান পায়।

কিন্তু বেদনন্দন মধ্যেও একটু তারতম্য রয়ে গেছে, কোন্ বেদের নর এবং কি তার ছন্দ এই নিয়ে। প্রথমতঃ, অর্ধবেদের নর অনেকটা যেন অপাংক্তের, কারণ প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ গ্রন্থে তার আলোচনা নেই বললেই হয়। অন্য তিন বেদের মধ্যেও একটু ভাঙভেঙে আছে। যেমন শতপথের নতে দেবতার সর্বপ্রথমে যজুর্বেদ দিয়ে বজ্র করেছিলেন, তার পরে ঋক্ এবং সাম দিয়ে (৪।৬।৭।১০)। এবং যজুর্বেদেই তাঁদের সব চেয়ে বেশী তৃষ্ণি হয়—“যজুর্বিদ্যা এব ভূমিষ্ঠান্ কামান্ বৃষুহে” (৪।৬।৭।১৪)। তার অবশ্য একটা কারণ এও হতে পারে যে শতপথ যজুর্বেদীদের ব্রাহ্মণ।

আর একটা আশ্চর্যের কথা এই যে ব্রাহ্মণকারের নতে প্রত্যেকটি ছন্দের বিশেষ গুণ আছে, এবং সেই নত তাদের প্রয়োগ ব্যবস্থা। এবং এখানেও আছে ভাঙভেঙে। গুনজিতে বৈদিক ছন্দ মোটে সাতটি—ব্রাহ্মণকারের নতে, যদিও আধুনিক পণ্ডিতবর্গ আরও বড় ফর্দ দিয়েছেন। তার মধ্যে আবার তিনটি দ্বিজাতীয়, বাকীরা সব শূদ্রস্থানীয় না হলেও তাদের অনুগত। ইত্যরের বলেন, “এতানি বাব সর্বাণি ছন্দাঃসি, গায়ত্রীঃ, ত্রৈষ্টুভঃ, ভাগতঃ ; অনু অন্যানি, এতানি হি বজ্রে প্রতনানি ক্রিয়ন্তে” (১।২)—গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, ভাগতী, এই তিনটিই আসল ছন্দ, বাকীরা সব এদের পরে, কারণ বজ্রে এদেরই সব চেয়ে বেশী ব্যবহার। শতপথের নতে, “স্যা গায়ত্রী সবিজ্ঞা অন্যানি ছন্দাঃসি সবিজ্ঞে” (১।৩।৪।৬)—গায়ত্রীকে প্রাধান্যিত করলেই অন্য ছন্দরা প্রাধান্যিত হন। কারণ “ব্রহ্ম গায়ত্রী, কত্রঃ ত্রিষ্টুপ্” (১।৩।৫।৫)—গায়ত্রী ব্রাহ্মণজাতীয়, ত্রিষ্টুপ্ কত্রিয়। এই কথাটাই ঐতরেয় আর একটু স্পষ্ট করে বলছেন, “গায়ত্রো বৈ ব্রাহ্মণঃ, তেজো বৈ ব্রহ্মবর্চসঃ গায়ত্রী”। অতএব যদি কেউ ব্রহ্মভেদ চায় যে যেন গায়ত্রীছন্দ ব্যবহার করে—“তেজসা এব এনঃ তং ব্রহ্মবর্চসেন সমর্থয়তি” (১।২৮)। সেইনত, “ত্রৈষ্টুভো বৈ রাজন্যাঃ, ওজো বৈ ইন্দ্ৰিয়ঃ বীৰ্য্যঃ ; ত্রিষ্টুপ্ ওজসা এব এনঃ তং ইন্দ্ৰিয়েণ বীৰ্য্যেণ সমর্থয়তি” (৩)—যে কত্রিয় সুলভ বনবীৰ্য্য চায় তার পক্ষে ত্রিষ্টুপ্ শ্রেষ্ঠ। এটা যে একটা রূপক বা Symbolism তা বেশ বোঝা যায়।

আরও অনেক এই ধরনের রূপক আছে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে।

(ক্রমঃ)

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রয়োত্তর]

প্রশ্ন : শ্রীমদ্রবিশ্ব নিবেদন (The Synthesis of Yoga, Page 100)—
“ভগবান তাঁর দিব্য আলো শক্তি ও আনন্দের উপযুক্ত আধার বেছে সেই নির্বাচিত
ব্যক্তির উপর তাঁর অলৌকিক ভ্যোতির্বিজ্ঞ হস্ত প্রসারিত ক’রে নেন।”

এখানে প্রশ্ন এই যে আগে তিনিই তাকে নির্বাচন করেন, কিংবা সেই ব্যক্তিই তার
জন্য নিজেকে নির্বাচন করেছে ?

উত্তর : এ বিষয়ে তোমার বৈদিক দিবে খুশি বলতে পারো। কে প্রথমে শুরু
করলে তা কি ঠিক জানা যায় ! তবে সাধারণত দুইই একত্রে হয়ে থাকে।

কোন দিকের কাজটি প্রথম শুরু হবে, তা যদি বুঝতে চাও তাহলে ভেবে দেখ যে ভগবান
কখন মানুষের আগে, তখন প্রথম নির্বাচন তিনিই করবেন। তবে পাখির জীবনের আগের
থেকেই সে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ-চেতনার ক্ষেত্রে এসে তার পরে এটা
আগে না এটা আগে বা দুইই একত্রে ঘটতে পারে। তবে এটাই সম্ভব যে কোন ব্যক্তি ঠিক
প্রস্তুত হয়ে উঠেছে তা প্রথমে ভগবানই নিরূপণ করেন। প্রস্তুত হয়ে থাকলেও সে ব্যক্তি
নিজে তা প্রথমে জানতে পারে না, সে ভাবে যে সে-ই বুদ্ধি নিজেই প্রথমে ভগবানের দিকে
স্বাভাব পথটি বেছে নিয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক তা হয় না, এটা তার একটা ধারণা মাত্র।

কিন্তু একবার যদি তুমি নির্বাচিত হয়ে গিয়ে থাকো, তাহলে আর তোমার নিস্তার নেই,
হাতার চেঁচাতেও এর অনোষ ত্রিয়ার হাত থেকে এড়াতে পারবে না।

*

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি ভগবৎ-নির্বাচিত হয় সে কি জন্ম থেকেই তা জানতে পারে ?

উত্তর : জন্মেরও আগের থেকে।

হয়তো সেই নির্বাচনের কলেই তার জন্ম। তাই সাধারণত হয়ে থাকে। কিন্তু
জীবনকালেও তা হতে পারে। যারা পূর্বনির্বাচিত তাদের জন্মের আগেই তা ঘটে থাকে,
তারা বিশেষ কোনো অভিশ্রুয় এবং নক্ষত্র নিয়েই এখানে এসে জন্মান।

তোমার বেলাতেও তাই হয়েছে কি না সেই কথাটাই জানতে চাইছি তুমি ? (হাস্য)

বেশ হো, জানার চেষ্টা করো, অতঃপরীণ আশ্রয় নিয়ে একাগ্রতাপ সঙ্গে জানতে প্রয়াস করো। কোনো-কিছু জানতে পারলে অন্যকে জানিয়ে, আনি বলে দেখো তা ঠিক হলো কি না।

*

প্রশ্ন ভগবান কি তাঁর কাজের জন্য একটি লোককেই নিৰ্বাচন করেন, না অনেককে?

উত্তর অনেককেই করেন। কিন্তু তার মধ্যে কিছু শ্রেণীভেদ আছে। সত্যকার শ্রেণীভেদ না বুঝলে আধ্যাত্মিক জীবনের কিছুই বুঝতে পারবে না।

ও তিনিসটা আসে একটা ফাশন নয়। মানুষী চিন্তার মধ্যে এনিকে একটুও চান নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিকের দিক থেকে দেখলে দেখবে যে ওটা আপনা হতেই আসে নিত্যস্থ অব্যবস্থাপে। তাহলে ওর মধ্যে যদি কোনো শ্রেণীভেদ থাকে তবে প্রত্যেকেরই জন্যই একটা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীতে স্থান থাকে; আর প্রত্যেকেরই আপন আপন স্থানে তার আপন সত্যটি পূর্ণ ও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ যেখানে যে যেমন অবস্থানে বসেছে সেখানে ঠিক সেইভাবেই ভগবানের সঙ্গে তার একটা পরিপূর্ণ সংযোগ হয়েছে। অথচ সমগ্রভাবে দেখলে এই শ্রেণীভেদও পরিপূর্ণ রকমে সত্য। আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে এইটি আগে বোঝা দরকার, যদিও তা খুবই কঠিন। প্রত্যেকের হাটাই হতে পারে ভগবানের সার্থক অভিব্যক্তি, যদি সে তার স্বস্থানে অবস্থিত হয়ে তৎসুযোগী কাজ করতে পারে।

*

প্রশ্ন কিন্তু যদি এই শ্রেণীভেদ সত্ত্বে তাদের কিছু না জানা থাকে?

উত্তর সে কথা কারো জানার দরকারই নেই যে কে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত। যেখানে কোনো আধ্যাত্মিক সম্মেলন গড়া হচ্ছে সেখানে তা জানার দরকার হতে পারে। কিন্তু সাধারণত ভগবতে বিভিন্ন শ্রেণীতে এত বহু ফাঁক পেকে যায় যে মনে হয় সবাইই একটা বিন্দুমান।

সম্পূর্ণ যে স্তরজন তা সব কিছুকেই আপন অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, তার মধ্যে স্থান-কালের কোনো সম্পর্কই নেই। কিন্তু এ কথা বাস্তবে উপলব্ধি করতে গেলেই মুশকিল হবে। এ যেন তুমি এমন এক বস্তু বুনতে চাইছ যার সর্বত্রই ছিন্ন এবং তার মধ্যে কোনো সজতি নেই। বা বুনতে চাও তার মধ্যে অনেক মানুষ বাস পড়ে যাচ্ছে, অনেক গুর ও বাস পড়ে যাচ্ছে। দাবার ছকের মধ্যে ঝুটিওলো বাস পড়ে যাচ্ছে, মিলছে না কোনো কিছু। একটা বিন্দুমান জিনিস। অথচ সব-কিছু যদি তার স্বস্থানে থাকে আর জিনিসটাকে সমগ্রভাবে দেখতে

পায়ো, তাহলে সেখানে প্রাণিতন্ত্র শ্রেণীশৃঙ্খলা ও পূর্ণ সঙ্গতি দেখা যাবে। সেই পূর্ণ শৃঙ্খলা বাস্তবিকই রয়েছে, এই অভিযুক্তি বিশেষই রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে নয়। এখনও মূল পৃথিবীতে তা দেখা দেয়নি। অভিনবানস রূপান্তর ঘটলে তখন হয়তো তা ঘটবে; স্বতঃস্ফূর্ত ও পরিপূর্ণ বর্ধার শ্রেণীবদ্ধ অভিযুক্তির জন্য জগৎ তখন প্রস্তুত হয়ে উঠবে—জবরনতি কিছু থাকবে না—যেখানে প্রত্যেকেই আপন পূর্ণতার পৌঁছবে।

★

প্রশ্ন : কিন্তু এই শ্রেণীভেদের স্বরূপ কি? কারণ ও-কথা বললেই ছোটো বড়োর মূল্যভেদ একটা বোঝায়।

উত্তর : হাঁ, কিন্তু সেটাই একেবারে ভুল কথা। অর্থাৎ বাস্তবের ক্ষেত্রে ভেদন বোধ হলেও আমি যাকে শ্রেণীভেদ বলছি তা আদৌ অবন জিনিস নয়।

★

প্রশ্ন : তাহ'লে এখানে শ্রেণীভেদের ব্যাপারটা কি?

উত্তর : প্রত্যেকের নিজস্ব প্রকৃতির ক্রিয়া ও সক্রিয় অভিযুক্তির একটা স্ফংগন। এর একটা তুলনা সেখানকার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তা কালের হলো না, কারণ বাস্তবের কোনো-কিছুর সঙ্গে তা মেলে না। ছোটো বড়োর পার্থক্যবোধটা এসেই পড়ে।

এর সঙ্গে মেহের বিভিন্ন অঙ্গের ও তার ক্রিয়াভেদের একটা তুলনা যে ওয়া যেতে পারে। বেনন মাথা আর পা, সেখানে যদি বলো যে মাথাটা উপরদিকে রয়েছে বলে তা বড়ো আর পা নীচের দিকে বলে তা ছোটো—তাতে বেনন বিপর্যয় হটে ঠিক ভেদনি।

★

প্রশ্ন : প্রত্যেক কিছুই হো যুগপৎ পূর্ণ ভগবান, তবে তার মধ্যে শ্রেণীভেদের কথা আসে কেন?

উত্তর : হাঁ, প্রত্যেক বস্তুর ভগবানের সঙ্গে প্রত্যেক ও নিবিড় সংযোগ রয়েছে।

★

প্রশ্ন : তাহলে সব কিছুই কি সমগ্র ভগবান নয়?

উত্তর : হাঁ, সব-কিছুই ভগবান, কিন্তু সমগ্র ভগবান নয়, কারণ সেখানে তার মানে হবে সর্বগত ও সর্বব্যয় ভগবান। ভগবানের একটা কণামাত্রকে নিয়ে তুমি বলতে পারো না, “এই হলো সমগ্র ভগবান।” অর্থাৎ প্রত্যেকে তার আপন অধ্যাক্ষ-চেতনাত্তে ভগবানের সঙ্গে পূর্ণভাবেই সংযুক্ত, অর্থাৎ তার আপন দিক থেকে সে সম্পূর্ণই ভগবানস্বরূপ। কিন্তু

গোটা ভগবানকে আনতে চাইলে সেখানে তাঁর সমগ্রতার ভাবটাই আনতে হয়। আর সেখানেই সরেছে শ্রেণীবিভাগের প্রশ্ন। কিন্তু তথাপি যেহেতু প্রত্যেকেই আপন আপন স্থানে সম্পূর্ণ ও সার্থক। সেই হেতু তার মধ্যে ছোটো বড়োর কোনো মূল্যভেদের প্রশ্ন নেই।

সাধারণ মানব-মন দিয়ে এ কথা তুমি বুঝবে না। আপন জীবনের মধ্যে উপলব্ধি আসা চাই, সর্বাং জীবনের তেমন অবস্থার মধ্যে যখন প্রবেশ করবে তখন দেখবে যে কথাটা খুবই সহজ, পরিকার আলোর মতো সহজ। কিন্তু মনের তরফ থেকে এ কথা বোঝা যাবে না। কারণ মনের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে গেলেই তখন প্রত্যেক কিছুকে আগে ভাগ ক'রে নিতে হয়, একটার বিরুদ্ধে অন্যটাকে ঝাঁড়ু করিয়ে তুলনা ক'রে দেখতে হয়, নতুবা জিনিসটাকে বোঝা যায় না, গওগোল বেধে যায়। মনের এই বিচারপদ্ধতির কারণেই আসল কথা সে বুঝতে অপারগ হয়।

★

প্রশ্ন : কেমন ক'রে বলব যে “অনুক ব্যাপার ষটে গেছে,” যখন তার কোনো বাহ্য অভিব্যক্তি বা চিহ্ন নেই? ভগবান কাউকে যত্নসঙ্গে নির্বাচন করেছেন এ কথা কেমন ক'রে বলি, যখন তার কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না?

উত্তর : হাঁ, সে কাল্পনা হয় ভিতরে ভিতরে, অনভিব্যক্তির রূপতে; সেখানেই তা আগে বিরীকৃত হয়ে থাকে, কেবল তা বাইরে কোনো দিন প্রকাশ পাবার অপেক্ষা থাকে।

ব্যক্তির সম্পর্কেও সেইরকমই হয়, যেমন ধরো হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাপারে, যা তোনাসের বহরার বলেছি। কোনো-এক উপরের স্তরে ভেদে এসে আমি শ্রীঅরবিন্দকে বলেছিলাম, “ভারত স্বাধীন হয়েছে।” আমি তখন বলিনি যে “স্বাধীন হবে”, বলেছিলাম “স্বাধীন হয়েছে।” কিন্তু উপরে তাই সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পরেও বাস্তবে তা দেখা দিতে কত বছর লাগল? আমি ও-কথা বলেছিলাম ১৯১৫ সালে, আর স্বাধীনতা এলো ১৯৪৭ সালে, সর্বাং ৩২ বছর পরে। বাঙালো ভেদ ক'রে আসতে এতটাই সময় লাগে। ব্যক্তির বোলাতেও তাই, কখনো বা এননই দীর্ঘ সময় লাগে, কখনো বা তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।

★

প্রশ্ন : আপনি বললেন, ভারতকে আপনি স্বাধীন দেখেছিলেন.....

উত্তর : না দেখার কথা বলিনি, আমি ভেবেছিলাম।

★

প্রশ্ন : যখন শ্রীঅরবিন্দকে ও কথা বললেন তখন কি ভারত সম্পূর্ণই স্বাধীন হয়েছিল?

উত্তর : যা ঘটেছে ১৯৪৭ সালে সেই কথাই বলেছিলেন, সর্বাত্মক বিদেশীর শাসন হতে গেল। তা ছাড়া আর কিছু নয়। নৈতিক বা আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার কথা যাচৌ বলিনি। শুধু বলেছি অধীনতা হতে মুক্তির কথা। এমন কি শ্রীমদবিশ্বকোষ প্রণেতা উত্তরেও কথাও বলেছি, “কোনো রক্তপাত হবে না, বিনা রক্তবিপ্লবে তা সম্পন্ন হবে, প্রতিশ্রুতি আপনা হতেই ছেড়ে যাওয়া সিদ্ধান্ত করবে, ঘটনাচক্রে এখানে থাকা তাদের পক্ষে অসাধ্য হবে।” এই হলো বোটা কথা, আধ্যাত্মিক দিকের কোনো প্রশ্নই নয়। ১৯১৫ সালে শ্রীমদবিশ্বকোষ বললান যে এই ব্যাপার হয়েছে; এ কোনো ভবিষ্যদ্বাণীর মতো বলিনি, যথার্থ ই তা ঘটেছিল।

এর থেকেই বুঝতে পারবে যে কোনো-কিছু ধার্য হয়ে যাবার পরেও বাস্তবে তা প্রকাশ পেতে কতখানি সময় লাগে। ব্যক্তির বেলাতেও তাই। সে যখন নির্ধাচিত হয় তখন নিজেসঙ্গে সে নির্বাচন ক’রে নেয়। ভগবানও যেমন তাকে চাইলেন, সেও তেমন ভগবানকে চাইলেন। যা ধার্য হয়ে গেছে তা ফলবেই; তাতে বিলম্ব হতে পারবে কিন্তু বার্থ কখনই হবে না।

*

প্রশ্ন : কিন্তু না, ১৯১৫ সালে আপনি ভারতের যে স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন তা কি এখনকার মতো স্বাধীনতা? কারণ পুরো ভারত স্বাধীন হয়নি, দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে।

উত্তর : ও, তুমি তাই জানতে চাও? কিন্তু তখন এমন কথা মূর্খিণে জানা ছিল না, যদিও এমনি একটা কিছুই সম্ভাবনা নিশ্চয় ছিল। কারণ শ্রীমদবিশ্বকোষ যখন ক্রিপ্ত প্রত্যাহার সন্ধান করে এখানে থেকে বলে পাঠানেন, তখন নিশ্চয় তিনি জানতেন যে—সেই প্রত্যাহার মেনে নিলে এ জিনিসটা এড়ানো যেতো। ওয়া যদি তাঁর নির্দেশটা ওনতো তাহলে সেরকবে এমন ভাগ করা হতো না। এটা ভগবৎ-অভিপ্রায় নয়, মানুষেরই ভাঙাচোরা, তাতে সন্দেহ নেই।

*

প্রশ্ন : তাহলে কেনন ক’রে বলি যে ভগবানের অভিপ্রায় অব্যর্থ, যখন ভারত স্বাধীন হওয়া তাঁর ইচ্ছা থাকলেও কাজে তা সফল হলো না?

উত্তর : না গো ছেলে, কথাটা ঠিক ঐরকম নয়। এ একটা সাময়িক ঘটনা মাত্র, তা ছাড়া আর কিছু না। ভগবানই এই ভারত, ভগবানই স্বাধীনতা, ভগবানই অধীনতা, সবই যখন তাঁর মধ্যে, তখন কেনন ক’রে বলবে কোনটা তাঁর অভিপ্রায়? আমি বলি, আসল কথাটা যদি জানতে চাও তো উপরে উঠে যাও, সিঁড়ির শেষ সোখার গিয়ে না উঠলে কিছু বুঝতেই পারবে না।

*

(২)

প্রশ্ন শ্রীঅবিশ্বাসের “যোগ সমন্বয়ে” (“The Synthesis of Yoga, P. 108”) লেখা রয়েছে—“আমরা যাকে নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা বলে ভুল করি তা শেষ পর্যন্ত বড়ো জোর সামান্য কিছু আপেক্ষিক স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তাও দেখায় নরীচিকার মতো। কারণ প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিই সেটা আপায় তার আপন প্রণালীতে, আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাপ্রবৃত্তির মাধ্যমে; সেখানে প্রকৃতির শক্তিই আমাদের অধিকার করে আছে, আর সেই শক্তিকে মুক্ত করেই আমরা বিভিন্নরূপে তাকে নিজেদের ইচ্ছা বলে প্রকাশ করি। আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীন অহং কিছুই করে না, বরং জীবনের প্রতি বৃহত্তর প্রকৃতিই বাৎসে দেয় যে কখন কোনটা আমরা চাইব, তা যুক্তিমূলক ইচ্ছার ভিতর দিয়েই যৌক বা চিন্তাব্যবহিত বৌকের ভিতর দিয়েই যৌক।”

এ কথার ভিতরকার অর্থটা কি একটু ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন?

উত্তর: অসংখ্য বারই তা জোনাদের বুঝিয়েছি।

জোনরা জানে যে নিজের মতলবেই জোনরা সব-কিছু করত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাইরের থেকে কিছু তাদের আসছে, তাতেই মতলবটা তৈরি হচ্ছে। জোনরা জানে যে নিজেদের ইচ্ছা সম্বন্ধে জোনরা খুবই সচেতন, কিন্তু সে চেতনা জোনাদের নিজের নয়। জোনাদের সবটাই প্রকৃতির শক্তিতে গড়া, এবং তাও প্রকাশ করছে কোনো উচ্চতর শক্তিকে যার সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানে না। কেবল যখন তিনি আপন অহংএর ভিতর থেকে এক বৃহত্তর জ্ঞানও বেরিয়ে আসতে পারেন তখন এ কথা বুঝতে পারেন। জোনার অহং নিঃসন্দেহে জেনে রেখেছে যে সেই সকল কাজের কর্তা, আর তাতেই তার এত জোর। কিন্তু একটু লক্ষ্য করে দেখলেই বুঝবে যে ওর নিজের থেকে ও চলেছে না, সাইরের নানা কিছু ব্যাপার থেকে বেরন চানোচ্ছে ও তেননি চলেছে।

*

প্রশ্ন: তাহলে আমাদের মনোবল ইচ্ছা ও প্রাণবল ইচ্ছা কাকে বলি?

উত্তর: তা কারো ব্যক্তিগত জিনিস নয়। একটু প্রাধান্য করলেই দেখবে যে আজ তিনি যে কথাটা জানছেন তা অন্যসবর অন্য লোকেরাও ভেবেছে; সকল ব্রহ্মবল জানবাই সকল জ্ঞানে বুঝে বেড়ায় আর কখনো বা জোয়ার মধ্যে ঢুকে তা প্রকাশ পায়, কিন্তু তিনি নিজে সেই সকল ভাবনার আদি উৎস নয়। পূর্বগ ব্যক্তি যারা জোনাকে জ্ঞান দিয়েছে, আর যে পরিবর্তিত মধ্যে তিনি লালিত পালিত হয়েছে, তাহলেই জিহ্বাতে যে প্রতিক্রিয়া জোয়ার মধ্যে জেগেছে, আর যে সকল সংস্কার জোয়ার মধ্যে এসে জমা হয়েছে,—এই সব-কিছু একজোটা

হয়ে এখন যে জিনিসটা ছাড়িয়েছে তাকেই তুমি বলে বলছ তোমার আমি বলে, কিন্তু তা তোমার তোমার নিজস্ব গড়া কিছু নয়, ওটা তোমার একটা বোধ এবং অনুভব মাত্র। যদিও তাকেই তোমার আপন বস্তু বলে জানাচ্ছে নটে, কিন্তু তোমার নিজের দ্বারা তাব কিছুই তৈরি হয়নি।

প্রায়েকোনে যেমন হয়ে থাকে, একটা যন্ত্রের দ্বারা কোনো থামের বা কপার শব্দতরঙ্গ ধরে নিয়ে অন্য যন্ত্রের দ্বারা তাই পুনরাবৃত্তি করা,—সেখানে কি তুমি বলবে যে ঐ প্রায়েকোনই সেই শব্দগুলির সৃষ্টি করেছে? তা কখনই বলবে না। এর বেনাতেও তাই, কিন্তু এর বেনাতে তোমার মধ্যে রয়েছে একটা স্বাভাবিক ব্যক্তিবোধ, আর চিন্তাগুলি তোমার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে একটা ব্যক্তিগত অনুভব জাগিয়ে দেয়, আর সেই অনুভব তোমার প্রশংসার মধ্যেও জেগে ওঠে, তাতেই তুমি বলে বলছ যে ওগুলি তোমার নিজের ভিতরকার জিনিস। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়! তোমার “তুমি” কোথায় রয়েছে যে এগুলির সে সৃষ্টি করবে?

তুমি যদি তোমার নিজের ভিতর দিকে প্রবেশ করে গভীর থেকে গভীরতর স্থানে চলে গিয়ে আপন সত্তার শাশ্বত মূল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারো, তাহলে তোমার আসল সৃষ্টিবলের সম্মান পাবে, আর তখন দেখবে যে সেই একই জিনিস রয়েছে সকলেরই মাঝে। তাহলে তোমার একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলে কিছু রইল কি? কিছুই না।

হ্যাঁ, তোমরা মনে চিন্তাগুলিকে ধরবার এবং ছাড়বার যন্ত্ররূপ মাত্র, এবং তার মধ্যেও অস্পষ্টতার নানারূপ বিকার রয়েছে—ভালো মশ দুই প্রকরই। এ বস্তু হলো অটীত জটিল, এর ভিতরকার কলকল্প এমন যে কোনো জিনিস একজননের ভিতর থেকে অন্যজননের ভিতর যেতে যেতেই অনেকখানি বদলে যায়। অথচ জিনিসটা একই, একই চেতন-ইচ্ছার পরিচালিত, আর সঙ্গে কোনো ব্যক্তি-ইচ্ছার সম্পর্ক মাত্র নেই।

বুদ্ধ যখন এই কথাটি তার শিষ্যদের বুঝিয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন যখনই তুমি নিজের মধ্যে কোনো কামনার তরঙ্গকে জাগাতে লাও, সে তরঙ্গ অন্যের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়, আবার সারা বিশ্ব ধরে তা তোমার কাছে ফিরে আসে। কিন্তু তা কেবল একটা জিনিস নয় আর তুমিও তার একটিনাত্র কেন্দ্র নও—প্রত্যেকেই এক এক কেন্দ্র—সুতরাং এমন এক জটিলতার সৃষ্টি হয় যে নিজেকে তখন চেনা যায় না। অথচ সে তরঙ্গ একই কেন্দ্র নিয়ে ঘুরতে থাকে; কেবল ঐ জটিলতার কারণে মনে হয় বৃষ্টি আলাদা আলাদা জিনিস। কিন্তু বস্তুত আলাদা বলে কিছু নেই, সবই এক,—একই শক্তি ও চেতনা ও ইচ্ছা নানা বৈচিত্র্যে কাজ করে।

- জিনিসটা এমনই জটিল যে এর কিনারা করা যায় না। কিন্তু যদি এক পা পিছনে হটে ওর ক্রিয়াকে কিম্বা কে-কোনো ক্রিয়ার একটি ধারা অনুসরণ করে তবে দেখবে যে ওর তরঙ্গ চলেছে প্রবাহের মতো এবং তা আসছে একই পদার্থ একই চেতনা একই ইচ্ছা হতে; তা একই জিনিস। স্বাভিহেতু তা হায়ের দেখার বিচ্ছিন্ন জিনিস, সেটা পার্থক্যবোধেরই দ্বারা।

*

প্রশ্ন কানলাগুলিও কি তাই ?

উত্তর কাননা মোটেই কারো ব্যক্তিগত জিনিস নয়। এ গন্ধক সহজেই জানতে পারা যায় কানন শতকরা নব্বুই ভাগগাতে অতি সহজে দেখে যে তা এসে পড়ল বাইরের কোনো ব্যক্তি বা ঘটনাসূত্র বা ঘটনা-পরম্পরা থেকে, কিংবা একজনের বা বহুজনের দ্বারা জাগিয়ে তোলা কোনো লক্ষন থেকে। তাকে সহজেই চেনা যাবে, কারণ তা ঠিক তেননি লক্ষন তৈয়ার মধ্যে জাগিয়ে তুলবে। একটা কিছু এসে যেন তৈয়ার মধ্যে বাধা বারবে আর অননি সেখানে তার অনুকূল গাড়া জাগবে, বাধ্যত্বের কোনো চাষিতে হাত দিলেই যেমন সুরটি বেজে ওঠে। কাননার লক্ষনও এসে তেননিভাবেই তৈরাকে ল্পর্শ করে আর অননি তুনি তার অনুকূলভাবে গাড়া দাও।

এমন কি শৈশবকালেও এ কথা লক্ষ্য করে দেখলে বোঝা যায়। শৈশবে তৈয়ার নানা রকম গোপ্তগত ভাবের মধ্যে নিভা বাস করো। তৈরন পারিপাশ্বিকের মধ্যে থেকে কেউ কখনো শব্দাত্মক গদ্যে গৌড় কি না, কিংবা কোনো বাড়িতে কারো মৃত্যুর সবর উপস্থিতি থেকে কি না বলতে পারি না—কিন্তু তৈরন অবস্থার গিয়ে যদি পড়ো, আর অবশ্য তখন একটু পর্ববেক্ষণের ননোভাব নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে, নইলে কিছু জানতে পারবে না,—তাহলে তখন দেখবে যে সেই ব্যক্তির মৃত্যুতে যদিও তৈয়ার নিজে কোনো দুঃখ বা শোক চন্দ্রাবার কিছুই কারণ নেই, হয়তো কোনো মৃত্যুর আত্মীয়তা বা সামাজিক কারণে তৈরাকে সেখানে যেতে হয়েছে—তথাপি বিনা কারণেই তুনি নিজের অজ্ঞাতে শোকে উষ্মন হয়ে উঠলে। তখন আশ্চর্য হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করবে, “আমি কেন এমন কাতর হয়ে পড়লাম ?” তার কারণ আর কিছুই নয়, সেখানকার শোকের লক্ষনগুলি তৈয়ার মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

বলছি, এ জিনিস লক্ষ্য করা খুবই সহজ, আমি নিজেই শৈশবে এমন ব্যাপার লক্ষ্য লক্ষ্য করে দেখেছি (তখন আমি সন্তানে কোনোরকম যোগ গুরু করিনি কিংবা হরত কয়ে-ছিন্নান নিজের অজ্ঞাতে)। ঐরূপ অবস্থার হঠাৎ শোকার্ত হয়ে পড়ছি দেখে আমি নিজেই বললাম, “নিশ্চয়ই এ শোক আমার নিজের ভিত্তিকার নয়, কারণ এ শোকটির মৃত্যুর মুখ আমারকে মোটে ল্পর্শই করেনি, তবু ওদের ভরফের শোকটাই আমারকে নেগেছে।” বেশ লক্ষ্য করলাম যে হঠাৎ আমার চোখে জন এসে পড়ল, কান্নার গলা বুকে এলো, প্রায় সমস্তে কঁপে কেলি আর কি, যেন কতই বাধা পেয়েছি—অবশ্য তখন আমার বয়সটাও খুব কম—কিন্তু তবুও সেই সঙ্গে বুঝতে পারলাম যে ওদের শোকটাই আমার মধ্যে কাজ করে।

ক্রোধের বেলোতেও ঠিক এই হয়। অবশ্য ক্রোধ জিনিসটা কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে আসে না, তা আসে আবহাওয়া থেকে ; আবহাওয়ার মধ্যেই তা হাজির থাকে, হঠাৎ এসে ঢুকে পড়ে। প্রথমে এসে তা অধিকার করে তৈয়ার নীচের অংশগুলিকে, তারপরে তৈয়ার

মাথার চড়ে যায়, তত্বেই তুমি কোণে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠো। চয়তো তার এক যিনিটি আপে পর্বন্ত তোরার মধ্যে রাখেন চিহ্নবাত ছিল না, নিষের উপর তোরার পুনোই ধ্বল ছিল, রাগ প্রকাশের কোনো সংকল্পই ছিল না। অথচ হঠাৎ ক্রোধের উদয় হয়ে তোনাকে এমন অতিভূত ক'রে ফেনালে যে নিজেকে আর তুমি সংবরণ করতে পারলে না— কারণ তুমি যথেষ্ট সতর্ক না থাকায় সেই ক্রোধ তোরার মধ্যে ঢুকে পড়ে তোনাকে ঐভাবে খেলাচ্ছে— অর্থাৎ তোরার দেহবস্ত্রকে ঐভাবে উত্তেজিত করছে, যাকে তুমি তোরার “আনি” বলো; আপাতদৃষ্টিতে তোরার ঐ দেহ অনেকের থেকে স্বতন্ত্র, ভাই বলছি। কিন্তু তাও তোরার চোখের বাঁধা, কারণ প্রত্যেকেরই দেহ থেকে অশুভা শূন্য কথাগুলি নিভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে আর পরস্পরের মধ্যে গিয়ে নিশেছে, তা স্থলেরই কথা। কিন্তু শূন্য অনুভূতি থাকলে তা দূর থেকে ও টের পাওয়া যায়।

তোনার জানানো যে অল্প ব্যক্তির। এতই শূন্য অনুভূতিসম্পন্ন হয় যে সামনে কিছু এলে তারা তা দূর থেকেই জানতে পারে। আর নিজেরাও এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারে। খুব নিঃসাড় করে কাছে গিয়ে হাতখানি তার দিকে বাড়িয়ে ধরো—তার অনুভূতি শূন্য হলে সে তখনই তা জানতে পারবে। সেখানে তুমি কোনো ইচ্ছাপ্রবৃত্তির প্রয়োগ করো নি, কোনো বন্যাবাহিক প্রয়োগ করোনি, শুধু একটা স্থল পরীক্ষা চালিয়েছ, ওখুই নিঃসাড় হাত বাড়িয়ে দিয়েছ—তবু সে তখনই তা টের পাবে।

সেহাটাকে তোরার দেখে নিতান্ত সীমায়িত, কিন্তু তা চোখের শেষে, তোনালের চোখ ঐভাবেই গঠিত। চোখে যদি আরো কিছু ব্যাপক রকনের শূন্যদৃষ্টি থাকতো তাহলে সেখান থেকে যে সকল সেদ থেকেই কিছু নিঃসৃত হয়ে পরস্পরের মধ্যে গিয়ে নিশেছে এবং তার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে একটা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে।

*

প্রশ্ন গ্রীষ্মকাল কাকে বলেন “ক্রিয়াশক্তি এক?”

উত্তর সেই কথাই বলছিলাম। এমন এক সক্রিয় শক্তি রয়েছে যা সকল কিছুকেই পরিচালিত করছে, তার সম্বন্ধে চেতন হলে সেখানে যে একই শক্তির দ্বারা সব-কিছু ঘটছে; তার ক্রিয়াকে অনুসরণ করে তুমি জানতেও পারবে যে সকল রকনের বস্তু ও মানুষের মধ্যে তা কিভাবে কাজ করছে।

শক্তির এই একর সম্বন্ধে—অর্থাৎ শক্তির এবং চেতনার এবং ইচ্ছারও একর সম্বন্ধে যখন তুমি সচেতন হবে তখন তোরার নিজের এই স্বাভাব্যবোধও আর থাকবে না; এই যে তোরার মনে হচ্ছে যে অন্য সকলে তোরার চেতনার মধ্যে নয়, কারণ তাদের ভিতরকার কথা কিছুই তুমি জানতে পারছ না, তুমি আপন চাবডার খোলার মধ্যে এমনই আবদ্ধ যে কেবল বাহ্য আপনপ্রদান ছাড়া তাদের সঙ্গে আর কোনো সংস্পর্শই নেই,—এ ভাবটি আর থাকবে না।

এমন হবার কারণই তাই যে সমস্ত চেতনার ও শক্তির ও ইচ্ছার এই একই সম্বন্ধে তোবার কোনো বোধ চন্দ্রানি এমন কি বাস্তব স্পন্দনের একই সম্বন্ধেও না।

জটিলতা এসেই প্রকৃত বোধের পক্ষে অস্তর্য্য হইতে শাড়াই। বোধশক্তি কাজ করে সোজাতরঙ্গি একটা লাইন নিয়ে; কিন্তু কোনো-কিছু বুঝতে চাইলেই নানারকম পরস্পর-বিরোধী তিনিস এসে জড়িয়ে থাকিরে জিনিসটাকে এমন অটল করে তোলে যে কোন লাইন ধরে তুনি যাবে তা বুঝতে না পেরে কেবল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পাক খেতে থাকে।

আর অধিকাংশ মানুষই চিন্তা করে একটার পরে অন্যটা নিয়ে, যেমন আনন্দের কথাও বলে থাকি একটার পরে অন্যটা—সবগুলো কথা একসঙ্গে কেউ বলতে পারে না, বলতে গেলেই ভোংলানি এসে যায়। ভাবনা করার বেনাতেও তাই, একটার পরে অন্যটা, কারণ সবগ্রহ চেতনাই চলে একনাইন নিয়ে। কিন্তু প্রকৃত বোধ বর্ধন এসে পড়ে তখন তা কাজ করে বৃত্তভাবে, চিন্তার কাজ ও হয় সান্দ্রিক বৃত্তভাবে, তাই অসংখ্য চিন্তা ও অসংখ্য বোধ একসঙ্গেই সম্ভব হতে পারে। এখনও পর্যন্ত কোনো-কিছু বর্ণনা করতে হলে তোমরা একটার পর একটা নিয়েই বলবে, একসঙ্গে দশটা কথা বলতেই পারবে না। তাই যা কিছু তোমরা বলো তাতে সমগ্র সত্যটা ব্যক্ত হয় না, কারণ ভাগ করে তোমাদের বলতে হচ্ছে, তাতে সবগ্রহকে প্রকাশ করা হচ্ছে না। জানা চাই এবং বলাও চাই সবগ্রহটা একযোগে, যেমন ভাবে তা থাকে। তাই যখন দেখতে এবং বুঝতে এবং চিন্তা ও ইচ্ছা করতে পারবে তখনই ঠিক সত্যের সানুগো পৌঁছবে। কিন্তু এইভাবে বতদিন দেখছো এবং বলছো, তা তোবার নিছক সৈন্য।

*

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন (The Synthesis of Yoga, P. 108)
 “বর্তমান পর্যন্ত আমরা যজ্ঞানন্দের বোধবৃত্তি নিয়ে জীবন কাটাই ততকাল পর্যন্ত নিজেকেই অহং নিয়ে প্রকৃতির নিয়মের দাস হয়ে থাকি। বাইরে যখন যেমন দেখি তারই অনুগত হয়ে পড়ি আর বৈতত্যের মধ্যে বাঁধা পড়ি, ভালো এবং বন্স, পাপ এবং পুণ্য, কান্না এবং হাসি, দুখ আর দুঃখ, সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্য, জয় আর পরাজয়, এরই মধ্যে টানাপোড়েন চলতে থাকে, আর লোহা দিয়ে কিংবা সোনা-লোহা দিয়ে বাঁধানো মায়াচক্রে কেবলই অসহায়ের মতো আবর্তিত হতে থাকি।”

উত্তর হী, তাই। অনেকে যা সূর্যবাহুসোয়ার জীবন ভোগ করে, আর অনেকে যা দুঃখকষ্টের জীবন ভোগ করে। তা নির্ভর করে ব্যক্তিগত নিয়তির উপর, আর যে কাদের জন্য তারা এখানে এসেছে হরত তার উপর, আর যে-জনের অবস্থান করছে তার উপর, অর্থাৎ অনেক কিছুই উপর। এ কথা নিশ্চয় যে কেউই নিজের নিয়তিকি নিয়ে যেহে

নেয় না। তা যদি হতো তাহলে অধিকাংশ লোকই চাইত একই রকমের নিয়তি, আর তাহলে পরম্পরের মধ্যে বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য থাকতো না, একটা একঘেয়ে ব্যাপার হয়ে পড়তো।

অধিকাংশ লোকেই চায় “শান্তির নির্ভরতা জীবন”, অর্থাৎ তারা পাকবে নিজেদের অভ্যন্তর ও বনোবস্ত আবেষ্টনের মধ্যে—যা হয়তো নিত্যস্থ আণুবীক্ষণিক রকমে ছোটো—তার মধ্যে থেকে তারা গভীর্ণগতিকভাবে নিজেদের কাজ ক’রে একটা বাঁধা রাস্তায় নিরুপলব্ধে দিনগত জীবন যাপন করবে, একই পরিবেশে একই গভীর মধ্যে থেকে তারা একই রকম ভাবে দিন কাটাতে আসতে যেন কোনো বিপত্তি না ঘটে, নাশে নাশে অবশ্য থাকবে কিছু বৈচিত্র্য যাতে জিনিষটা নিত্যস্থ বিরক্তিকর হয়ে না ওঠে, কিন্তু সেই শান্তিপূর্ণ সৈন্যগণ যানিচক্রটি যেন নিত্য বজায় থাকে। অধিকাংশ মানুষের পক্ষে এই হলো আদর্শ। অতঃপর ঠিক কেমনটি হলে এ আদর্শ সার্থক হলো তার বিস্তারিত বিবরণ নির্ভর করবে যে দেশে যে সমাজে যে পরিবেশের মধ্যে ও যে রীতিনীতির মধ্যে সেই ব্যক্তি জন্ম নিয়েছে তারই উপর। সেই দেশের ও সেই সমাজের আচার অভ্যাসের ধারাগুলির ধারাই তা নিয়ন্ত্রিত হবে।

অবশ্য এ আদর্শের ব্যতিক্রমও আছে, কিন্তু তাতেই সূত্রটার আরো প্রমাণ হয়। যেটামুটি যে আদর্শজীবন কানা তা এই যে আবার যেন সচ্ছন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে জন্ম হয়, আবার জীবনে যেন বেশা কিছু কষ্টদুঃখ ভোগ করতে না হয়, আর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে তার হারা যেন কোনো বধবা পেতে না হয়, ছেলেমেয়েগুলি সকলে যেন স্বন্দর ও স্বাস্থ্যবান হয় (তারা ও গেল কোনো যন্ত্রণার কারণ না হয়), কঠিন কোনো রোগে যেন পীড়িত হতে না হয়, আর বৃদ্ধপানে যেন স্নেহ ও শান্তিতে দিন কাটানো যায়। পবিত্রত্বের জীবনে বর্ধন স্রুতি থাকবে না তখন আত্মক মৃত্যু, তাও কষ্টগুলোকেই এড়াবার জন্য।

মূলত এই হলো মার্কজীবন আদর্শ। অবশ্য ব্যতিক্রম বা বিপণীত আদর্শও কারো কারো থাকতে পারে, নতুবা সবই একঘেয়ে হয়। তাই আদর্শের রকমকম থাকবে, এক দেশের মানুষ চাইবে একরকম, অন্য দেশের অন্যরকম। তারপর যে যেমন সমাজে জন্মেছে, যে বেবনভাবে অভ্যস্ত হয়েছে সেই অনুযায়ী হবে তার স্নেহের কল্পনা, যা অন্য সমাজের লোকের সঙ্গে না মিলতে পারে। কোনো ইউরোপীয়ের সঙ্গে কথা বলে দেখ, সে বলবে ইউরোপের মতো স্নেহের ভূমি আর কোথাও নেই। আনি শতাব্দিক ফরাসীকে জানি, তারা বলে ফরাসী বেরের মতো স্নেহের ভূমি অগতে কোথাও নেই। আবার একজন নিগ্রোকে জানি যে ক্রান্তে শিকাপ্রাপ্ত, সে বলে, “নিগ্রো বেরেরের মতো সৌন্দর্য ভগতে কোনো দেশে যেনে না।” এই তো স্বাভাবিক, নয় কি? তেমনি সকল বিষয়েই এই কথা। যে বাড়িতে থাকা জোয়ার অভ্যাস তার চেয়ে ভালো বাড়ি আর হয় না তেমনি যে দেশে ভূমি জন্মেছে, যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে ভূমি বাস করছে, যে খাদ্য ভূমি খাও, যে অভ্যাসগুলি ভূমি করে থাকে—জাই সব চেয়ে ভালো জোয়ার কাছে। ভূমি চাও তারই মধ্যে থেকে

যেন হৃদয়ত ভাবে হেসেখেলেন তোমার দিন কাটে, আর আঘাত কিছু না খেলেই তুমি মৃগি।

এমনটাই হলো সাধারণ মনস্তত্ত্ব। তোমরা ওইই আবর্তনের মধ্যে নিত্য আবর্তিত হয়ে চলচ্—কখনো বা তা লোহা দিয়ে আর কখনো বা সোনা দিয়ে বাঁধানো আবর্তনচক্র—কিন্তু তোমরাও চলবে তাতে আবর্তিত হয়ে, আবার তোমাদের সম্মুখীনও চলবে তাতেই আবর্তিত হয়ে, আবার তাদের সম্মুখীনও সেই আবর্তনেই ঘুরতে থাকবে। আর এই জিনিসই চলতে থাকবে অবহমান কাল। এই হলো ওই মর্ম।

★

প্রশ্ন “যোগ সমন্বয়” (The Synthesis of Yoga, P. 112) প্রবেশে লেখা হয়েছে—“প্রকৃতি হলো এক ক্রিয়ামূলক জড়পঞ্জি, তার উপর যে কাজের জন্য যেমন নির্দেশ দেওয়া আছে সে তাই ক’রে যাচ্ছে; কিন্তু তার মধ্যে থাকেন একজন জ্ঞাতা যিনি পুরুষোত্তম।...ব্যক্তিরদের আত্মা বা চেতন-শক্তি সেই জ্ঞাতা পুরুষের সঙ্গেও একাত্ম হতে পারে, কিংবা ঐ ক্রিয়ামূলক প্রকৃতির সঙ্গেও একাত্ম হতে পারে। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হলে তখন আর সে জ্ঞাতা নয়, নিরস্ত্র নয়, ভোক্তা নয়।”

এখানে প্রশ্ন এই, প্রকৃতি যদি কোনো উচ্চ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে, তাহলে তাতে বিকৃতি হয় কেন?

উত্তর এটা হলো গীতার তত্ত্ব, ঐ কথাই পুরো সত্য নয়।

ক্রান্তি থাকতেই আমি ও-কথা শুনেছিলাম। গীতার ব্যাখ্যাকারীরা বলেন যে যোগ্যকে সাদা দিয়ে আঁটন হয় না—কথাটা ঠিক নয়। তাঁরা ঐ সূত্র ধরেই বলেন যে, “জীবন হলো এই বকনট, একে তুমি বদলাতে পারো না। কেবল এই পর্বত কবতে পারো যে পুরুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তুমি প্রকৃতির সঙ্গে বদলে প্রভু হয়ে দাঁড়াতে পারো।” কিন্তু শ্রীশ্রীশ্রী বলেনছেন এটা গীতারই তত্ত্ব, পুরো সত্য নয়। নিজেদের কাজের সুবিধার জন্য এইভাবে জিনিসটাকে আংশিক নিতে হয়, কিন্তু বা সম্পূর্ণ সত্য তা এটা নয়।

★

প্রশ্ন : কিন্তু তাহলে শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীর অনুগামীরা গীতার এ তত্ত্ব প্রচার করে কেন?

উত্তর যদি করে, তাদের সেটা মৃগি। আবার তাতে আপত্তি নেই।

★

প্রশ্ন : কিন্তু তাহলে শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীর যোগের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই?

উত্তর : সে কথা বলতে পারো না। তবে ওটা হলো সংকীর্ণতর উক্তি, এই পর্বত।

সত্যের একটা বিকের কোণ ধরে বলা যে এই হলো পুরো সত্য। তবে সকলই তাই ক'রে থাকে। কে আর পুরো ভিনিলটা ধরতে পারে? একটা কোনো প্রান্তকে ধরে তাকেই বলে সম্পূর্ণ।

*

প্রশ্ন কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ যখন লম্টে করে বুঝিয়েই দিয়েছেন.....

উত্তর : ও! তুমি কি তারই প্রচারক হবে? তোমার তাই নিয়ে বোঝাতে যাবার কি দরকার? ওরা যদি ঐ রাস্তা নিয়েই খুশি থাকে তো থাক না। ওরা যখন তোমাকে শোনাতো আসবে যে “এই হলো শ্রীঅরবিন্দের তব” তখন অবশ্যই তুমি বলতে পারো যে, “তা নয়, ওটা প্রাচীন তব, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের তব নয়।” এই পর্যন্ত। তাছাড়া তুমি তাদের মত বলতে পারো না। যে যেমন নিয়ে খুশি থাকে তাকে তাই থাকতে দাও।

এটা বেশ সুবিধার পথ। ওতে যে কি সুবিধা হয় তা আমি আগেই জানতে পেরেছি প্যারিসে থাকতে, ভারতে আসার আগে। প্রথম কথা ওতে বহুমূল্য এক গভীর সত্যকে আপন আয়তনের মধ্যে আনা যায়, অথচ সেজন্য বাহ্য প্রকৃতির পরিবর্তনের কোনো দরকার হয় না। খুবই সুবিধা নয় কি? তুমি তখন বলতে পারবে, “কি আর করব, যারি যখন এই বকবে। প্রকৃতি থেকে নিজেই আমি পৃথক করেই নিতে পারি, তার যা খুশি তাই করুক না কেন, কিন্তু আমি নিজে সেই প্রকৃতি নই, আমি হচ্ছি পুরুষ; ওকে যখন বলতে পারি না তখন ও যে বাস্তব চলে চলুক।” অনেকে শ্রীঅরবিন্দের উক্তিগুলির কথা জেনেও এবং বুঝেও এট রাস্তাই ধরে থাকে, তাতে সুবিধা এই যে প্রকৃতিকে বলতে হয় না। তার কাজ সে করে যায়, আর তুমি উপরে উঠে সাক্ষীস্বরূপ থেকে বনো। “ও তো আমি নই, আমি নিজে ও-সব কিছু করছি না।” অনেকে যদিও এই ভাবটি নিয়ে বলে যে আমি পুরুষ হয়ে রইনাম, কিন্তু সানানা কোনো খাড়া খেলেরই তারা কাং হয়ে ফিরে পড়ে সোজা প্রকৃতির মধ্যে আর ভীষণ জুঁজু কিংবা হত্যা বা অস্ত্র হয়ে পড়ে।

আমি এমন একজনকে জানি যে প্রকৃতিই পুরুষ-চেতনার সঙ্গে একাধ হয়ে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু যারা চায় পাখির জীবনের প্রকৃতিকে বলতে, অর্থাৎ যারা চায় যে এখানকার দুঃখষ্টগুলো যেন আর না থাকে, মৃত্যুর কোনো প্রয়োজন না থাকে, এমন কিছু জ্যোতির্বিদ্য বিবর্তনের অবস্থা এসে পড়ুক যাতে বিনাশের অপরিহার্যতা আর না থাকে, এমন কারো কথা ওনলেনই সেই ব্যক্তি খেপে উঠে বলতো যে ওরা সাংঘাতিক বিপ্লবী। হ্যাঁ, ওরকম ভাবুক যারা তারা মারাত্মক ধরনের বিপ্লবী তো বটেই! ধরে জেলে বেওয়া উচিত!

যেটা একজন যোগাপুরুষ হওয়ার কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু যদি বুদ্ধিমান হতে চাও, তাহলে যে যা বলতে চা শুনে যাবে আর শুধু হাসবে, ভিতরে তার বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে দেবে না। নিজের অনুভূতি থাকবে নিজের কাছে, তাকেই বখাসাখা সত্য ও সম্পূর্ণ করে আনতে

চেষ্টা করবে, অনেক অনুভূতি অনোরই থাক। তবে কেউ যদি তোমাকে গুরু বলে বলে, "আমাকে সত্যের ও আলোর পথ দেখাও," তখন আসবে তোমার দায়িত্ব, তার সাধে নয়।

★

প্রশ্ন : যে নৃত্য সত্য আমি জানলাম তা অপরকে জানানোর চেষ্টা করা কি কর্তব্য নয় ?

উত্তর : যদি তোমার এমন ধারণা এসে থাকে যে জগতের মানা জটিলতা ও বৈচিত্র্য নিয়ে সবই ভ্রমবানের যত্নবিভাজি, তাহলে তার সব-কিছুকেই তোমার মনে নিয়ে সেইভাবে থাকতে দিতে হবে, তখন অন্যজনকে তোমার ভাবে ভাবিত করার চেষ্টা করাও অসম্ভব হবে।

প্রত্যেকেরই চিন্তা এবং অনুভব এবং প্রতিক্রিয়া করার আলাদা আলাদা ধরন আছে। অন্য কেউ তোমারই ধরনে চলুক আর তোমারই মতো হোক, এটাই বা চাইবে কেন ? যদিও এমন হয় যে তোমার সত্য তাদের সত্যের চেয়ে বড়ো (যদিচ সে কথার কোনো মানে হয় না, কারণ একটিক থেকে সেখানে সকল সত্যই সত্য—সবই আংশিক তবু সত্যের অর্থে তা সত্যই)। কিন্তু যেনি তুমি নিজের সত্যকে অন্যের সত্যের চেয়ে বড়ো করতে চাইবে অমনি আসল সত্য থেকে তুমি ভই হবে।

অপরের চিন্তাকে নিজের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত করার যে যত্নাঙ্গী তাকে আমি বলি "প্রচারকের" স্ববর্ণস্ব, তাতে তোমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যায় ? তুমি এক পা এগিয়ে গিয়েই জানো যে সকলেই সেখানে এগিয়ে যাক, যখন তুমি বোধ করছ তেমন সকলেই বোধ করতে থাকুক কিন্তু তাতে একটা নারাত্বিক ব্রহ্মের একঘেরেমি এসে পড়ে।

বোটের উপর এই কথা তোমাদের বলতে পারি যে একটা সময় আসবে যখন তুমি যে সত্যের কথা চিন্তা করছ তা অপর কাউকে জানাবার জন্য তোমার আশে কোনো ইচ্ছাই হবে না।

★

প্রশ্ন : গুরু বা নিভৃত সাজ্জার মধ্যে কেনন ক'রে প্রবেশ করা যায় ?

উত্তর : নিজেকে কেনন করে নিজের ভিতর থেকে বাহির করে নিতে হয় তা জানো কি ? বাইরে বেরিয়ে আসা কাকে বলে তা কি জানো ? দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিকভাবে নয়, আমি বলছি এই গুরু উপায়ে। আপন ইচ্ছানত আর সজ্ঞানে তা কি করতে পারো ? সেখ থেকে বেরিয়ে সূক্ষ্মসেহে অবস্থান করা, পরে আত্মা সূক্ষ্মতর অবস্থার চলে বাড়া, কেনন করে সম্ভব তা কি জানো ? ক'রে সেবেছ ? না—জড়নে এ কথা অন্যদিন হবে।

★

প্রশ্ন : কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে তা হয়েছে।

উত্তর : ও, অপেক্ষ নধো ? তখন কি কেনেছ যে কোথায় তুমি রয়েছ ?

★

প্রশ্ন : কিছু কিছু কেনেছি।

উত্তর : কেনেছ কিছু কিছু ? বেশ মজার তো ! কোথায় চলে যাও অপেক্ষ নধো ?

★

প্রশ্ন : প্রায়ই গিয়ে পড়ি প্রাণবর অগতে।

উত্তর : ও, প্রাণবর অগতে যাও—সেখানে অপ্রীতিকর কিছু ঘটে না ?

★

প্রশ্ন : হ্যাঁ, প্রায়ই তাই ঘটে।

উত্তর : যা ! কেননা ক'রে সেখান থেকে বেরিয়ে আসো ?

★

প্রশ্ন : ভুটে পানিয়ে আমি স্থলশেহের নধো।

উত্তর : ঐ পর্বতটো তোমার জানার মৌড় ?

★

প্রশ্ন : তা নয়, কখনো কখনো আমি আলোকেও আহ্বান করি, তাতে আর ভুটে পানিয়ে আসার দরকার হয় না। কিন্তু সে ভাষাটা বেশিক্ষণ থাকে না।

উত্তর : ইচ্ছানতো কি সেখানে যেতে আর সেখানে থেকে বেরিয়ে আসতে পারো ?

★

প্রশ্ন : ইচ্ছানতো পারি না।

উত্তর : পূর্বে যেখানে গিয়েছিলে সেখানে কি আবার যেতে পারো ?

★

প্রশ্ন : না না।

উত্তর : একই স্থানে অনেকবার গেলে, তা কি হয়েছে ?

★

প্রশ্ন : নিজের ইচ্ছায় তা হবনি।

উত্তর : কিন্তু অনেক শিঙাই তা পারে, তারা তাদের এক স্বপ্নকে অব্যাহত অনুসরণ করে । প্রত্যহ রাতে শোবার পরে তারা একই স্থানে কিংবা গিরে তাদের পূর্বস্বপ্নকে অনুসরণ করে ।

*

প্রশ্ন : শিঙাকালে মাঝিও তা পারতাম ।

উত্তর : এখন আর তেমন শিঙা নও এটাই দুঃখের কথা ।

*

প্রশ্ন : এধনকার নতো তখন জে আর মাথার মধ্যে এত চিন্তা চোকেদি ।

উত্তর : বেশ, তবে আমার তেমন শিঙার নতো হও, তাহলেই এটা হতে পারবে । এমন নতোরন তিনিস আর কিছু নেই । এই নিয়ে মূলতভাবে বাস্তব কালোয় যায় : গল্পপট্ট বেশ চলেতে থাকে, তারপর তেগে ওঠার সময় সেখানেই শিঙা টেনে তুমি মূলতঃ কিংবা এসো । আমার পরের রাত্রে গল্পের পাঠা মূলে সেই শিঙার পদ থেকে ওক করে, মূল-সেইর বাইরে তা ওক পরে সমস্তটিকে একসাথে এড়িয়ে নিতে পারবেই তা চমৎকার কিছু হয়ে পড়বে । বেশ যখন সেহে ফেরার সময় হয়ে তখন শিঙা টেনে বলবে, “জাও এট পর্যন্ত পড়ো ।” প্রতি রাত্রেই সেই তিনিসগুলি নিয়ে আশ্চর্য এক রূপকথা বানাতে পারো, যদি মনোবাহার পলেও তা মনে থাকে ।

*

প্রশ্ন : কিন্তু তার জন্য দিনের বেলাতেও কি মনে একটা শান্তির ব্যবহার থাকা চাই না ?

উত্তর : না । বরং এটা নির্ভর করে শিঙামনের নতো অকপটতা থাকার উপর, যা সেখানে তা সপনভাবে বিশ্বাস করার উপর, মনের মধ্যে তাই নিয়ে কোনো বিতর্ক না করার উপর, আপন মনের সারল্যের উপর, প্রাণবন্ত আকর্ষণের উপর—আমলে এইগুলিই চাই, অর্থাৎ প্রাণের উপরতা । আর অতিরিক্ত রকমের অহংভাব কিংবা কোনো মোড় থাকলে চলবে না, বাস্তবে তা কোনো লাভমূলক কাজে লাগক এমন মনোভাব থাকলে চলবে না—যা শিঙামনের মধ্যে একেবারেই নেই । তা ছাড়া আরো থাকা চাই একটা প্রাণবন্ত কল্পনাশক্তি (হয়তো ভাবছ আমি যা মূশি বলে বাড়ি, কিন্তু এ মূশি সত্য কথা) । এমন জগৎ আছে যাকে তুমি নিজে গড়ে তুলতে পারো, সে তোমার নিজের প্রাণজগৎ । সেখানে আপন মূশিমতো প্রতিমূর্তি রচনা করে তোমার সেই জগৎকে অপরূপ করে তুলতে পারো । তুমি যদি এ শক্তির সর্বব্যবহার জানো, যদি শিল্পী ও কবির নতো সঙ্গতি ও সৌন্দর্য

বোধ হোবার পক্ষে, তাহলে এমন আশ্চর্য জিনিসের রচনা হবে যা বাস্তবেও সম্ভব হতে পারবে।

শিশুকালে আমি এইরকম নিজেকেই নিয়ে গল্প বলে পোনাভান। কোনো বাক্য উচ্চারণ ক'রে নয়, কেবল বাখার মধ্যে তৈরি করা ; তার মানে গল্প বানাতে এমন স্বাধীন গিয়ে পড়া যেখানে কেউ যায় না। তা যদি করতে পারো আর সে গল্প যদি হয় সমস্ত ও সুন্দর, তাহলে তা জীবনেও সম্ভব হয়ে যেতে পারবে—হয়তো ঠিক যেমনটি বেঁচেছিলেন তেননভাবে নয়, তথাপি তার একটা বাস্তব অভিব্যক্তি হবে, হোবার রচনা থেকে স্বতন্ত্র রকম হলেও। হয়তো সে মাফিয়া আসতে অনেক বছর লেগে বাবে, কিন্তু হোবার গল্পই হোবার জীবনকে গড়ে তুলবে। তবে খুব কম লোকেই সেটা করতে পারে, প্রায়ই অনেকে তার সঙ্গে নানারকম বিভীষিকা ছড়ায়, তাতেই তাদের পছন্দের হয়। এমন গল্প যদি বানাতে পারো যার মধ্যে বিভীষিকা নেই, সবই সুন্দর, তাহলে জীবনে তা অনেক কাজ করে, কিন্তু কেউই তা করতে সক্ষম না।

প্রাণরাজের এই স্ট্রীশক্তিকে কেউ যদি কামে লাগাতে চানতো, মাস পৈশব থেকেই যদি তা নিখরতে পারতো! কারণ ওর হারাই সকলের বাস্তব স্মৃতি গড়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সাধারণত যা হয়ে থাকে তা এই যে হোবার আশপাশে গারো রয়েছে, এমন কি হোবার সঙ্গী মাথী শিশুরা পর্যন্ত, আর বিশেষ করে বাপনারেরা ও শিকাগো তারা মিঃহেদের দাতা রাখিয়ে সবসময় নষ্ট ক'রে দেয়, তখন তার ভিতর থেকে ঐক্লপ কাজে দেবান কেউ তেনন সম্ভব হতে পারে।

যদি শিশুকালের সমস্ত উৎসাহের মধ্যে তুমি নিজের গল্প তৈরি করতে পারতে তাহলে জীবনও হোবার অপূর্ণতাকে গড়ে উঠতে পারতো। আমি এখানে বাস্তব জীবনের কথাই বলছি।

শিশু বয়সের খুঁটি পরিণত বয়সের বাস্তব।

(৫)

প্রশ্ন : ভগবানকে কেননা ক'রে চিনবো এবং বুঝবো ?

উত্তর : নিজেকে তাই হয়ে গো ছেলে। তাই হলো একমাত্র উপায়, ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, “তীকে সর্বদাই আপন অন্তরের মধ্যে বহন করতে হবে, নতুবা তীকে দেখা বাবে না।” আমাদের সমস্ত সারবস্তু হলেন তিনি, হুড্ডার; তীতেই পরিণত হলে তবে আমরা তীকে বুঝতে পারি, নতুবা বোঝা অসম্ভব।

*

প্রশ্ন : আপন সত্তার মধ্যে কেবল কার তাকে বুঝে পাওয়া ?

উত্তর : সেই কথাটী ভো বলান। প্রথমে তাঁর সন্ধান করতে শুরু করো, সেটাই তোমার জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য কাজ হয়ে উঠুক, সেই ইচ্ছাই যেখানে থাকুক নিরন্তরের জন্য, মনে মনে অষ্টপুত্রর ঐ নিরন্তর লেগে থাকো, ঐ লোক তোমার একমাত্র জানা, তবে সন্ধান নিলবে। নইলে জীবনে কেবল পাঁচ মিনিটের জন্যে ভগবানকে স্মরণ ক'রে ঘন্টার মধ্যে পরিত্যক্ত মিনিট যদি অন্য চিন্তার বাস্তব থাকে। তাহলে সাক্ষ্যের আশা খুবই কম। অতঃপরকে তাতে অনেক ক্ষমাই লেগে যাবে। কেবল অবসর কালের জন্য নয়, কিন্তু সর্বকালের জন্যই এটি তোমার সত্তার একমাত্র কাজ বলে জানতে হবে, তোমার এই অস্তিত্বের তাই একমাত্র কারণ বলে জানতে হবে।

(৬)

প্রশ্ন : “যোগ সন্যাসের” (The Synthesis of Yoga. Page 137) লেখা আছে, “যা কালগত তা যেনে আগতে চার কালগত নানার মধ্যে, আর যা কালগত তা কিংবে বেতে চার কালগতের দিকে।” এমন হবার কারণ কি ?

উত্তর : এটিই যে হবার কথা গোল গুলে। যা অনভিব্যক্ত তা চাইবে অভিব্যক্ত হতে, আর যা অভিব্যক্ত তা চাইবে তার মূল অবস্থায় কিংবে যেতে।

“পৃথিবী কেন গোল হলে, সূর্য চন্দ্র গ্রহগুলি কেন গড়েছে ?”—তোমার প্রশ্নটি হলো এই ধরনের। এমন আছে বলেই আছে, বিশেষতঃ এটি নিয়ম। এটি সব বাস্তব জিনিসের কোনো কৈফিয়ৎ নেই, মনের তরফ থেকে এর কোনো ব্যাখ্যা নিলবে না। একটা কিছু ব্যাখ্যা তুমি বাতলাতে পারো, কিন্তু তখন সেই ব্যাখ্যাকে আবার অন্য ব্যাখ্যা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে, তারও আবার অন্য ব্যাখ্যা তৈরি আনতে হবে—আর এই কেবল চলতে থাকবে। সারা বিশ্ব চুঁতে তুমি কোনো-কিছুর ব্যাখ্যা অন্য কিছু দিয়ে করতে পারো, কিন্তু তাতেও কোনো সমাধান হবে না। এইটুকুই শুধু বলতে পারো, হয়েছে বলেই হয়েছে।

তাই বলা চর যে মনের বাস্য কিছু জানা যায় না। মন চায় অর্থতা বুঝতে, তাই কোনো কিছুই সে বুঝতে পারে না। বাক্য হলো অর্থ তার মূল কেবল এইটুকু যে তার উপরে ভর ক'রে তুমি কিছু কাজ করতে পারো। এ চাড়া ভর কি সার্থকতা ? কোনো-কিছুর অর্থ জেনেও যদি তুমি তাকে কিছুনাড় বদলাতে না পারো তাহলে সে অর্থের কোনোই দান নেই। কারণ এইমাত্র তোমাদের বলেছি, একটা অর্থের আবার অন্য অর্থ দরকার হবে। অর্থ জানার সঙ্গে সঙ্গে যদি তুমি তাকে বন্ধে দিতে পারার ক্ষমতাও পেতে, তাহলে তার কিছু দান থাকতো,

কিন্তু ত্রা ত্রো হয় না । এখানে পাড়িয়ে আনরা কেবল এই সবতল নাচির উপরেই ঘুরপাক খেতে থাকি, এর থেকে নৃত্যনতর উচ্চতার লানিয়ে উঠতে পারি না ।

*

প্রশ্ন আনালের বোধশক্তি কেমন ক'রে বাড়বে ?

উত্তর বোধশক্তি ? তার মনো আপন চেতনাকে আগে বাড়াতে হলে, মনকে ছাড়িয়ে আরো উপরে উঠতে হবে, চেতনাকে এর চেয়ে ব্যাপক ও গভীর ক'রে তুলতে হবে, ননেরও উপরে যে রাজ্য আছে তার সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটাতে হবে ।

(অতঃপর এই প্রবন্ধটির মূত্রপকালে

বা এর সঙ্গে নীচের মতবা বোগ করেন)

আমি আরো একটা কথা এখন এর সঙ্গে জুড়ে দিতে চাই—উপলব্ধির কথা । হোনার এই জ্ঞানকে অনভূতিতে রূপান্তরিত করা । তখন আসবে এক উপলব্ধি থেকে অন্য উপলব্ধি ।

এই “উপলব্ধি” কথাটি বনছি সাধারণ অর্থে নয় । যা জানি তাই উপলব্ধি করলান, এটা আলাদা কথা, আর সে ত্রো বোঝাই যাক—কিন্তু যা জানি না এবং বুঝি না (এমন কি উচ্চতর ননের পূর্ণ জ্ঞানের কথাও ছেড়ে দিয়ে) সেই জিনিস “হয়ে যেতে পারা” । অর্থাৎ তার তপসের অবস্থাতে উপনীত হওয়া—বিশুদ্ধত তপস্ নাতি করা ।

কথায় বলে বিশ্ব অতিব্যক্তির গোড়াতে ছিল সচ্চিদানন্দ । প্রথমে সং, অর্থাৎ শুদ্ধ অস্তিত্ব ; তারপরে চিং, অর্থাৎ সেই অস্তিত্বের চেতনা ; তার পরে আগল, সেই অস্তিত্বেরই আনন্দ, তাতেই জিনিসটা নিভা চালু থাকে । কিন্তু সেই চিং ও আগলের মাঝখানে রয়েছে তপস্, অর্থাৎ চিং-এরই নিচ্ছিন্ন উপলব্ধি । যখন সেই তপস্-এর অবস্থাতে গিয়ে পৌঁছতে পারো তখন যে জ্ঞানের উদয় হয় তার দ্বারা সব-কিছুকে বহুলাতে পারার মতো শক্তি বনে । সেই তপস্ই সকল অতিব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করছে ।

তারই অবস্থাতে পৌঁছতে পারলে তখন যে শক্তি বনে ত্রা অতি প্রবল এবং অনোয় —সেই হলো বিশ্বশক্তি : ত্রাতে বিশ্বের উপর একটা দখল অনোয় ।*

* Bulletin of S. A. I. C. F. থেকে । অনুবাদক—পদ্মশক্তি ঙ্গার্য্য

প্রশ্নোত্তর

("চিন্তাকলী & মৃত্যাবলী" Thoughts & Aphorisms সম্পর্কে)

(৭০)

প্রশ্ন "নিজেকে বিচার করবে নির্বনভাবে, তবে তুমি অন্যের প্রতি আরো সদয় এবং কল্যাণী হতে পারবে"।

উত্তর খুবই দিক কথা। এ কথা সকলের পক্ষেই খাটে, বিশেষত যারা নিজেকে বড়ো বনে ভাবে। কিন্তু তা ছাড়াও এটি হলো খুব খড়ীরের কথা। ঠিক এইরূপ অভিজ্ঞতাই আমার কিছুদিন থেকে ঘনিষ্ঠ, এ যেন মনোভাবনাকেই উল্টে বসে।

লোকের পানিট মনে মনে ধারণা করে যে তারা কেবল বিরোধী শক্তিসমূহ দ্বারা আক্রান্ত ও উৎপীড়িত। এর মধ্যে যাদের বাঁধা থাকে তারা লড়াই করে, অন্যেরা শুধু বিলাপ করে। কিন্তু অপবপক্ষে বিরোধী শক্তিরা যে এই স্বপ্নের মধ্যে বাস্তবিক কোন অংশ গ্রহণ করে তা আমি উদ্ভোগের স্পষ্টই স্বেচ্ছাতে পারছি। আমি দেখছি যে তাদের ভরফের ক্রিয়া হওয়া খুবই প্রয়োজন, যাতে তাড়াহাড়ি উন্মত্তি ঘটে আর স্বপ্ন যাতে পুনরায় তার উৎসে ফিরে যেতে পারে। তাই আমি চাই যে এই সকল শক্তির বিলোপ কিংবা পরিবর্তন কানন। করার বদলে হোমনা যেন আপন আপন রূপান্তর আনার দিকেই বেশী ঝোঁক দাও এবং তারই জন্য নিত্যা আকৃতি রাখো। এ কথা আমি বলছি কোনো ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নয় কিন্তু পৃথিবী-ভোড়া দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। ব্যক্তির দিকের কথা সকলেই জানে আমি বলছি চপড়ের দিকের কথা। এর মধ্যে রয়েছে বড় কিছু ভুলবাস্তি ও অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতা, পাখি চেনার মধ্যে বড় কিছু অজ্ঞত কাননা ও টচ্চা, তাতেই এই সব বিরোধী শক্তি ও সমস্যার স্থায়ী বজায় রেখেছে, তাই ঐ ধরনকেই সমগ্রভাবে আচ্ছাদিত সে ওয়া বধকার—এ হলো আত্মহার ছেয়েও বড়ো কথা—যাতে বিরোধী কোনো-কিছুর অস্তিত্বের প্রয়োজনই আর না থাকে, হুতরাং তা একসময়েই দিল্প হতে যায়। এই দৃষ্টিতেই আমি স্বেচ্ছাতে পেলান।

বিরোধী শক্তিসমূহ অস্তিত্ব ঘটেছিল দিব্য জীবনের অলমাপকরণে। তারই প্রায়শ্চিত্ত-যন্ত্রণ দরকার পাখি চেনার এই নিবিশেষ আগ্রহটি।

এ অনুভূতি এনেছিল অতি দুশ্চেষ্টারূপে। সেই ভাবটির ভাবান্তর করলে এই দাঁড়ায় : "আনার মধ্যে যা-কিছু শেষজ্ঞান সমগ্রই তোমাকে দিলাম, সবই তুমি গ্রহণ করো, নিজের হাতে নিয়ে সব-কিছুকে মুছে কেন, নিশ্চিহ্ন হয়ে থাক সব কিছু।"

মৃত্যুকাল ধরতে হবে এই ভাব নিয়ে, এই হলো এর ভিতরের কথা। যতকাল পর্বত

মানব-চেতনাকে উপস্থাপনের সৃষ্টিক্রিয়ার বিরুদ্ধে চিন্তা করবার বা বিরুদ্ধতা করবার সম্ভাবনা-
নাকি থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যখন কোনো শক্তিকে দেখে দিয়ে কিছু নাকি নেই : বিরোধী
পক্ষের সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে ত্রোনাঙ্গের চকু উল্লীলন করে দেখিয়ে দেবার জন্য যে—কোন
রাস্তা বলে কতদূর পর্যন্ত ত্রোনাঙ্গের যেতে হবে, সেখানে তাদের উপর দেখা চাপানো যাবে।

(নীরব থেকে)

এরকম অবস্থার মধ্যে মানব যেন একটা সহকালের পূর্বসূরী ভেগে উঠল—সে এক
চিরস্থানের স্মৃতি—উপস্থানের দিব্যপ্রেমের চেতনা, তাঁর বিভূতিরূপে যে প্রেম তিনি এই
ধরতে বর্ণন করছেন, যার ফলে অগৎ তাঁর দিকে আবার ফিরে যেতে পারবে। সেখানে
দিব্যভাবের কোনো চিন্তানাকি নেই, দিবা প্রকৃতির অস্তিত্বনাকি নেই, সেখানেও তিনি
অবতরণ কনোচন দিব্যভাব চেড়ে, যাতে এই পাখির তনকেও যেনে নিয়ে আবার তাকে
দিবা-অবস্থার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। তবে সেই দিব্যপ্রেম যতকণ পর্যন্ত এখানে
তাঁর সর্বশক্তিতে প্রকটি না হচ্ছে ততকণ পর্যন্ত সে প্রত্যাবর্তন ক্রিয়া সম্ভব হবে না।

সেই তাঁর দিবা সৃষ্টির অনুভূতি যখন এলো (পূর্বসংখ্যা "বহিষ্কৃত" হইয়া) তখন
আনি প্রশ্ন করেছিলেন—“তখন যখন উদ্ভূতির পথে এগিয়ে চলতে, উদ্ভবের সে দিবা
হয়ে উঠেছে, তার পরেও কি অগ্নির কষ্টমারক অনুভূতি বহুত থাকবে, আর দিব্যের সঙ্গে
সত্যবিরোধী উপাধিপিত্ত বিরোধী পক্ষের তখনও কি এমনি টিকে থাকবে? ” তার চাবানে
আবার অস্থিরের মধ্যে হুসান—“না, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সেই আনন্দ বৃহৎ এখন যখন দিবা-
প্রেম তার পূর্ণতায় প্রকটি হয়ে এগানকার যতেনা ও অস্তানতা ও তার পরিপানে এই
অগত চকচকে রূপান্তরিত করবে পূর্ণতা-দিব্যানী এক জ্যোতির আনন্দময় প্রকাশিত। ”

যে অনুভূতি পেলান তা পুষ্টি স্পষ্ট। এমন অবস্থাতে বর্তমানের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপেই
একর হওয়া যায়, সকল অগ্নির সঙ্গে গিয়ে নিজে নিজে সান্দ্রিক আচরিতরূপে নিবেদন
করে সেও যায়, যাতে দিবা রূপান্তরের কাজ সম্ভব হতে পারে।

বসন্ত নাগুয়ের মধ্যে যে নির্বন ও সং হবার ইচ্ছা রয়েছে (যার ফলে সাধারণ মানুষের
মনও পুষ্যের দিকে ঝোঁকে), তাই হয়ে ওঠে তার আনন্দবোধের প্রতিবন্ধক। এই জিনিসই
রয়েছে দিবা ও তদানির মূল—যার ফলে নিজের যাড়ে অনুবিধার গোথা নিতে ভুনি
অসম্ভব হও। সেই কথাই শ্রীঅরবিন্দ এখানে সোজাশক্তি খুল সরল ভাষাতে বলেছেন।

পূর্ণাঙ্গান দেখাবার চেষ্টা করতে যেওনা। চেয়ে দেখে যে সমস্ত অগ্নির সঙ্গে ভুনি
কোনভাবে কতখানি নিজে নিজে ঝড়িয়ে রেখেছ। সেই অগ্নির মধ্যে ত্রোনার যে অংশ
রয়েছে সে কথা স্বীকার করে নিজেও সেই অগত ও দিবার অস্তিত্ব বলে যেন নাও ;
তবেই অস্বাকারের চায়া জানে নত চরে উপস্থানের কাছে নিজে নিবেদন করে দিতে
পারবে। আর বসন্ত উৎসাহিত হতে পারবে ততই আনন্দে পরিবর্তন।

পূণ্যাবলম্বন দলে ভিড়তে যেওনা। যারা তবলাচল্লু ও কোনো পূণ্য বাদেন
নেই তাদেরই দলে বিশেষ পূর্ণ প্রবেশ নিষেধক নিবেদিত করে।

জানুয়ারি ২১, ১৯৬২

(৭১)

প্রশ্ন “একটি চিত্র করা মানে সত্যের দিকে নিশানা ক’রে একটি তীর নিক্ষেপ
করা তীর ধিরে তার একটিমাত্র বিন্দুকেই বিদ্ধ করে, নিশানার সম্পূর্ণ চাকারটিকে তা আবৃত
করে না। তীরশাখ কিন্তু ঐটুকু সাক্ষ্যেই বৃশি হয়, ওর চেয়ে বেশী কিছু সে চায় না।”

উত্তর : এ তো জানা কথা, সকলেই জানি।

*

প্রশ্ন ঠা, কিন্তু সম্পূর্ণ চাকারটিকে আরন্তে আনতে চাইলে কি করতে হবে ?

উত্তর চিত্রার তীর ছোঁড়া পরিত্যাগ করতে হবে ! এ রূপকটি খুবই কালের, যারা
মনে করে যে চিত্রার দ্বারা তারা সত্যকে আবিষ্কার করেছে, একটি বিন্দুতে পৌঁছেই সত্যের
নাগাল পেয়েছে, তাদের সম্বন্ধে এটি বেশ খাটে। তাই আনন্দের বনি অন্যরকম কথা।

*

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এই যে ওর বদলে যদি আমরা সবথেকে সত্যকে আদৃত ক’রে তার
সকল দিকের কথাই চানতে পারি, আর স্বপ্ন এও জানি যে তার প্রত্যেক অংশেরই নিজস্ব
স্থান ও গুরুত্ব সার্থকতা আছে, তখন থেকে আমরা কেননা ভাবে কাজ করবো ? কোনো
এক দিক বেছে নিয়ে অন্য দিকগুলোকে বাঁচিয়ে তো আমাদের চানতে হবে ?

উত্তর : তোমরা সেই দার্শনিকের গল্প শোনোনি, বিনি থাকতেন পবিত্র ক্রান্তে ?
নামটা এখন মনে নেই, মনেপিয়ে ইউনিভার্সিটির নামজাদা প্রফেসর ছিলেন তিনি, শরৎ-
ভলীতে থাকতেন। তাঁর বাড়ির দিকে বাবার স্ত্রী ছিল অনেক গরিব। কলেজ থেকে
বাড়ি খিরবার সময় প্রত্যেক তিনি মোড়ের মাঝার এসে গাঁড়াতেন, যেখান থেকে বিভিন্ন পথ
বিভিন্ন রকমে ঘুরে তাঁর বাড়ির দিকেই গেছে। ঐ মোড়ে গাঁড়িয়ে তিনি ভাবতেন,
“কোন স্ত্রীর ঘাই ?” প্রত্যেক স্ত্রীতেই কিছু সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে। সেই
গুলি সবসময় তাঁর মাঝার মধ্যে উত্তর হতো, সব দিক ভেবেচিন্তে স্ত্রী বেছে নিতে তাঁর আশ
ঘট্টা কেটে যেতো। নিজেই তিনি এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে বলতেন যে চিত্রার দ্বারা
কোনো কাজ হয় না, একবার যদি চিত্রা শুরু করে তাহলে কিছুই ভুলি করতে পারবে না।

নীচের দ্বারে থেকে তাঁর ঘুঁড়ে একটি বিশৃঙ্খলিত পৌঁছে তোনার কান চলেতে পারে। কিন্তু উপরের দ্বারে গেলে আর তা চলেনা—সেখানে ঠিক উলটো ব্যাপার! নীচের দ্বারের বোধশক্তি ঐকমত্য হয়, তাতে কেবল সত্যের বিভিন্ন দিককে ভাণ্ড ক'রে দেখে, আর কোন দিকে যেতে হবে তা ভেবে পায় না। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নসীতাকে অর্থাৎ সমগ্র সত্যকে দেখতে হলে সেই বুদ্ধির ওপারে চলে যেতে হবে। সেখানে উত্তীর্ণ হলে দেখবে যে তা বিভিন্ন সত্যের একটি যোগফল নয়, অসংখ্য সত্যকে একত্রিত করা নয়, এমন নয় যে অসংখ্য হওয়াতে তুমি তাকে আয়ত্ত করতে পারছ না। উপরের দ্বারে গেলে তুমি সমগ্রকেই এক পলকে দেখবে সমগ্রভাবে, দেখবে যে তার মধ্যে কোনো বিভাগ নেই। অতএব তখন বেছে নেবার কিছু থাকবে না, দৃষ্টি বুনে গিয়ে যা দেখবে তাই গ্রহণ করবে। কোনটা সরলে আর কোনটা করবে তা ভাবতেই হবে না। সবই দেখবে অবিস্ত্রিত, অতেন্দ্র, কেবল দৃষ্টি এলেই হলো।

কিন্তু বতকণ রয়েছে তাঁর হোঁড়ার অবস্থার ততকণ সমগ্র দৃষ্টি নিলবে না, আর বও সত্যকে ছুঁতে ও সমগ্রের নাগাল নিলবে না। এটা মনেই অসম্ভব। মনের ত্রেম দৃষ্টি নেই, সে শুধু যোগ্য ক'রে দেখে, ফলে কিছুই বেনে না, মূল সত্যের অনুভবটাই ফাঁক দিয়ে গলে যায়।

সামগ্রিক দৃষ্টি ও বোধশক্তি এলেই তখন সমগ্র সত্যকে এক ভাবে দেখবে। তখন আর স্বাতির কোনো অবকাশ থাকবেনা, বিতর্কের দরকার হবেনা, নির্ভুল ও স্বচ্ছ দৃষ্টিতে জানতে পারবে কোনটা তোনার করণীয়।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২

(৭২)

প্রশ্ন : “জ্ঞানোন্মেষের লক্ষণ এই যে তখন আবার মনে হবে এমন সামান্য জেনেছি কিম্বা কিছুই আবার জানা হয়নি; অথচ সঠিক জ্ঞান এলে দেখতাম যে সবই এসে গেছে আগন্তকের মধ্যে।”

মূর্খের মধ্যে স্বপ্নে কখনো কখনো দেখি যে ভবিষ্যতের কথা স্পষ্টই জানলাম, ওহা-হরের সব কথাই বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ হয়ে গেল। তা কি ঠিকই দেখা হয়? এটি জ্ঞানের কোন স্তর, এ স্তর কি একটাই না অনেক? আগ্রহ ও চেতন অবস্থাতে কেমন ক'লে ওখানে ঝাঙকা যায়? আবার এমনই বা কেন হয় যে ভগবৎ উপলব্ধি যারা পেয়েছে তারাও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কিছু ভুল বলে?

উত্তর : সারা ভগবৎটাই তো বলে কেনলে। প্রশ্ন তো একটি নয়, কুড়িটা হয়ে গেল।

ভবিষ্যৎ জ্ঞাপক স্বপ্ন নানা রকমের আছে। কোনো কোনো স্বপ্ন সঙ্গে সঙ্গে ফলে যায়, রাতে যা আনলে পরের দিনেই তা হতে দেখলে; আবার এমনও আছে যা কলতে বিশ্বাস দেয়ী হয়। সাফল্যের কালানুগাধী স্বপ্নের বিভিন্ন স্তরভেদ রয়েছে।

যশু যতই স্থানিচিত ততই তার সাক্ষ্য হইবে বিনব্রিত, কারণ সে জিনিস আসছে মূলের কাছাকাছি হইতে থাকে, স্বভাবের তা ফলতে অনেক সময় নেবে। কিন্তু ফলবে নিশ্চয়, কারণ তা আসছে গোড়ার দিক থেকে। এমন একটি স্থান আছে যেখানে পরাম্পরের সঙ্গে তুমি একত্র হয়ে যাও, সেখানে পৌঁছলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই তুমি লগ্নাতে পাবে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে যাত্রা কিরে যাসে ভায়া তখন সেখানকার কথা সবইই ভুলে যায়। সেগুলি স্মরণ রাখার জন্য কঠোর আত্মসাধনার প্রয়োজন। সেখানকার কথা নির্ভুলই হয়। তবে তার আত্মসাধনের পৃথকগুলি প্রায়ই-হিঁড়ে যায়, তাই তা স্মরণ রাখা কঠিন হয়।

কিন্তু যা বনহীনান, যেমন শুরু থেকে দেখবে তদনুসারে তার সাক্ষ্য ঘটতে কতটা সময় নেবে তা আশঙ্ক করা যাবে। যেগুলি অজ্ঞাতাঙ্কি ফলে সেগুলি সূক্ষ্মত্বের সাক্ষ্য ইতি-মধ্যে ঘটেই গেছে, তারই প্রতিচ্ছবি তুমি যশু দেখছ, এবং তা পরদিনে না করেই ঘটার মধ্যে ব্যস্তবে ও দেখতে পাবে। সে জিনিস বিস্তারিত ভাবেই নকিত হবে, কারণ তা ঘটেই গেছে; সবই নির্ভর করে হঠাৎ বৃষ্টিপাতের উপর। সে বৃষ্টি যদি নিরপেক্ষ ও ঐকান্তিক হয় তবে স্বাভাবিক ভাবেই তুমি দেখবে; আর যদি তীব্রতার নিষ্কণ্ড স্বাভাবিক ও নবের ভাব তার মধ্যে ঢুকে পড়ে তাহলে তারই রং তার মধ্যে নেমে যাবে। সত্যতঃ সূক্ষ্ম জগতের জিনিস দেখা নির্ভর করে ব্যক্তিগত স্বভাবের উপর, যে দেখতে তার উপর।

কিন্তু আরো সূক্ষ্মত্বের স্তরে, যেমন প্রাণবন্ত কিংবা মনোময় স্তরে গিয়ে পড়লে তখন সম্ভাবনা আসবে মানবিক জিনিসের টুকরো তার মধ্যে ঢুকে যাবার। ভবিষ্যতের ঘটনা নোটাটাইভাবে জানা যাবে, কিন্তু তার বুদ্ধিগতির সম্পর্কে কিছু অল্পবলন হয়ে যেতে পারে, কারণ মানবিক ইচ্ছাগুলি প্রত্যেকের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য এসে দিতে পারে।

মূল থেকে যে ইচ্ছা আসে তার প্রতিফলন নামা স্তরে মানবিক ভাবেই হয়ে থাকে, ঐ প্রতিফলনের সময় তার মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। আরও যে জগতে রয়েছে এখানে সবই আসছে প্রতিফলন রূপে, অর্থাৎ সবই প্রতিরূপ এবং চায়া বাহ্য, আসল জিনিস একটাও নয়। আরও যাকে আমাদের সত্যের অস্তিত্ব বলি তা হলো মূল অস্তিত্বের চায়া বাহ্য। সেই চায়া এখানে খেননভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে সেই অনুযায়ী তার মধ্যে নানা ব্যক্তি ও বিধা এসে পড়ছে; মূল জিনিস হলো শুদ্ধ সত্য ও চিরস্থান, কিন্তু চায়া বাহ্যেই অন্যরকম। এর মধ্যে যতই বেশী বিধার স্পন্দন এসে যোগ দেবে ততই বেশী এর বিকৃতি ও বর্নিত্ব ঘটবে। প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক ঘটনারই একটা বিশুদ্ধ অস্তিত্ব আছে যা তার সত্য অস্তিত্ব, কিন্তু সবুত্রে সাক্ষ্য তারই বহুপ্রকার অণু ও বিকৃতি অস্তিত্বরূপে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, বুদ্ধির সাক্ষ্য এনেই তার মধ্যে বুদ্ধির বিকৃতি শুরু হয়ে যায়; নবের সাক্ষ্য এলে আরো বেশী বিকৃতি, মানবিক ভাব ও অনুভব তাকে আরো বাড়ায়। জড়ের সাক্ষ্য এসে যখন কোকে তখন আর তাকে চেনাই যায় না। তখন সত্যের সম্পূর্ণ বিকৃতি। দুই অস্তিত্বের মধ্যে এতই তফাৎ যে সেই জিনিস এমন হয়েছে তা গোয়াই কঠিন হয়।

এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখ, তাহলে অনেক রহস্যসমূহই উদ্ঘাটন হতে পারবে।
 মূল পরিচয়ে যাকে তুমি ভালোবাসই জানো, তার সূক্ষ্মবেদের পরিচয় পেলে হয়তো দেখবে তার মধ্যে এমন সব পক্ষী জিনিস রয়েছে যা বাইরের থেকে তুমি আসলে জানতে যা, কারণ বাস্তবের মূলের অন্তরগে তা আসে। অনেক কিছুই নড়ে চাকা পড়ে আছে। তার চরিত্রের এমন স্পষ্ট অভিব্যক্তি তখন দেখতে পাবে যা তার বাইরের দিকের চেয়ারতে নেই। বাইরের দৃষ্টিতে যখন কাউকে দেখ তখন দেখ তার গায়ের রং, তার মুখচোখের গঠন ও ভাব; কিন্তু যদি তার সূক্ষ্মবেদের দিকে চাও ত্তো হঠাৎ দেখতে পাবে তার এক অংশের রং একরকম আবার অন্য অংশের রং অন্যরকম, চোখের মধ্যে এমন কিছু আলো ঘনচে যা আগে দেখনি; আর সব কিছু মিলিয়ে এমন এক চেয়ারা দেখেছ যাকে মূল চোখের কাছে অতিরিক্ত মনে হতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টির কাছে তাই তার চরিত্রের প্রকৃত অর্থপূর্ণ পরিচয়, এমন কি সে ব্যক্তি কিসের প্রভাবে এমন হয়েছে তাও জানতে পারা যায় (অল্প কিছুদিন আগে এ অভিজ্ঞতা আমি পেয়েছি, তার পেকেই বলাছি)।

হুতরাং তোমার নিজের চেতনা ও দৃষ্টির নাজা বত্থানি সেই পনিমাণেই তুমি সত্যের প্রতিরূপগুলিকে দেখবে, তা ছাড়া ভবিষ্যতে যা ঘটবে তাও দেখতে পাবে মূল কাজের থেকে এবং অপেকাকৃত স্পষ্টরূপে। সর্বাপেক্ষা সত্য ও সুনিশ্চিত দৃষ্টি হলো জ্বিা চেতনার মিত্যা-দৃষ্টি। অতএব শেষ কথা হলো দিবাচেতনা পাওয়া ও সর্বকণ্ণ তা মজার মাথা।

এখানে থেকে ওখানকার খবর জানার নানারকম উপায় আছে। যারা স্পষ্টরূপে ইঙ্গিত পায় তারা নানা স্থান হতেই তা পেয়ে থাকে। কখনো যা হাব মানে একান্ত হয়ে সেই দৃষ্টিতে ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করা যায়, যদি জোনাি তেমন অভ্যাস থাকে যে তার পক্ষি-স্থিতির মধ্যে নিজের চেতনাকে প্রেরণ করতে পারে। আবার এও হয় যে অদ্ভুত জগতের কোনো ঘটনা প্রকৃতির সত্তা এসে আগের থেকে জোনাকে জানিয়ে দিয়ে গেল যে হতঃপর কি কি ঘটবে—এমন প্রায়ই হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে কিন্তু ঐ “সংবাদসাহস” স্বভাবের উপর সব নির্ভর করে, জোনাকে নিয়ে যদি তার কিছু রহস্য করবার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সে জোনাকে কতরকম বায়ানো গল্প শোনাবে—যারা ওদের কথা ওমতে পোকে তাদের প্রায়ই এ বিড়খ্যা হয়ে থাকে। জোনাকে মুছ করতে তারা প্রায়ই অনেক কিছু বল জানিয়ে দেয়, কারণ তারা ব্যাপক দৃষ্টিতে প্রাণবন্ত ও বনোবন্ত সাজের অনেক কিছুই দেখতে পায়, তার সঙ্গে আরো যেসব ব্যস্ত খবর তারা বলে তাতে শেষ পর্যন্ত তুমি বোকা ও নিথাক বনে যাও। এমনই হয়। সে ক্ষেত্রে জোনার ঐ সব ক্ষেপে দেবতাদের না বেনে তাদের চেয়ে উচ্চ-স্তর চেতনা আরম্ভ করতে হবে, বার ঘরা ওদের খবরের সত্যাসত্য যাচাই করে নিতে পারবে।

জোনার যদি কিশুননের রাজ্য দেখার নত্যা দৃষ্টি থাকে, তাহলে দেখানে যা পড়ে উঠছে তা সবই তুমি দেখতে পাবে। তখন মাষ্টার্স হয়ে দেখবে যে বনোবন্ত জগতের গড়া জিনিস কেনন বিধিবদ্ধ ভাবে বাস্তবের স্বরে এসে স্তপায়িত হচ্ছে। সেগুলি কেননভাবে আসছে

নানা সংস্কারের ভিতর দিয়ে, কেমনভাবে পরস্পরে নিলে গিয়ে একটা রূপ নিচ্ছে, আপন প্রভাবে শেষ পর্যন্ত একটা পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। আর তুমি যদি আরো উচ্চতর দৃষ্টি পেতে চাও, তাহলে ঐ নবোন্মত্ত রাজাকে ছাড়িয়ে যেখানে থেকে মূল সংস্কারের উদয় হচ্ছে সেখানে পর্যন্ত যেতে চেষ্টা করতে হবে। তাতে সবই মূল্যবান। না জানলেও কেন্দ্রীয় সত্যটি ঠিকই জানতে পারবে যা একেবারে খাঁটি এবং নির্ভুল।

অনেক মানুষ আছে যারা মূলদৃষ্টির সীমা ছাড়িয়ে বহুদূরের জিনিসগুলি দেখতে পার— অর্থাৎ তাদের আপন চেতনাকে তত্পর পর্যন্ত প্রসারিত ও প্রসারিত করে দেবার ক্ষমতা থাকে। মূলদৃষ্টিও তাদের আছে, কিন্তু মূলদৃষ্টির বোনা তারা নির্ভর করে মূল চোখ ছাড়া আরো এক মূল্য জিনিসের উপর (যাকে বলা যেতে পারে মূল স্বরের ভিত্তিকার প্রাথমিক); তখন তারা ইচ্ছার ভায়ে আপন চেতনাকে দূরের দিকে বাড়িয়ে দিলেই স্পষ্ট দেখতে পার সেখানে যা বাস্তবিক হচ্ছে, বসিও সাধারণ দৃষ্টির মধ্যে তা নেই। এমন ক্ষমতা যাদের আছে তারা যদি ঠিকভাবে না চায় তাহলে ঠিক ঠিক কথাই বলতে পারে।

ভবিষ্যৎদৃষ্টি যাদের আছে তাদের মধ্যে অসংখ্যটা পাকাট হলেও সব চেয়ে বড়ো কথা। কিন্তু যাদের মধ্যে এট যে জিজ্ঞাসার কৌতূহলের চাপে তারা পুরি নিজেদেরই অজ্ঞানতার অংশের দ্বারা নিজেদের কল্পনা খাটিয়ে যা কিছু ফাঁক থাকে তা পূরণ করে ফেলে। এতেই তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল মধ্যে ভুল কথা এসে পড়ে। সংস্কারের সঙ্গে খুব কন লোকটাই এমন বলতে পারে, “না, এটুকু আমি জানতে পারিনি তাই বলতেও পারব না,” এমন কি নিজের কাছে তা স্বীকার করবারও সংস্কার অনেকের থাকে না। পুরি অবচেতন ভাবেই তারা নিজেদের কল্পনা ভুলে দিয়ে ভবিষ্যতের কথা বলে—তার ফলে অনেক ভুলই হতে পারে। সে লোভটুকু খুব কন লোকটাই এড়াতে পারে। আমি এমন অনেককে দেখেছি যাদের ভবিষ্যৎদৃষ্টি অসাধারণ; কিন্তু তাদের জ্ঞানদৃষ্টির যতখানি সৌভাগ্য সেখানে পর্যন্ত গিয়েই তারা পৌনে বাবে, এমন কমটিং হয়। ওর সঙ্গে আরো ঋণিকতা তারা ভুলে দেবেই। তাতেই তারা যা বলে তা সন্দেহজনক হয়ে পড়ে। অতএব সেখানে প্রকৃত সাধু ও সচ্ছন্দ হয়ে সম্পূর্ণ মুক্ত পাকা দরকার, যাতে কোনো দ্বিধার চাপে তারা না টলে (অবশ্য নার যশ যারা চায় তাদের কথা বলছি না, তারা নিজেদের ক্ষেপে নিজেদেরই পড়ে)। লোককে বুঝি করতে গেলেই বিকৃতি আসবে।

*

প্রশ্ন : যখন সূক্ষ্মের অপেক্ষে একটা কিছু সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে আর মূলদৃষ্টিতে তা জানাও যাচ্ছে, তখন আর কি তা বদলাবে বাবে না? সে সম্বন্ধে কিছুই কি করা যায় না?

উত্তর : এ প্রশ্নে চমৎকার একটা দৃষ্টান্তের কথা আমি জানি। এককালে Le Matin নামে এক দৈনিক কাগজ ছিল (তখন জোহা নিতাইর শিখ), তাতে রোজই

একটি ছবি ছাপা হতো। চাকরের কিংবা হোটেল-বরের পোষাক পরা একটি ছেলে তার আঙুল বাড়িয়ে সেদিনের তাসিগটর দিকে বা অন্য কিছু দিকে। এমন একজন বাবানান ভদ্রলোক কোনো হোটলে গিয়ে উঠেছিলেন, শহরটার নান এমন মনে নেই ; সেখানে গুরে তিনি রাতে কিংবা ভোরের দিকে এক রঙ্গু সেপলেন, ঐ ছবির মতো একজন হোটেল-বর তার আঙুল বাড়িয়ে একটা কবিন সেপিরে তীব্র বলচে ওর মধ্যে ঢুকে যেতে (ইউরোপে কেউ নানা খেলে তার শব্দেই যেমন কবিনের মধ্যে ভরে নিয়ে যাওয়া হয় গোর দেবার জন্য)। সকালে দুই থেকে উঠে যখন তিনি অনেক উপরতনার ঘর থেকে লেরোদেন, তখন সাবনেই সেপেন ঐ বকন একজন হোটেল-বর, সে আঙুল বাড়িয়ে লিফ্ট দেখিয়ে বলছে—চলুন, নীচে যাবেন। তিনি বললেন—“না, আমি লিফ্টে যাব না।” অন্য অনেক জাভে গিয়ে উঠল, সেই লিফ্ট নীচে নামতে নামতে হঠাৎ ভেঙে পড়ল, যারা তার মধ্যে ছিল তারা সকলেই নারা পড়ল, কিন্তু তিনি বেঁচে গেলেন। এট গরপ তাঁর নিজের মুখে গোনা, তিনি বললেন যে তাঁরন থেকে তিনি স্বপ্নে বিশ্বাস করেন।

এটাও ভবিষ্যৎ স্পর্শ : স্বপ্নে সেপলেন সেই ছেলেরিক, কিন্তু লিফ্টের পরিবর্তে সেপলেন কবিন। অচাড়া, সেই জেনেটি এবং তার আঙুল বাড়িয়ে সেপালোর ভটীও একই বকন, ডাতেই তিনি বললেন, “না আমি ওতে যাব না, টেঁটে যাব।” সোটি ছিল চাইড্রনিক লিফ্ট, উপরতনা থেকে নামতে গিয়ে ভেঙে চুরবার হয়ে গেল।

অর্থাৎ কোনো এক বিশেষ চেতনা-মস্তা তাঁকে স্বপ্নে সাবধান করে দিলে। এটি অবচেতনের স্ক্রিয়া নয়। যদি তাঁর নিজের অবচেতন সূক্ষ্মাঙ্গীতে এটি স্পেশো, তাহলে ঐ জেনেটির চেচারা কেননা করে দেখাতে পারবে ? বলতে পারি না। হয়তো অবচেতনে এটি কোনো প্রকারে পৌঁছে গিয়েছিল, কারণ সূক্ষ্মাঙ্গের সাতো ত্রা মাথেন থেকেই ঠিক করা ছিল। আসল দুর্বলতাগুলি তার মাথেরে ঠিক করা থাকে—এট হলো দুর্বলতার নিগন।

ওবে প্রত্যেক খপেই সবরের একটা তফাৎ থাকে, হয়তো কয়েক ঘন্টা (যেড়া ঘোরা) কিংবা কয়েক মূহূর্ত। আর প্রায়ই তার সংকেত পাওয়া যায় চেতনার মধ্যে তার কয়েক মিনিট বা কয়েক মূহূর্ত আগে। আমি প্রায়ই জানতে পারি কিছুক্ষণ পরে যা ঘটবে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আমার কোনো কৌতুহল নেই, কারণ তখন আর কিছু বদলাবে যাবে না। কিন্তু সেটুকুও জানা যায় যদি জ্ঞানার চেতনা থাকে প্রসারিত ; যেমন, কেউ হয়তো জ্ঞানার কাছে আসছে, কিংবা হয়তো কেউ একটা প্যাকেট নিয়ে আসছে। চেতনা প্রসারিত থাকলে আগের থেকে তার স্পর্শ যাবে।

এ জিনিস কোনো প্রত্যাপেশের মতো নয়, কারণ সূক্ষ্মাঙ্গী বা হয়ে রয়েছে তাই আমি এখানে দেখছি। কেবল তা ইন্সিগ্রায়া হতে কিছু বিলম্ব আছে, যেহেতু একটা সেপালের বা বরটার আড়াল পাঠার আমার দুঃখপটীতে তা দেখা যাচ্ছে না।

এ জিনিসের অভিজ্ঞতা আমার বছরারই হয়েছে। একবার এক সংকীর্ণ পথে পাহাড়ে

উঠছিলেন, তার একদিকে উকুর পর্বত অন্যদিকে গভীর খাল, নান্ন একটি মানুষ সে পথে চলতে পারে। মানুষ পিছনে সারি দিয়ে আসছিল তিনটি ছেলেমেয়ে, আমি তাদের আগে। পথটি এমন এঁকেবেঁকে ঘুরে যেতে যে একটু আগে কি রয়েছে তা দেখা যায় না (আর সে পথ তেননি বিপুলজনক, একবার পা ফুসকালেই একেবারে খালের মধ্যে)। সেখানে বেতে বেতে চঠাৎ দেখি বাকের মাড়ানে এক সাপ রয়েছে (চর্যচর্যে তখনও সেমিনি, যদিও খুবই নম্বর রেখে চলছিলেন)। খুব সতর্কপণে তখন বাকের মোড় নিতেই দেখলাম প্রকৃতই তাই। আমি আগেই তা ভেবেছি, কাকেরই কিছুনাশ বিচলতি না হয়ে সেখানেই খেনে গিয়ে ছেকে-নেয়েদের বনান, “আর এগিও না, বাঁড়িয়ে থাকো”। আমি যদি তখন চেষ্টা করে উঠি তাহলে বিপদগ্রস্ত হই। সাপটি আনাদের শব্দ পেয়ে ইতিনবো তার গর্তের কাছে গাটরে গিয়ে ফনা জুলে বইল—খুবই বিখ্যাত সাপ। ক্রান্তি এটি ঘটছিল। আগের থেকে সংকেত পেয়েছিলেন বলে দেখানো কোনো দৃষ্টটনা ঘটল না, নইলে হঠাৎ হৈ চৈ করে উঠলে অনেক কিছুই হতে পারতো।

এমন অভিজ্ঞতা আমার কতবারই হয়েছে (সাপট সেবেছি চার বার)। এখানেই একবার দেখেছি সেলেসের গ্রাম অস্তিত্বরূপে। সেখানে অনেক নদী আর সমুদ্রের বোণা। আমার একটি রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন, তাড়াহাড়ি রাস্তা নেমে গেল। চলতে চলতে যেমনি এক পা সাড়াতে বাধা অমনি কানে এলো কে যেন আমাকে বলছে “ভঁশিরার”! অথচ সান্ত্বিক কেউই তা বলেনি। তখন নীচের দিকে চেয়ে দেখি দিক পারের তলার পুকুর এক কালো গোবরো, এক পা এগোলেই তার বাড়ির উপর আমার পা পড়তো—সে নিচ্ছয়ই তা সত্য করতো না! আমি খেনে সাড়াতে তখনই সে সরে গিয়ে নদী পাল হলো—কী চমৎকার তার রূপ! মাথা বাড়ি ক’রে ফণা বিস্তার ক’রে সে চলে গেল রাস্তার নতো। তার কাছে দেখ করলেই আমাকে শান্তি পেতে হতো।

এমন আরো কতবার হয়েছে। বিভিন্ন বকস ক্ষেত্রে আমি জানতে পেরেছি দিক এক মূর্ত্ত আগে। পারিসে থাকতে একবার আমি বুনভার স্যা বিশেল এর চৌনাথা পার হতে যাচ্ছি (তখন আমার ঐ দেশে থাকার শেষের দিকটা)। জানতে পারছি যে কয়েক মাসের মধ্যেই আমি এক দ্বিা উপস্থিতির সাননে গিয়ে হাটির হবো, তখন সেট চিত্রা গিয়েই বিভোর হবে আছি, অন্য কোনো কথাই ভাবি না)। রোজ সন্ধ্যার সময় আমি লুপ্তবুর্গের দিকে বেড়াতে যেতাম, কিন্তু না থাকতো ভিতরের দিকে। তেনন অবশ্যই চৌনাথা পেরোতে যাওয়া খুবই নির্দোষের কাজ। কিন্তু আমি তেননি আননা ভাবেই চৌনাথায় সেবেছি। হঠাৎ এমন এক প্রচণ্ড ঝাঝ খেলা, কেউ যেন আমাকে খুব ভোরে একটা টেলা মারলে। আমিই উঠে যেনি আমি এক পা পেছিয়েছি, অমনি সাননে দিয়ে একটা টানখাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেল। সেই টানটাই যেন ডকাৎ থেকে হাত বাড়িয়ে আমাকে টেলে সরিয়ে দিলে। আমার সেহকে দিয়ে যে বস্কাবচের নতো সূক্ষ্ম পরিবর্তন ছিল তাতেই ধাক্কাটা এসে

নেগেছিল (উচ্চাশক্তি তখন প্রবল পাকায় সেটি আমার বেশ ভালোই ছিল)। এর উপরে থাকা এসে লাগায় নতুন হলো বেন থেকেই বাঙালি লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ওজনালি কণ্ঠকটরেন ধনক। পিত্ত হটতেই টানটা স্তম্ভ দিয়ে সেরিয়ে গেল।

সবগুলি বনে পড়ছেন, কিন্তু আরো বৃষ্টিও আছে অল্প।

এর নানারকম কারণ থাকতে পারে। কেউ হয়তো প্রাণই আমাকে জানিয়ে দেবে, হয়তো কোনো রকাকারী সত্তা; কিংবা হয়তো আমার সূক্ষ্মদেহের পর্নিয়রই (aura) আমাকে রক্ষা করে। অনেক রকম ব্যাপারেই তা হয়। ভীষন হ্যাঁ কেবল ভয়দেহ নিয়েই সীমাবদ্ধ নয়, তাই নানা দিক থেকেই সুরোপ মেনে এবং তাতে নিজেদের কনভার্টে। যার কাছে উচ্চাশক্তি শিখেরছিনান তিনি গোড়াতেই বলেছিলেন, "তোমরা নিজেদের অনুভূতিগুলির সম্যক ব্যবহার করোনা যা জীবনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এমন কি সাধারণ জীবনের বোঝাও।" এ কথা খুবই ঠিক। ইন্ডিয়ানির দ্বারা আমার যা কিছু জানি তার চেয়ে আরো অনেক বেশী জানতে পারি যদি তার জন্য চেষ্টা করি, কেবল বনের দিক দিয়ে নয়, কিন্তু প্রাণের এবং দেহের দিক দিয়েও।

*

প্রশ্ন সে চেষ্টার প্রণালী কেনন হবে?

উত্তর প্রণালী খুবই সহজ। কেবল কতগুলি সাধন তোমাকে শিখতে হবে, এবং তুমি কেনন মিনিস জানতে চাও তার উপরেই তা নির্ভর করে।

প্রত্যেক মিনিসের পক্ষেই একটি নিয়ম আছে। প্রথম নিয়ম, তুমি যা প্রকৃতিই চাও তার জন্য একটি পুনঃসংকল্প থাকবে। অতঃপর তোমাকে অনুভবের ক্রিয়াগুলি বুঝিয়ে দেওয়া হবে যা বস্তু করতে দীর্ঘ সময় লাগবে। প্রথমে ওক করবে একটি বা উল্লেখ্যক অনুভূতি নিয়ে, তার দিকে তোমার বিশেষ নান আছে, এবং তাই নিয়ে অনুশীলন করতে থাকবে। দেহের পেশীগুলির জন্য যেমন ব্যায়াম করো, এও কতকটা তাই। এইভাবে ইচ্ছাশক্তিও বাড়াবে।

কিন্তু সূক্ষ্ম মিনিসের বেলাতে তার একটি সঠিক স্বরূপ তোমাকে গড়ে দিতে হবে, তার স্পন্দনগুলির সঙ্গে সংযোগ ঘটতে হবে, আর একাগ্রতার সঙ্গে তাই অভ্যাস করতে হবে, যেমন, কোনো কিছু দেখার সময় তার ভিতরটা পর্যন্ত ভেদ করে দেখা, কোনো ধ্বনি শুনে তার সূক্ষ্ম মূল কোণার তার অনুসন্ধান করা, বস্তুটুকু চোখে দেখে তার চেয়ে আরো

* যা পরে আরো পরিষ্কার করে কলেন, "যদিও উচ্চাশক্তি ওজনে পাওয়া, মনঃসংকল্পের পটীয়ে, ওখা ও প্রকৃতি শব্দের সম্মিলনে কিংবা স্মৃতিতেও পটীয়ে প্রাপ্ত যে মনঃসংকল্প তার সঙ্গে সংযোগ মান। এর অর্থ স্বকীয়মানের ওপারে প্রাপ্ত যে আনন্দিক সত্তা (যাক সত্তাও বাক্যে পারে, তবে সাধারণতঃ প্রকৃতি শব্দের পক্ষেই বাক্যে আনন্দিক সত্তা) তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন।"

অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে চেষ্টা করা। এক সময়ে যখন আমি অল্পবে দীর্ঘ কর্তক নাস শয্যাগত ছিলাম, তখন তখনে নিত্যশ্রু একঘেরে লাগতো, তখন আমি ঘরের বাইরে দেখতে চাইতাম। আমার ঘরের পাশে ছিল একটি ছোটো ঘর, তারপরে একটি গাঁকোর বড়ো লম্বা চলে গিয়ে বাগানের মাঝখানে সেটা একটি সিঁড়ি হয়ে শেষে উঠেছে এক চিত্রকরের টুডিওতে, বাগানের মাঝখানে হয়েচে সেটা টুডিওটি। আমি দেখতে চাইতাম যে জা টুডিওর মধ্যে কি হচ্ছে, কেবল বহু বরাণি দেখে দেখে আমার বিরক্ত লাগছিল। আমি কোথ বুঝে দ্বির হয়ে নিষের চেতনাকে সেই দিকে পাঠাতে পারতাম প্রত্যাহই। তার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক ক'রে নিয়েছিলাম, একটু একটু ক'রে তখন এই অভ্যাস করতাম। এতে প্রথমে কল্পনাকে আশ্রয় করতে হয়, তার পরে আসে বাস্তব। কিছুকাল পরে আমি দৈমিক অনুভবেই জানতে পারলাম যে আমার দৃষ্টি ভ্রমসূত্র পর্যন্ত বেতে পারছে, সেই দৃষ্টিকে অনুসরণ ক'রে আমি সেই নীচের তলার এমন সব ঘটনা দেখতে লাগলাম যার সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই। পরে যা দেখেছি তা সত্য কিনা এর প্রমাণ পাবার জন্য সন্ধ্যার সময় সকলকে চিত্রাশা করতাম, “আজ যত্ন সময় কি ওখানে এটা ঘটনা হয়েছিল, যা অনুক কালটি কি এই ভাবে করা হয়েছিল?”

কিন্তু এমন প্রত্যেক কিছুই জানতে পারলেও আমার পরে নাস ধর্ম্য ধ'রে দৃষ্টির সঙ্গে সাধনা ক'রে যেতে হবে। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে এই কাজে লাগাতে হবে, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, এমন কি স্বাদ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি সব কিছুর বেনাতেই সূক্ষ্ম অনুভূতি আসবে।

মনের দিক থেকে এ কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ মনের একাগ্রতা আনতে তুমি অভ্যস্ত। কোনো কিছুর উত্তর জানতে চিন্তার রাস্তা ছেড়ে দিয়ে যদি মনের ক্রিয়া শুরু ক'রে দিয়ে প্রশুণিকের তীব্র ক'রে গভীরভাবে একাগ্র থাকতে চেষ্টা করো, চিন্তার কাছ থেকে বাওয়াতে সেই একাগ্রতার ফলে চোনার উত্তর মনে বেতে পারে। এতেও কিছু সময় লাগে। কিন্তু মনোযোগী শিক্ষার্থী হয়ে যদি এটা অভ্যাস করো তাহলে কালটি কঠিন হয়না।

ইন্দ্রিয় চেতনাকে ও এই ভাবে প্রসারিত ও তীক্ষ্ণ করা যায়। বেড ইণ্ডিয়ানদের শ্রবণ ও শ্রাবণশক্তি আমাদের চেয়ে অনেকদূর পর্যন্ত যায়—যার কুকুরদের কথা ছেড়েই দাও। একজন ভারতীয়কে আমি জানতাম (যার আটদশ বছর বয়সের বড়), সে এসেছিল হিপোড্রোমের সময় যাকেনো বনের সঙ্গে—যদি অনেক কাল আগের কথা বলছি, তখন আমি নাত্র আট বছরের। সেই লোকটি অনেক দূরের শব্দ শুনতো মাটিতে কান পেতে, বহুদূর থেকে কেউ বেঁটে আসছে তার স্পন্দন সে কান পেতে ধরতে পারতো, তার শ্রবণশক্তি এতই সূক্ষ্ম ছিল। ছেনেবেয়েরা তাকে ধরে বসতো, “আমাদের এটা শিখিয়ে দাও।” সে বলতো, আচ্ছা, তাহলে এর জন্যে চেষ্টা করো, চেষ্টা করলেই শিখে ফেলবে। একটা খেলার বড়ো এই করতে থাকো, অন্যেই কাছ হবে।*

* S. A. I. C. E. Bulletin, April '62 থেকে। অনুবাদ—গণপতি ভট্টাচার্য

যোগের প্রথম পাঠ

শ্রীশ্রবিন্দ

কর্ম

প্রশ্ন : স্নানকালে যখন সাধনা করতে আগ্রহে আসে এবং মাথার আগ্রহে বাস করে, তাদের পক্ষে কি সাধনার উন্নতির জন্য আগ্রহের কিছু কাজ করা প্রকার ?

উত্তর : তাদের তা' করা উচিত।

প্রঃ মাথার কাছে কি নিজে থেকেই ডায়া কাজ চেষ্টা নেবে, নাকি তিনি যতক্ষণ না কোনও কাজ দেন, ততক্ষণ অপেক্ষা করবে ?

উঃ যথার্থ মনোভাব থাকলে নিজে থেকেই চেষ্টা নেবে।

প্রঃ সাধক যদি তার পছন্দনত কোনও কাজের জন্যে মাথার অনুমতি প্রার্থনা করে এবং না তা' অনুমোদন করেন, তবে পে-কাজ কি মাথার জন্যে করা হয়েচে বলা চলে ?

উঃ সাধককে প্রয়োজননত সব কাজই করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে, কেবল তার পছন্দনত কাজই নয়।

প্রঃ অনেকে বলে যে সাধক যদি কোনও কাজ করার জন্যে মাথার অনুমতি প্রার্থনা করে ও তিনি তা' মত্ব করেন, তবে তা' সর্বতোভাবে মাথার কাজ বলা চলে না। না নিজে থেকেই দেন, কেবলমাত্র তা'ই তার কাজ। একথা কি ঠিক ?

উঃ ঠিক ও-রকম বলা চলে না।

প্রঃ আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে সাধারণত আগ্রহে কিছু কাজের প্রয়োজন হ'লেই সাধকেরা বলে : “এ যদি আসায় নতুন তবেই আমি করব।” প্রায়ই মাথার মাথার, হস্ত-কারী কাজটি এইভাবে অবলোচিত হয়। মাথার নামে তা' প্রত্যাখ্যান করা কি অকপটতার লক্ষণ ?

উ: যদি সত্যিই মানব নির্দেশের ওপর তাঁরা নির্ভর করে চলে, তবে কিছু বলাই নেই। কিন্তু তাঁ' যদি কখনো কিছু এড়িয়ে যাবার যত্নগ্রহণ হয়, সে-কথা অন্যায়। তবে তাঁ' কেবল বিশেষণ ওপর নির্ভর করে। একজনকে দিচ্চাযুক্তি বা সাধারণ-বুদ্ধি অন্যজনের সমান হ'তে পারে না। একজন যা' সত্যাকার করণীর মনে করে, অন্যো সেভাবে না-ও নিতে পারে।

প্র: যখন কোনও কালে স্ত্রীরা সত্যাকার প্রয়োজন আসে আর কোনও সাধককে সেখানে ডাকলে সে বলে, "যাদের আদেশ বিনা আমি এক মুহূর্তের জন্যেও সাহায্য করতে অক্ষম।" একথা কি তাঁর অক্ষপাতি বিচারবুদ্ধিই তাকে বলায়?

উ: সাধারণত সে অক্ষপাতি নয়; এর অর্থ, সে এড়িয়ে যেতে চায়।

প্র: আশ্রমের অনেক বলে, "যদি না আমাদের কোনও কাজ না দেন, তবে আমরা নিজে থেকে তাঁ' চাইব কেন? তাঁর অভিনাশ হয়, তিনি নিজেই আমাদের কাজ দেখেন। সে-কোনো মাকে হিজালা করতে যাওয়া, নিষ্করোজন।" এদের বিচারবুদ্ধি কতদূর সঠিক?

উ: যদি কখনো কিছু থাকেই, তবে বেচজার কাজ না দেবার কোনও কারণ দেখি না। অনেক-সময়, স্ত্রীরা কার্য থাকা গবেও কেউ বেচজার তাঁ' চায় না ব'লে তাঁ' করা হ'য়ে ওঠে না। আশ্রমের অবিকাংশ কাজই খুব অল্পসংখ্যক করেকজনের সাহায্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে, যেক্ষেত্রে অন্যেরা করে সামান্যই অথবা অভিক্রটি অনুযায়ী।

প্র: "আশ্রমের অবিকাংশ কাজই খুব অল্পসংখ্যক করেকজনের সাহায্যে হ'য়ে থাকে, যেক্ষেত্রে অন্যেরা করে সামান্যই অথবা অভিক্রটি অনুযায়ী" আপনার এই লেখার অর্থ কি? একথা কি লোভের যে তারা আত্মপূর্ণতা ও তৃপ্তি অনুভব না করে, তাদের জন্যে নয়?

উ: আমি কেবল বলতে চেয়েছি যে উৎসাহী কনীর সংখ্যা কম এবং যখনই কোনও কাজের প্রকাশ হয়, এরাই আগে এগিয়ে—আর সবাই নিরুৎসাহ-মনে আপন পছন্দমত কোনও বাধা কাট করে অথবা অনেকে সামান্যই বা বলতে গেলে কিছুই করে না।

প্র: যদি কোনও সাধক বোঝে, সে ধ্যান করতে অসমর্থ, তবে কি শুধুমাত্র যাদের কাজ করেই সে সাধনার পথে উন্মুক্তিলাভ করতে পারে?

উ: যাদের এবং তাঁর চেতনার ও শক্তির দিকে নিতেন্দ্রে নেনে ধ'রে সে যদি সে-কাজ করে আত্মনিবেদনের মনোভাব নিয়ে।

প্রঃ যদি কেউ আশ্রমে যোগ দেন এবং অকপটভাবে নায়ের সেবা কাছ করে, অথচ প্রায়ই বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়, তবে কি সন্তিই সে সাধক নয়? তার মানে কি আত্মজানের সঠিক নমোভাব নিয়ে সে কান করতে না?

উঃ তা' নির্ভর করতে সাধকের উপর। একই অবস্থার কেউ সর্বশ পাকতে পারে না; কখনো তা' নয়। মূলতঃ তার কাছ ও সাধনার সে যদি অকপট হয়, তবে সে সাধক; কিন্তু যদি কালেরই প্রতিরে অথবা স্বার্থপ্রবোধিত হ'রে সে কাছ করে, তাকে আত্মনিবেদনের নমোভাব বলা চলে না।

প্রঃ কেউ কেউ বলে যে যোগ হচ্ছে যজ্ঞ অনেককেই না আশ্রমে সাধক-ভিসানে গ্রহণ করেন এবং কেবলমাত্র যোগের সস্তাবনার পথে আসতে হওয়ায় সেবার উদ্দেশ্যেই কিছু কাছ দেন তাদের। এ-উদ্দেশ্যে সত্য কষ্টটুকু আছে?

উঃ তাদের উদ্ভিক্ষেপে ফে-অনুবোধ ভূমি পাঠিয়েছে তা অর্থাৎ।

প্রঃ আমার বিশ্বাস, শ্রীমদবিষ্ণু আশ্রম এক পুণ্যস্থান এবং যদি কেউ এখানে এসে ঠিকরত কাছ করে, তবে ভাগবত শক্তিই তাকে পরিচালিত করবে, এবং যদি নায়ের কাছে আত্মনিবেদনের নমোভাব নিয়ে কাছ করা হয়, তবে নায়েরই যত্নে সে পরিণত হয়। এমন-কি আশ্রমের পরিবেশই তাকে এ-নমোভাব নিতে সাহায্য করবে। আমার বিশ্বাস কি ঠিক?

উঃ আশ্রমের পরিবেশে এক শক্তি থাকতে পারে এবং আছে ও, কিন্তু বাড়ির আন্তর স্বীকৃতিও আবশ্যিক।

প্রঃ 'ক' ধন আর আমাদের কাছে যোগ দিতে এসেছিল, 'ব' পরিচাল করে বলেছিল "ভূমি এ-কাছ করতে এসেছ কেন? এ ভাবি কদিন কাছ। এ-কাছ হোনার না করাই মঙ্গল।" যদিও পরিচাল করেই সে বলেছিল, তবু, এমন কথায় আমার কতি হওয়া সম্ভব নয় কি?

উঃ হী। এগর কথা অন্যতর এবং কতিও করতে পারে।

প্রঃ অতিমানস সত্য উপনক্ষি করতে এবং আধ্যাত্মিক চেতনার বর্ধিত হ'তে গেলে কাছ কি না-করলেই নয়?

উঃ সাধারণ নন থেকে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্নীত হওয়া যার ভগ্নমানে তত্ত্ব, উৎসর্গীকৃত কর্ম ও ধ্যানের সাহায্যে। আমাদের যোগে—কেবলমাত্র নিশ্চল শান্তি বা নবাবিই যার লক্ষ্য নয়, বরং উচ্চেয্য যার সক্রিয় আধ্যাত্মিক কবই—কর্ম অপরিহার্য।

অভিব্যাস-মহাত্মন কথ্য হইত তা ভগবানেরও সর্বোত্তম শক্তির ক্রিয়ার অবতরণের ওপরেই নির্ভরশীল এবং কোনও প্রকারী না নিয়মে বাধা নেই।

প্রঃ সাধকের পক্ষে কি কালের সাধ্যবো অভিব্যাসকে উপলব্ধি করা সম্ভব ?

উঃ যদি তাদের সঠিক চেতনা থাকে।

প্রঃ না বিবেচন, “মানব-প্রকৃতিতে কর্ণের বোধ অতি বড় বোধ।” বোধ বলতে এখানে কি বোঝায় ?

উঃ বোধ অর্থ এই যে আপন কাজকে অতি প্রয়োজনীয় এবং তাদের অসংস্কারপূর্ণ উদ্দেশ্যই যে অবশ্য-অনুসরণযোগ্য সত্য, তারা একপাই নবন করে।

প্রঃ আমি লক্ষ্য ক’রে দেখেছি, যখন একা থাকি এবং কোনও কাজ করি না, তখন শান্তি ও আশুহা আসায় থাকে, কিন্তু যখন আমি কাজে বাহ্য থাকি এবং অনেক সংস্পর্শে আসি তখন অনেক বিঘ্ন আসে ও আবার শান্তি ও আশুহা চলে যায়। এর কারণ কি ?

উঃ কর্ম ও গতিতে শান্ত, সমাপিত থাকবার বিঘ্ন এটা ; যখন কোনও কাজ থাকে না এবং তুমি চুপচাপ বসে থাক, তখন শান্তি হওয়া অনেক দোজা।

প্রঃ অনেকে বলে যে সাহিত্য বা শিল্পে দক্ষতা না থাকলে সাধনায় উন্নতিলাভ করা যায় না এবং ভগবানের কাছে যত্ন হওয়া যায় না। একথা কি সত্যি ?

উঃ এসব কথা একেবারে নিরর্থক। অনেকে, যারা সাধনায় সবচেয়ে বেশি উন্নতি করছে, ভালভাবে লিখতে পর্যাপ্ত জানে না এবং কোনও শিল্প সম্বন্ধেও অজ্ঞ। *

* Elements of Yoga দেঃঃ অনুদিত

বাউকা

স্বদেশী



শ্রী অন্নবিন্দ অন্দির

১৮ মে ১৯৬৪, ১৯৬৯

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର

ବତ୍ତିକା

(୨୫ମେ ମହେଶ୍ୱର, ୧୯୭୨)



ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠମନ୍ଦିର

୧୫ ବାହିନ ଚାଟାଞ୍ଜି ହିଟ : କଳିକାତା—୧୨

১। চিত্রাবলি ও ছদ্মাবলি	ঐশ্বরবিন্দ	১
২। ২৪শে নভেম্বর, ১৯২৩		৫
৩। দ্বিতীয় পাতা	ঐনগিনীকান্ত গুপ্ত	১১
৪। যোগসম্বন্ধ-প্রস্তাব	অম্বিবাণ	১৮
৫। কোরিয়া সম্পর্কে	ঐশ্বরবিন্দ	৩০
৬। বোগের প্রথম পাতা	ঐশ্বরবিন্দ	৩৪
৭। বাবের সঙ্গে কথা	ঐশ্বর	৩৭
৮। প্রস্তোভ	ঐশ্বর	৫৬
৯। বশোভার উল্লীক্ষ	ঐশ্বরভাসোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৬১
১০। দ্বিতীয় (কবিতা)	নিমিত্ত	৬২

বস্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫০ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-বাংলার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা বধাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

শাখা :
ঐশ্বরবিন্দ পাঠমন্দির
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
ঐশ্বরবিন্দ আশ্রম
পত্রিকাগার

মূল্য—১৪০ টাকা

প্রকাশক—ঐশ্বরবিন্দ পাঠমন্দির, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মুদ্রক—ঐশ্বরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পত্রিকাগার



*In works, aspiration
towards Perfection is
true spirituality*



কাছে নিখুঁতভাবে কাজ করবার ঐকান্তিক
আগ্রহই সত্যকার আধ্যাত্মিকতা।

শ্রীম।

চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

পূর্বস্বপ্নবি

শ্রীঅন্নবিল

ভক্তি

আমরা অজ্ঞান, তাই শিশুদের মত আমাদের গর্বে যে খাঁড়া হয়ে আমরা বাঁটতে পারছি, কারো সাহায্য না নিয়ে, অথচ তখনই আবার অভিনাদ উৎসুক হয়ে জানতে চাই যে যা রয়েছে কীভাবে হাত দিয়ে ঠিক ধরে রাখতে। আমাদের যখন জ্ঞান হয় তখন ফিরে তাকাই, দেখি ভগবান চিরদিন আমাদের নিয়ে চলেছেন, ধরে ধরেছেন।

*

গোড়ায়, আবার যখন পাপ করে ফেলেছি সেখান, তখন কেঁদে ফেলতাম, নিজের বিরুদ্ধে, ভগবানের বিরুদ্ধে আক্রোশ হ'ত, কেন ভগবান এমন ঘটতে দিয়েছেন। পরে, আবার সাহস হ'ত শুধু এইটুকু ভিজ্জাসা করতে, “খেলার সাথী, কাদার নথো আবার কেন আমার তুনি লুটিয়ে দিলে?” কিন্তু এ কথা-ও, আবার মনে হ'ল, অতিরিক্ত দুঃসাহসের ও দঠকারিতার—আনি শুধু কথাটি না বলে উঠে দাঁড়াইতাম, চোখের ঠাণ্ডে একবার তাকে দেখে নিতাম, নিজেকে ঝেড়ে মুছে ফেলতাম।

*

ভগবান জীবনকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যে পৃথিবী হ'ল যেন অন্তরায়ের পতি, আর কৃষ্ণ হল তার দিবা উপ-পতি। জগতের প্রতি আমাদের সেবার কর্তব্য রয়েছে, তার একটা নিয়মে আমরা বস্তু, তার রয়েছে একটা বাধ্যকরী জননত আর স্বপ্নঃস্ব-ভোগের সাধারণ অভিজ্ঞতা, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের আগ্রহনা, আমাদের সান্দ্রা ও গোপন আনন্দ রয়েছে আমাদের প্রেমাস্পদের জন্যে।

*

ভাগবত আনন্দ একটা গোপন অনির্বচনীয় বস্তু—এমন এক রহস্য ও নন্ততা, যাকে জড়বুদ্ধি অটহাসো উপহাস করবে—কিন্তু অন্তরাত্ম একবার তাকে আশ্বাস করলে, আর ছাড়তে পারে না, তাতে ভাগতিক অপবাদ, উৎপীড়ন, বঞ্চনা বডই নিয়ে আহুক না।

*

ভগবান, বিশৃঙ্খল হনেন জোয়ার মনের চেয়ে বেশী জানী—তাকে নির্ভর কর, ঐ যে বস্তু স্বাধীনস্বাধী আত্মতরী চিরন্তন সংশ্লী তার উপর নয়।

*

সংশ্লী মন সর্বদা সপেক্ষ করে, কারণ সে বুঝতে পারে না—কিন্তু ভগবৎ-প্রেমিকের

বিশ্বাস বুঝান কন্যা না দিলেও, যেহেতু ধ্যানধারণা করত—আমাদের অতীতকালের পক্ষে ও-দৃষ্টি জিনিষই প্রকার—কিন্তু কোনাও যে বেশি শক্তিমাত্র জাতে বিশ্বাসই সন্দেহ নাই। আর যা আমি বুঝতে পারি না, এক দিন তা আশঙ্ক করবই, কিন্তু বিশ্বাস ও শ্রেন যদি হারাই তাহ'লে আমার ভগবৎ-নিষ্টি দক্ষা থেকেই আমি হুট হব।

*

আমি ভগবানকে প্রণাম করতে পারি, তিনি হলেন আমার দিশারী, শিক্ষাদাতা—তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি, “আমি ঠিক চানছি ত’, না, তোমার ভালবাসা তোমার জ্ঞানেরই নির্দেশে তুমি আমার মনকে ভুলপথে চলতে দিবেছ ?” যদি ইচ্ছা যায় তোমার মনকে তুমি সশেষ করতে পার, কিন্তু সশেষ ক’রো না ভগবান তোমাকে নিয়ে চলেছেন।

*

গোড়ায় তোমাকে ভগবান সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ ধারণা সব দেওয়া হয়েছিল, তাই এখন আত্মশোধে বলাই তিনি নাহি। কিন্তু যে মরবর। তোমার শিক্ষককে তুমি কি সশেষ কর, যেহেতু গোড়াতেই তিনি তোমাকে সমস্ত জ্ঞান দান করেন নি ? সেই অসম্পূর্ণ সত্যকেই বরং বেশ অনুধাবন করে, তাকে তার যথাযথ স্থান দাও—যাতে সেটি পার হয়ে তুমি নিখিঁস্তু পৌঁছিতে পার যে বৃহত্তর জ্ঞান তোমার সম্মুখে ফুটে উঠছে সেখানে গিয়ে।

*

এই সকলেই ভগবান মত শিশু জীবাত্মাকে, দুর্বলকে তাঁর ভালবাসা দিয়ে শিখিয়ে চলেন, পদে পদে হাত ধরে চলেন, তাদের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে ঢেকে রাখেন তাঁর অস্তিত্ব পর্যবেক্ষণের সব, বর্তমানে যেখানে আরোহণ করা তাদের সম্ভব নয়। আর আমাদের প্রত্যেকেরই কি নাই কোন না কোন দুর্বলতা ? আমরা সকলেই কি তাঁর দৃষ্টিতে ছোট ছোট সব শিশু নই ?

*

এ জিনিষ আমি সেবেছি যে ভগবান যখনই আমার কাছে থেকে কিছু আকর্ষণ করে যেবেছেন, তা তিনি করেছেন সমুদ্রে সজ্ঞানে। যদি আমি হাতের নুষ্ঠার মধ্যে ধরতাম তখন সে জিনিষ, তাহলে একটা পরম প্রেরকে আমি বদলে দিতাম একটা পরম বিশ্বাসকে। তবুও কখনও কখনও, যখন আমার জোর অবসরশক্তি করি, তখন ভগবান বিশ্বাস করতেনও আমাদের ঘেন যাতে আমাদের শিক্ষাদাতা হয় সে-জিনিষ থেকে সরে পাড়ানার জন্যে, যাতে সজ্ঞানে আমরা আত্মদান করতে পারি তাঁর অনুভবের ভোজ্য ও পানীয়।

*

মাস্তিক যে তারও আর সেখা উচিত যে সৃষ্টি চলেছে একটা অসীম বিপুল উদ্দেশ্য নিয়ে—এবং সে-উদ্দেশ্যই রয়েছে জনবিশ্বাসের পিছনে। কিন্তু অসীম উদ্দেশ্য ও সার্থকতার অর্থ একটা অসীম প্রজ্ঞা তার পিছনে রয়েছে, ভৈরী করে, পথ দেখিয়ে, রূপ দিয়ে, রক্ষা করে, সার্থক করেই চলেছে। সেই প্রজ্ঞাকেই তুমি পূজা করহ, জেতার অস্তরে তাকেই দিয়ে

চলেছ তোমার চিন্তার অর্থা, নশিরে তাকে যদিই বা না দাও ধূপের অর্থা, বলিষ্ট বা তুনি অগ্নি সেই প্রেমের জ্বরকে, অগ্নির আত্মজ্যোতির্ভাঃ সেই নরকে বাতাস বীকার নাই কর, তা হলেও যদিই বা তোমার এ জ্ঞান নাই হয়, তুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণকেই পূজা করে, অর্থ্য-দান করে চলেছ ।

*

প্রেমের ভগবান বলেছেন, “অজ্ঞেয়কে, অনির্দেশ্যকে যে অনুসরণ করে সেও আনাকেই অনুসরণ করে, আমি তাদের গ্রহণ করি ।” স্মৃত্যঃ তাঁর কথায় তিনি মায়াবাদীকে অজ্ঞেয়বাদীকেও সমর্থনই করছেন । তুনিই কেন তবে, যে ভক্ত, তোমার ভগবান থাকে গ্রহণ করেছেন তাকে উপহাস কর ?

*

ক্যান্ডিন চিরন্তন নরকের যৌক্তিকতা দেখিয়েছিলেন—তিনি ভগবানকে জানতেন না, ভগবানের একটা বিকট মুখাসকেই তাঁর চিরন্তন সত্য বলে গ্রহণ করেছেন । যদি একটা অস্ত্রহীন নরক থাকতই, তবে আনন্দের অস্ত্রহীন প্রতিষ্ঠা হিলাবেই তা থাকতে পারে । কারণ ভগবান হলেন আনন্দ—তাঁর আনন্দের আনন্দ্য ব্যক্তিরকে আর কোন আনন্দ্য নেই ।

*

দাস্তে যখন বললেন ভগবানের পরম প্রেমই চিরন্তন নরক সৃষ্টি করেছে, তখন কত বড় ভানের কথা তিনি লিগলেন তা নিজেই তিনি জানতেন না । কারণ, ইত্যন্তঃ নিকিষ্ট ক্ষণিকসৃষ্টির ফলে আমি করনও কখনও ভেবেছি যে নরক হল সেই স্থান যেখানে আমাদের অস্ত্রায়া সত্য করে মুগ-মুগব্যাণী অসহ্য আনন্দ, আপনাকে এনিরে লুটিয়ে দেয় যেন চির-কালের জন্য ভীষণ-নধুর রক্তশেষের একান্ত আনিদনে ।

*

ওরুপী ভগবানের শিষ্য, পিতারুপী ভগবানের পুত্র, মাতুরুপী ভগবানের স্নেহ, িত্ররুপী ভগবানের করগ্রহণ, আনাদের চিরকিশোর সঙ্গী ও বেলান সাধীকে নিয়ে হাসি-রস, প্রভুরুপী ভগবানের দাস, আনাদের দিবা প্রেমিকের রত্নসোচ্ছন্ন প্রেম—এই সাতটি হ'ল মানুষী মেহে জীবনের সপ্ত-রস-সার । এই সবগুলিকে তুনি বিনিয়ে একই ব্রাহ্মণ-স্বর্গরস্তিত পরম সম্বন্ধে পরিণত করতে পার না ? তখন তা হ'লে তোমার আর কোন স্বর্ণের প্রয়োজন হবে না, অমৈতবাদীর মুক্তিকেও তখন তুনি ছাড়িয়ে যাবে ।

*

অগৎ কখন আদর্শ স্বর্ণে পরিণত হবে ? যখন সবচেয়ে মানবজাতি পরিণত হবে সব বালক-বালিকারূপে, যারা কৃষ্ণ-কালীরূপে প্রকট ভগবানের সম্মুখে—মানবসম্মুখের মধ্যে যে দুজন সবচেয়ে ছোট বালক ও সবচেয়ে বড় বালিকা, তাদের সঙ্গে মিলে খেলছে নন্দন-কাননে । সেনেটিক জাতিদের নন্দন স্নানর জিনিষ বটে কিন্তু আদম আর ঈভ একটু বেশি বয়স হয়ে গিয়েছে আর

তার ভগবানও কেমন অতিরিজ্ঞ বৃদ্ধ আর কঠোর আর গুরু-গভীর—তাই তারা দুজন মাগ-সেবের নিবন্ধে মোড় স্মরণ করতে পারল না ।

*

সেনিটিক জাতি মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে ভগবান সম্বন্ধে এই ধারণাও যে তিনি হলেন কঠোর পরিমায়ন স্বাক্ষর, গুরুগভীর বিচারকর্তা, সে জানে না কৃতি কি ? কিন্তু আমরা কৃচ্ছকে দেখছি, আনি তিনি জীড়া-বিশালী বালক, রত্নরসে হাসো-নাসো মণ্ডল কিশোর ।

*

যে ভগবান হাসতে জানেন না, তিনি কখনও এই রত্নরস বিপুল স্রষ্টা করতে পারেন না ।

*

ভগবান একটি নিতকে তাঁর আনন্দময় কোলে ডুলে নিনেন তাকে আদর করবার জন্যে—
—মাঝের ডাঙে কাণ্ডা। এল, তাঁকে সান্নাৎ সেওয়া কঠিন হল, কারণ তাঁর সন্তান আর রইল না ।

যখন দুঃখে মোকে দুর্ভোগে কষ্ট পাই, তখন আনি যেন বলি "আরে আমার খেলার সান্নাৎ, আবার তুমি আমার সঙ্গে আড়ি করছ"—নেপে ঘাই যেন দুঃখের স্বর্থ, শোকের স্বর্থ আর দুর্ভোগের সোভাগ্য আদরণ করতে, যেন সে দেখতে পায় যে সে ধরা পড়ে গিয়েছে, সরিয়ে নিয়ে যায় আমার কাছ থেকে তার ভূত-প্রেত, স্বাক্ষর-স্বাক্ষরদের মল সব ।

*

ভগবত-ভ্রান্নের ভিত্তাস, কৃষ্ণ কর্তক গোপীদের বস্ত্রোপহরণ আগ্রাহ্যে দেখে জীবাত্মার সঙ্গে পরবাক্যর যে নান্দা তার গভীরতম রূপক, তত্ত্ব দেখে হৃদয়ের রহস্যময় অভিজ্ঞতা কি রকমে নিমুণ্ডানে অনুদিত হয়েছে দিব্য-কর্ণে আর লম্পট ও গুচিগ্রন্থ (একই স্বভাবের দুই বৃদ্ধি) দেখে যৌন কাহিনী । মানুষের নিজের ভিতরে যা আছে, তাই সে দেখে স্বর্ষগ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে ।

*

আবার গরিত আবার পাপের পরিধান খুলে নিল, আনি তা ফেলে দিলান পরন আনন্দে । তারপর সে আবার পুণ্যের পরিধান ধরে চান দিল, আনি লঙ্ঘিত হয়ে সমস্ত হয়ে পড়লান, তাকে ধানিয়ে দিলান । যখন সে জোর করে তা ছিনিয়ে নিল আবার গাঁরে থেকে, তখনই দেখলান আবার অশুঃপুরুষ কেমন করে নুকিয়ে আবার কাছ থেকে ।

*

পাপ হ'ল শ্রীকৃষ্ণের একটা হল, একটা হৃদ্যবেশ নিতকে পুণ্যবানদের নজর থেকে নুকিয়ে রাখবার জন্যে । চেয়ে দেখ স্বর্ষস্বর্ষী । পাপীর মধ্যে ভগবানকে, পাপ দেখে নিজের মধ্যে—হৃদয়কে পরিত্যক্ত করে ভোবার ভাইকে আলিঙ্গন দাও ।*

*

ভগবৎ-প্রেম, ভূত-মহা—পূর্ণভাসের এই প্রথম ধাপ ।

* Thoughts and Aphorisms কেক । অনুবাদ—ঈশ্বরীনাথ গুপ্ত

২৪শে নভেম্বর ১৯২৬ সাল

(১)

তার কিছুদিন আগে থেকেই শ্রীঅরবিন্দ জনেই বেশি করে অন্তর্ভুক্তি ও অন্তর্যামী হয়ে চলেছিলেন—বারিদের দিক থেকেও অর্থাৎ আমাদের কাছে যে চিহ্নটা গোচর হয়ে উঠেছিল তা হ'ল তাঁর বিশুদ্ধতার আহার জনে সরে সরে বিকেলের দিকে গড়িয়ে চলছিল। আমাদের একসঙ্গেই আহার হ'ত, শ্রীমা-ও আমাদেরই সঙ্গে আহারে বসতেন—এই লাইব্রেরী হাউসে, এখন যেটা রবীন্দ্রের ফলের বট, সেট বহরে—আমরা ছিলান আট-দশ জন। আগের দিন শ্রীঅরবিন্দ খেতে মাননেন প্রায় ৪টার পরে—আমরা সব অপেক্ষা করে থাকতাম।

তারপর ঐ দিন এল—আমরা বিকেলের দিকে পুষ্টি সন্ধ্যার যে বার নত বের হয়ে গিয়েছি। আমি ছিলান সন্ধ্যের ধারে—হঠাৎ একজন উজ্জ্বল এসে পৌড়ে এসে বললে : “হাও, হাও, শ্রীশ্রীর হাও, না ডাকছেন সবাইকে”—আমরা ত' কিছুই বুঝলান না কেন, পৌড়ে এলান। উঠে এলান উপরে—এখন যেটা Prosperity-র ব্যাংক সেখানে—সেখানে শ্রীঅরবিন্দ বসতেন সন্ধ্যার পরে সকলের সঙ্গে আলোপাদি অর্থাৎ প্রশ্নোত্তরের জন্য। আমি উঠেই সেদিন অপেক্ষা ধ'লাম, শ্রীঅরবিন্দ চেয়ারে বসে আসেন, না তাঁর পারের কাছে বসে—দুজনেই মাননেন আমাদের দিকে মুখ করে। আমি ভাবিয়ে দেখলান সবাই আছে কি না। দেখলান সন্তোষ নেই—বললান সন্তোষ আসে নি, ডাকব কি? না বলে উঠলেন, “yes, all, all”. সকলকে ডাকা হ'ল, সবাই উপস্থিত—আমরা সবাই বসলান। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য ও পরিষ্কৃতি—শ্রীঅরবিন্দ চেয়ারে বসেছেন—তাঁর সামনে পারের কাছে শ্রীমা ভুঁয়ে বসে আমাদের দিকে মুখ করে—সামনে আমরা সবাই—শ্রীঅরবিন্দ একহাত—ধাঁহাত—রেবেছেন বায়ের মাথার উপর, আর এক হাত—দক্ষিণ—বাড়িয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করছেন। সব নীরব শুধু গভীর উন্মূখী। আমরা সবাই শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দকে একে একে প্রণাম করে দাঁড়ালান—একটু পরে তাঁরা ভিতরে চলে গেলেন। এমন সময় দৃশ্য আমাদের মধ্যে ছিলেন, বলে উঠলেন প্রত্যাদিষ্ট হয়ে বেন—*The Lord has descended, he has conquered death and sorrow, he has brought down immortality.*”

এর পর থেকেই শ্রীঅরবিন্দ ভিতরে চলে গেলেন—অর্থাৎ আর বাইরে এসে সাক্ষাৎ বৈঠক করলেন না—এখন শ্রীমা প্রকট হলেন—আমাদের আদান-প্রদান থাকে সঙ্গে শুরু হ'ল।

শ্রীমা বোম তখন থেকে ধ্যানে বসতেন সবাইকে নিয়ে—সন্ধ্যার পরে—রাত্রে ; বসবার একটা ধারা তিনি দিক করে দিলেন—তার জানদিকে বসবে একের পর এক করে এক শ্রেণী, আর এক শ্রেণী তার বাঁ দিকে একের পর এক । নায়ের দক্ষিণ দিক হল জ্যোতির দিক আর বাম দিক হ'ল শক্তির দিক—পুষ্টি অনুসারে অথবা স্বভাব-স্বরূপ অনুসারে সকলে স্থান পেলো নায়ের দক্ষিণে ও বামে—আরি ছিনান নায়ের দক্ষিণে, অনুভূত ছিল নায়ের বামে ।

ধ্যানে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটত রোজই । পুরুষোত্তম ছিল যামাদের মধ্যে একজন—সে বসত নায়ের দিক গাবনে আনামা হয়ে । ধ্যান বেই আরম্ভ হবে অননি সে নড়তে শুরু করে—ধ্যানস্থ থেকেই—চলতে শুরু করে, চকু নিবীলিত রেখে অস্তঃপ্রভাব বোধভাঙেই । সে এসে আনামের এক একজনকে ধরে বসত, শুরু করত দলতে পিষতে, চুল-মাড়ি-গোঁফ টেনে ছিঁড়ে ফেলতেও কল্প করত না—আব্রা প্রার সকলেই তখন স্বর্ষীয় শব্দ-শব্দ-শব্দ-শব্দে পোড়িত ছিনান—ছিনান কেশরী । বসত সে এই তার কাজ, পরিণামধন করা, পরিণামধনে সাহায্য করা । এই পৌড়নে কারো কোন আপত্তি ত উঠতই না, সকলেই গ্রহণ করত অবিচলিত নির্বিচার চিত্ত—সানশেই—প্রয়োজন হিসাবে ও নায়ের আশাস্বাদ হিসাবে । তবে দু'একজনের উপরই তার ছিল আকর্ষণ । যা অবশ্য নিঃশব্দ ধ্যাননিবীলিত—সবই হত তাঁর পরিচালনার কিস্তি ভিতর থেকে । একদিন পুরুষোত্তম মুক্তকণ্ঠে শ্রীমাকে উদ্দেশ করে জানালেন—“না, আমি স্পর্ধা করি না, অতি বিনয়বশত হয়ে তোমাকে জানাই—না, তুমি যদি উদ্ভূতনা আধ্যাত্মিক আমি হলেন নিম্নতম এই পৃথিবীর শক্তি—আমাকে তুমি অধিকার দিয়েছ তোমার কাজের সহায়ক হতে ।” সে বলত শেখনাগ তার মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে, সে শেখ-নাগই—নিম্নতম তানসী শক্তি, নিশ্চেষ্টতার অধিষ্ঠাতা সে, তার কাজ সেই অন্ধকারে কাজ করা, সেখানে দাঁট দিয়ে পরিচয় করে আনোকের, উর্ধ্ব রাহুশক্তি স্থান করে দেওয়া । এইভাবে কিছুদিন চলেছিল এই ক্রিয়া, পরে তা বন্ধ হয় গেল । হত শুধু ধ্যান ।

নায়ের তখন প্রয়াস ছিল এক নব স্বষ্টি—এক আন্তর দিবা-চেতনার ভগ্ন । তিনি উদ্ভূত শক্তির—সেবতাদের নামিয়ে এনেছিলেন এই পাখির আবহাওয়ার মধ্যে—আনামের অস্তঃসত্য, অস্তঃচেতনার । সে-স্বষ্টির বিশেষ ছিল এই যে যামাদের প্রত্যেককে তিনি সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন প্রত্যেকের অস্তঃসত্যের সঙ্গে । প্রত্যেক ব্যক্তিরই আছে যাকে বলা যেতে পারে আধ্যাত্মিক বংশানুক্রম—প্রত্যেক ব্যক্তি-চেতনার নেনে এসেছে বংশাশ্রিত এক এক ভাগবত ব্যষ্টিসত্তা, এক এক সেবতা, এক এক বিত্তির প্রকাশধারা অবলম্বন করে । অস্তরের এই দিবা মহাভাবকে ধারণ করা প্রতিষ্ঠিত করা—জাতে অভিনিবিষ্ট একীভূত হয়ে গিয়ে তার প্রকাশ করে চলা বাহ্য জীবনে এই ছিল তখনকার সাধনার লক্ষ্য । এই সময়টা ছিল একান্ত একাগ্রতা বা একমুখিতার যুগ—যাকে বলা যেতে পারে কনঠবৃত্ত সাধনা । কনঠ অর্থ কূর্খ বা কচ্ছপ—কনঠবৃত্ত অর্থ কচ্ছপের বৃত্ত হাত পা মুখ ভিতরে গুটিয়ে নিয়ে খোলসের মধ্যে ডুবে থাকা—সাম্রিহের সঙ্গে সকল সংস্পর্শ বিচ্ছিন্ন করে । ব্যক্তিগত

এবং গোপ্লিগত চেতনাকে সর্বশা তার নিজস্ব উচ্চ স্থিতি বজায় রাখবার জন্য—তাকে বিস্তৃত অটল রাখবার জন্যে এই ব্যবস্থা—বাহিরের সাথে আনাদের আদান-প্রদান ছিল পূর্ব অল্প, অতি সঙ্কর্ণায়ে তা করা হত, নিষেদের চারদিকে ঘেঁষে দেওয়া হয়েছিল একটা শক্ত বেড় (cordon sanitaire—iron curtain তোমরা বলতে পার)। এমন কি আনাদের নিষেদের মধ্যেও এর ওর মধ্যে দেখা করা, এর ওর বাড়িতে লাগা—স্বপ্নতন বাতায় নানিয়ে ফেলা হয়েছিল। আনরা ফুটে উঠছিলেন, স্বাধীনতার ভাষা ফলা করে বলতে পারি—

“বৃহত্তম পুশন আপনাতে আপনি বিকশি” ইত্যাদি,

কিন্তু এ ধারায় কিছুপুর চলে শ্রীনা দেখলেন এভাবে সাফলা লাভ করলেও সে সঙ্গী হবে একটা সঙ্গী গোপ্লিগত এবং বেশির ভাগ অস্ত্র-ক্রিয়াগত। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য এ ত নয়—স্বপ্ন মানবজাতিতে আনিদন করে করতে হবে, নব মানবজাতির সঙ্গী করতে হবে—একটি সঙ্গী গোপ্লি নয়—আর অস্ত্রহীন করে নিতে হবে মানুষের অস্ত্রচেতনা শুণ্ড নয়, তার শ্রাণ-বৃত্তি সেহবৃত্তি। অর্থাৎ আনাদের সেনে আসতে হবে নিম্নতর চেতনা নথো—সেখানে পরিগৃহীত কাজ করতে হবে, উচ্চতর চেতনা তার নথো নানিয়ে তাকে উন্নীত, তাকে উচ্চের আধার করে তুলতে হবে। সে কাজ আজো আনরা করে চলেছি—পতন-অভ্যাস-বন্ধুর পায় ভিতর দিয়ে।

আনরা যে কতখানি অস্ত্র-অস্ত্রবানী হয়ে পড়েছিলেন তার একটা উদাহরণ সেই আনার নিষেদ অভিজ্ঞতার।

এ সময়ে আমি একদিন কি কারণে আশ্রয় ছেড়ে তার আবহাওয়ার বাহিরে এসেছি—অর্থাৎ এখানকার বসতির ও বাজারের নথ্য দিয়ে চলেছি। অসুস্থ নমো হল—মাটিতে যেন হাঁটছি না, পায়ে ভর নাই, বোধ হল হাওয়ায় হাওয়ায় খপাখপায়ে নত, কুয়াগার ভিতর দিয়ে চলেছি—সেখানে কিছু দূর গির পথ নাই—ভয়তর অস্থি হতে লাগল—জলের বাছ ডাঙ্গার পড়লে যে বকন সেই অবস্থা—যথাসম্ভব ত্রস্ত পায়ে আশ্রয়ের ভিতরে এসে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচনান যেন।

এ যুগ অনেক পিছনে ফেলে এসেছি আনরা—তবে কার্যাত: বর্জনানে হর ত সে-যুগের ঠিক বিপরীত প্রায়ে এসে গিয়েছি—বাহিরের নথো ঝাপিয়ে পড়েছি, বাহিরের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছি—যে ঝোঁকটির সম্বন্ধে উপনিষদ্ একদিন শাসন-বাণী উচ্চারণ করেছিল—পর্যাক্রান্তি ব্যাভুগোৎ—আনাদের ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতই বহির্ভূখী হয়ে বিকসিত—এরও প্রয়োজন ছিল ও আছে—আনরা পৃথিবীর এক ষও হয়ে আছি—অভিণ ও সহযুক্ত হয়ে—সারা পৃথিবীর প্রতিমা, প্রতিভা বা প্রতিরূপ হয়ে—আনরা হয়েছি বিশ্বের কর্তৃত্বাণী ও কর্তৃত্বোণী (শ্রীনা ও শ্রীঅরবিন্দ এ নিরতি হতে নিষেদের রেহাই দেন নি—তবে সে কথা আনরা)। আনরা এখানে আনাদের নথো যে পরিবর্তন সাধন করতে পারব—পৃথিবীতে, সকল মানুষেরও নথো সেই পরিবর্তনের সূত্রপাত হবে। সূত্রাং আবার একান্ত বহির্ভূখী হয়ে নথ, যে দিকে

দোক বেনী হয়ে গিয়েছে বর্তমানে—আমি বলছি সববেত জীবনের কথা—অন্তর্ভূখী অধ্যাক্ষ-সাধনারও পথ পুনে রাখতে হবে—এ দুটি একাত্মের একত্ব সাধন করতে হবে—দুটির বিরোধ নর, যোগাই যোগ।

শ্রীমদ্রবিশ্ব মন্দির

(২)

চবিশ তারিখ বিকেল চারটে নাগাদ আমি আগ্রহে গিয়েছিলেন এবং ধ্যান করছিলাম বিজয় নাগের ঘরে (এখন যেখানে পৃথ্বীসিংহের অফিস)। মহান এক শক্তি নেনে আসতে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু আবার যেন হঠাৎ আমি বুদ্ধি খানখান হ'লে ভেঙে পড়লাম—উর্ধ্বতন সেই শক্তির চাপ আবার মাথার ওপর এমনই প্রবল আর আবার মাথার মধ্যে প্রতিরোধ এতই প্রচণ্ড। ক্রমে সেই শক্তিকে আমি গ্রহণ করতে পারলাম না, যদিও চেষ্টার ক্রটি করিনি।

পাঁচটা নাগাদ অন্তর ডাক পড়ল ওপরে এবং তিনি নেনে এলেন শ্রীমাদের অক্ষরী নির্দেশ নিয়ে শ্রীমদ্রবিশ্বের আশিস নেবার জন্যে সমস্ত ভক্তদের সমবেত হ'তে হবে ওপরের ব্যাঙ্গশালায়।

কথায় গোমস্তা আমি বারানসীর ঘরে গেলান এবং তাঁকে বললাম যে বহু-প্রতীক্ষিত 'জবতরং' নিশ্চয়ই আর সাধিত হয়েছে।

শ্রীমাদের হস্তার কথা সমস্ত ভক্তদেরই জানিয়ে দেওয়া হ'ল, এমনকি গেট-হাউসে বীরা ছিলেন, তাঁদেরও। কিন্তু অনেকেই তখন গিয়েছিলেন সবুজের ধারে সেভাবে, কেউ কেউ ছুটছেন বেলতে।

কাজেই লোক গেল তাঁদের ডেকে আসতে, এবং নিম্নোক্ত আধা সকলেই আগ্রহে সমবেত হবার পর, প্রায় সাড়ে ছটা নাগাদ, ওপরে গেলাম—

১। অনন্ত	৯। কিতীশ	১৭। পুরাণী
২। বিজয় নাগ	১০। সীমাবতী (বিসেস পুরাণী)	১৮। পূর্ণচোন্দন
৩। বারীন যোগ	১১। বনি	১৯। রাজাদর
৪। চন্দ্রাবেন	১২। নলিনী গুপ্ত	২০। রজনী পালিত
(বিসেস পূর্ণচোন্দন)	১৩। নবীবালা	২১। রামভাই
৫। চন্দ্রকান্ত	('জ'—জা: উপেন ব্যানার্জির দিদি)	২২। রতি পালিত
৬। চন্দ্রশেখর	১৪। পবিত্র	২৩। সত্যেন
৭। বজ্র	১৫। পূর্ণালাল	(বিদ্যোতপ্তপ্রসাদ)
৮। কানাই পাণ্ডুলি	১৬। পূর্ণজ্ঞান	২৪। জা: উপেন ব্যানার্জি

রাখের পরমাটার কাছেই, সেখানে স্থলচ্ছিন্ন কোনো সেতবের এক পর্দা, সোানি লেগ দিয়ে তাতে কয়েকটা টানে ভ্রাগন ঝাকা । ঝাকা কাঠের যে চেয়ারগুলোয় ব'লে আনন্ডা ধ্যান করতান, সেগুলো সব সবিরে নেখের ওপর মাদুর পাডা হলেচে ।

অখণ্ড নীরবতা সেখানে । গোটা ব্যাঙ্গাশা ভ'রে উঠেছে আধ্যাত্মিক আলোয় এবং আনন্ডা কেনব অন্যগালেই ডুবে গোনান এক ধ্যানের গভীরে, শ্রীঅরবিন্দ কখন আসবেন, সেই প্রতীক্ষায় ।

সাতটা বাজবার কয়েক মিনিটে পরেই পর্দার পেছনদিকের পরজাটা খুলে দেখা গিলেন শ্রীমা আর শ্রীঅরবিন্দ—শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মচিনবর ভক্তিমায়, আর শ্রীমা তাঁর স্বাভাবিক রাজীক্ৰপে । শ্রীঅরবিন্দের পরণে ছিল বেশবের খুতি আর চাদর, শ্রীমার পরণে বেশবের শাড়ি । শ্রীঅরবিন্দ এসে অভাসনভোে বসলেন তাঁর নিচু পদিওলা চেয়ারাতায়, আর বা বসলেন শ্রীঅরবিন্দের পা রাখবার পিড়িতে ; পিড়িটা সেদিন মামানা বা দিকে সরানো ।

একাত্তর মচিনবর, ব্রহ্মদান, সর্বজ্ঞ, সর্বক্ষম, সত্ৰাটের বভোে লাগছিল শ্রীঅরবিন্দকে, যেন সবস্ত বিশেষুই অধাপুন ত্রিনি, সিংহ-বিক্রম মুখনওল, উদার অবাধ মূষ্টি, বেন কোন মদুর থেকে ডাকিরে আছেন, নিগাসক, অখচ সবস্ত বিশেষুই ব্যরক ; সর্বপজ্জিমান, অখচ কল্পণা ও যেহে ভাবর, পরম সেই সেবতা, স্বরাট, সম্পূর্ণক্ৰপে নিজেহে মিনি আয়ত্ত করেছেন আর, আপাদমস্তক, সেহেব সবস্ত অংশে, সবস্ত অণুতে প্রভিষ্টা করেছেন আপন আনন্ড আর আলো, তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে আলো, প্রেম, আনন্ড ঝ'রে পড়ছে সবস্ত গঠিতে ।

শ্রীমা—মুচিনবরী প্রেম, কল্পণা, নির্বনতা, সৌন্দর্য, ভক্তপা, বনতা, চন্দ্র । রাজ-রাজেশ্বরীর বভোে বনে হ'ল তাঁকে । এই পাবিব স্কট্রি প্রতি করুণায় ডকা তাঁর উচ্ছন্ন মূষ্টি নরন, বিশেষুই জননী ত্রিনি, শ্রীঅরবিন্দের শক্তি ।

বিশেষ ভাংপর্ধপূর্ণ এই দিন কারণ বিবর্তনের অধিষ্টাতা পরম আনন্ডময় শ্রীকৃষ্ণ এই দিনে নেনে অলেন শরীর-চেতনায় । এই দিনে পরম দেবহকে ধারণ করলেন শ্রীঅরবিন্দ ।

শ্রীমায়ের মাথার কয়েক ইঞ্চি ওপরে শ্রীঅরবিন্দ রাখলেন তাঁর বাম কর আর ডান হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন সববোত ভক্তদের ঝাঁরা তাঁকে ও শ্রীমাকে এসে প্রণাম করলেন একে একে । কেউ কেউ একাধিক বারও প্রণাম করলেন ।

কেউ একটি কথা বলল না, শব্দটি করল না । শ্রীমা বা শ্রীঅরবিন্দও কিছু বললেন না । গভীর ত্তক্তা, শান্তি, আনন্ডে সবস্ত পরিবেশ পূর্ণ । অখণ্ড নীরবতার বভোে সম্পন্ন হ'ল এই অনুষ্ঠান । আধ-বনটাকেনক বাবে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা চ'লে গেলেন ।

কিছু পরেই মস্ত্রা এসে প্রেরণাবীণ কঠে বসলেন, “বুড়া, জগা, রোগ, আহাৰ, নিজা প্রভৃতি সবকিছুই ছর করেছেন গুরুদেব ।” কেউ বেন বর প'ড়ে আনন্ডের তন্ময় ক'রে দিল । বেশ কিছুক্ষণ আনন্ডা ব'লে বইলান, অনড়, অচল । বনে হল আনন্ডা বেন স্বর্ণ-রাজ্যে পৌঁছেছি এসে । তারপর, একে একে আনন্ডা নেনে এলান ।

আমি ব্যরীনস'র কাছে গিয়ে বললাম যে শ্রীনার সঙ্গে একবার দেখা করা আমার বিশেষ দরকার, কারণ শক্তির চাপ অত্যন্ত বেশি ঠেকছিল আমার কাছে, আমার সহ্যের অতীত।

সাত ন'টা নাগাদ শ্রীনা আমার দেখা দিলেন। তাঁকে প্রণাম ক'রে আমি খুলে বললাম আমার অহুবিধার কথা। তিনি আমার ভরসা দিলেন যে সব ঠিক হ'য়ে যাবে, আর আশীর্বাদ করলেন।

গুরুপয় রোজকার নতো শ্রীনা 'হুপু' বিভরণ করলেন।

এর ঠিক দু'দিন বাদে, ১৯২৬ সালের ২৬শে নভেম্বরে, শ্রীঅরবিন্দ গুরু করলেন তাঁর একান্ত বাস।

(দুই ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ জৈনক সাংক্কেয় ডায়েরী থেকে অনূদিত)

স্মৃতির পাতা

আমার গান গাওয়া

ক্রীতদাসীকান্ত ভট্ট

আজ কিছু বিতৃষ্ণ হাস্যরস পরিবেশন করব—কালিদাসের মত আমি আজ “চাপলার প্রণোদিতঃ”, চপলতার অনুপ্রাণিত। তবে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করি যথাসম্ভব গুরুগম্ভীর ভাবেই। ই।, আমার গান গাওয়া—

ঝোড়ার ইচ্ছা পোড়ে ছোট
বোবার ইচ্ছা কথা ফোট,
ইচ্ছা বটে, ইচ্ছা বটে—

কে বেন ছড়া কেটেছিল? বড়িন? আমারও ওই দশা। ছেনেনেনা থেকে সখ গান গাইবার। আমার পিতৃসেব সদাসর্বদাই গুনগুন করে চলতেন মিসতেন—দূর থেকে তাঁর গুনগুনানি শুনে বাসার সবাই টের পেত কর্তা আসছেন। আমারও তাই হবে, ওটা উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত পুষ্টি। তবে বনে রাখা উচিত পুষ্টিটা সর্বগ্রাসী প্রকরের কিছু ছিল না—অর্থাৎ সব ভেঙেছুড়ে ওই একটিতেই মত্ত হয়ে যাওয়া বা নুখা করে তোলা। প্রথমত গানের চেয়ে খেলার দিকেও বেশি ছাড়া কম ঝোঁক ছিল না, প্রধানতঃ ফুটবল। পড়াশুনাটার ছিল দ্বিতীয় স্থান। তারপর সম্ভব ও সম্ভাবনার কথা—আমাদের যুগে এবং যে বিশিষ্ট সমাজে ও পারিবারিক আবহাওয়ার আনন্ড নানিত-পানিত-বধিত হয়েছি তাতে ও-বস্তুটি ছিল taboo, ‘প্রবেশ নিষেধ’। গান—আর নাচের ত কথাই নাই—বখাটে ছেনেনের জনো, যাদের জীবনে কোন উন্মুক্তির কোন সাক্ষ্যের—সাংসারিক হিসাবে—কিছু আশা-ভরসা নাই, তারাই ওদিকে যায়—খিয়েচায়ে, ব্যাটার। ওটি উচ্ছ্বসে যাওয়ার পথ ও পরিচয়। দু’একখানা ভ্রমবশে লাগাবটা যদি কিছু শিখিন হত, তবে বলা হত ওরা বেঙ্গলানী, বুটানী। আমার এক মাসি ছিলেন, তিনি ওই হিসাবে ‘আলোকিত’ বলে পত্রি-চিত্ত হয়েছিলেন; গাহিডাচর্চা করতেন (একখানা কবিতাপুস্তকও নিখে ছাপিয়েছিলেন), সভাসমিতিতে বোগ দিতেন। তাই তিনি আমার পিতাপিতৃব্যের কাছে ‘ব্রাহ্মিকা’ নাম পেয়েছিলেন। তবে আমার না দেখাপড়া জানতেন, খুলে পড়েছিলেন এবং প্রাইজ পর্বন্ত পেয়েছিলেন। আমার মায়ের বাবা একজন শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং কিছু আধুনিকপন্থী। তাঁর মেয়েদের দেখাপড়া শিখিয়েছিলেন খুলে পাঠিয়ে এবং নিজেও গোড়া হিশু থেকেও

ব্রাহ্মসমাজে এবং নগরে আনাগোনা করতেন ঢাকা সহরে। বদা বাহলা, তাতে বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসবের কোন কমতি হয় নি। দাদামহাশয়ের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর হাতের লেখা, কি হুল্লর বড় বড় গোটা গোটা লেখা তাঁর, যেন ছাপার হরফ, কি তার চেয়েও সুশ্রী। চোখের সামনে ভাসতে এখনো তাঁর হাতের লেখা পোষ্টকার্ডের চিঠি। এই নানীর বাড়ী আমি বহুবার গিয়েছি, তাঁদের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। আমার কিন্তু ভাদই লাগত তাঁদের সঙ্গে, স্নেহস্বভাবীয় হয়ে ও কিছু মনে হয় নি। একটা পার্থক্য দেখতাম। তখনকার দিনে, এখনো বোধ হয়, সাধারণতঃ বধ্যবস্ত্র হিন্দুপরিবারে জীবনধারা ভেদে গোছানো আঁটসাঁট ছিল না, কেমন অনিয়ম ও হেলাফেলার শ্রোত। নানীর ওখানে দেখেছি ঘোড়ার উপর সব বেশ ফিটফিট ছিনছান। তখনকার সাধার্না গৃহস্থনোক্তের ভয় ছিল 'সাহেবিয়ানা' (শ্রীঅরবিন্দও এরই মধ্যে বুঝানীকে সাবধান থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন, নাম দিয়েছিলেন "নুতন সভ্যবর্গ")।

তাই বলছিলেন গানচাঁদ হল গোলায় স্বাধার পরিচয়, ভদ্রসমাজের ও-বৃষ্টি ও প্রবৃষ্টি নয়। গান বলতে একবার অনুমোদিত ছিল সংকীর্তন, হরি-সংকীর্তন অর্থাৎ হরির সুরের গান

হরি বোল হরি বোল পাতিপুর ভুবুভুবু

নসে ভেসে যায়—

এই গানই শিখেছি, গেয়েছি অর্থাৎ চীৎকার করেছি, মনে ভীড়ে গিয়ে।

একবার, বয়স আমার ১০।১২ হবে, একজনের মূর্বে—পরিচিতদের মধ্যেই একজন —একটা গান শুনে, গানটা শিখে নিতে খুব ইচ্ছা হল। শেখানো শুরু হল, গোড়াতেই তিনি বললেন এটা হল চিনে একতান। বাড়বিকই আমার শেখা এমন চিনে গতিতে চলল যে একতানা ছেড়ে আর দোতলায় উঠতে পারলাম না। ওইখানেই ছেড়ে দিতে হল। গানটা কি জান? যত্নসূর মনে পড়ে, প্রথম কণিটি হবে

বিপদ-বারণ তুমি নারায়ণ

লোক বলে তোমার কল্পানিধান...

তারপর কলকাতায় যখন এলাম, বাড়ীর কাছেই লক্ষ্য করলাম একটা গানের স্কুল আছে। বিকেলের দিকে ছেলেরা অঝোত হত। ভরানক লোভ হল স্কুলটার ভর্তি হয়ে বাই। কিন্তু অজানা-অচেনাদের বাধাবনে গিয়ে পড়ল, ইতস্ততঃ কিছু হল। ধরা পড়বারও আশঙ্কা ছিল আমি এই দুর্ভাগ্য করি। যদিও আমার অভিভাবক যিনি ছিলেন আমার দূর সম্পর্কের কাকা, তিনি বেশ উপায় প্রকৃতির ছিলেন। তিনি এক-এ পড়তেন। আমি বড় থিয়েটারে যেতাম না, পড়াশুনা নিয়েই থাকতাম। কলিকাতার প্রথম প্রথম খেলাধুলারও স্বযোগ

সুবিধা করে গিয়ে পানি নাট। তাই আমার অভিভাবক একদিন বললেন, “তুই বিকেলের দিকে বেড়াতে যাস না? যা না, গিয়েটার দেখে যায়, ‘টারে’ ‘চত্রেপের’ আছে।” তাঁর ডয় হয়েছিল আনি ধরকুনো হয়ে পড়ছি, অস্থির বিহুখে পড়ব। আনি যত্ন বয়েসে কলকাতার চলে এসেছি, আমার খেলার সঙ্গীসাবীরা, আমার নীচে পড়ত তারা, বেশির ভাগ হয়ে গিয়েছে ছুনেই, আনাকে তাই নিঃসঙ্গী থাকতে হয়েছিল বহুর খানেক অন্ততঃ।

একবার চেষ্টা করেছিলাম ফুটবল খেলবার। আনাদের কলেজের (প্রেসিডেন্সী) গ্রাউণ্ড হল গড়ের রাঠে, সেখানে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, আর সেখানে পাঠা পাৰই যা কেন। তবে একটা জায়গা ছিল সুবিধামত। আনাদের কলেজ আর হেয়ার স্কুল একই কম্পাউন্ডের মধ্যে, মাঝখানে একটু ফাঁকা জায়গা ছিল, সেখানে হেয়ার স্কুলের ছেলেরা ফুটবল খেলত। একজন পরিচিতির সহারে ওখানে প্রবেশ লাভ করলাম। কিন্তু প্রধান আলমেন্ট স্কুলের ক্যাপ্টেন আনাকে বলে বসল, “খোকা, তুনি ওই সাইডে যাও।” আনি ত অথাক। স্কুলের ছেলে কলেজের ছেলেকে বলে কি না খোকা। আনি বনে বনে হেসেই খুন। তারপর ওদের খেলার ধরণ আমার একদম পছন্দ হল না। এখানে তবে বলি একটু ফুটবল তব্ব স্বাধাং এখন পেয়ে গেলাম। আর তোনাদের দু’একজন জানতেও চেয়েছিল আমার ফুটবল-জগতের অভিজ্ঞতা কিছু।

হেয়ার স্কুলের ছেলের খেলার রাঠটা ছোট বলেই ওদের খেলার ধরণটাও তদনুসঙ্গ হয়েছিল। আমার অভ্যস্ত চিন্তান বৃহৎ রাঠে, নিয়ম অনুসারে বত বড় হতে পারে তাঁর চেয়ে পূঁচার গজ বড়। খেলার জায়গার ত অভাব ছিল না। কাঁকেই আরবা অভ্যস্ত ছিলাম লম্বা পৌড়ে, লম্বা লম্বা পা ফেলে, টেনে খেলা থাকে বলে, যতদূর পারা যায় বলটাকে সর্বদা এগিয়ে দেওয়া। নৌকার লম্বা টানে ধাঁড় ফেলে চলা যেন। কিন্তু কলকাতার সেখানার অন্ততঃ এই ছেলেরদের দলে, বল নিয়ে আনাদের “বোনা” ক্যাপ্টেন থাকে নাম দিয়েছে ‘বুচু-বুচু’ করা, অর্থাৎ একই জায়গার ঘুরপাক করা, কায়দা কারসামি দেখান, বলটাকে চালিয়ে না দিয়ে আটকে রাখা। আনাদের রীতি ছিল ছড়িয়ে থাকা, সবত রাঠটা জুড়ে বেন খেলা হয়, একই জায়গায়, যেখানে বল সেখানে অবিকার খেলোয়াড় যেন অন্যায়ত না হয়। সুতরাং বিতীয় রীতি চল বলটা বত কম দিকের পায়ে রাখা যায়, সর্বদা চেষ্টা পাওয়া মাত্র চালিয়ে দেওয়া আর এক জনের কাছে—কাছে হোক আর দূরে হোক। বল বত বেশি পায়ে ধরে রাখবে, বিপকের ভত সুবিধা হবে তোনাকে tackle করতে। লম্বা পা ফেলে খেলবার ওতাদ ছিল সাবাদ; তাঁর খেলা দেখেছি, তাঁর সঙ্গেও খেলেছি। আর ছিল বিষয় ভাদুড়ী, ভাদুড়ী প্রাদার্ষের, তাঁর সঙ্গেও খেলেছি। শুনেছি অভিনায়ে খেলাও ছিল এই ধরণের। এদের খেলার ধরণ ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন, স্বস্তির অনিশ্চিত, neat, steady। তবে ভাদুড়ী ভাদুড়ীর আর একজন শিব ভাদুড়ী, তাঁর কিন্তু ছিল অন্য ধরণের খেলাটি। সে বতক্ষণ পারত বলটি পায়ে রাখত, শেষ মুহুর্তে, প্রায় বিপকের গোলের মুখে

গিয়ে তবে ছাড়ত আর একজনের কাছে নয়ত গানের মধ্যে । সে ছিল এক অকৃত্রিম মানুষ, ভীড়ের মধ্যে থেকে, বাহু ভেল করে যে কি করে পাশ কাটিয়ে, ঘুরে ফিরে, গিচ্ছনে পড়ে বাইরে চলে আসত, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার, কিন্তু তা অননুক্রমীয় । ইংরেজদের কুট-বল-নীতি আরো জানি, তা হল team work অথবা clock work. বিশেষতঃ বিনি-টারী টিনদের । নোটিমুটি ইউরোপীয়দের এই ধারা । ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বা স্বৈচ্ছাগতি অর্থাৎ নিজস্ব কেরদানী বা স্বাধীনতা তারা স্বাভাবিক বর্জন করে অপরের সঙ্গে নিম্নেবিশে চলাবার জন্য । এটা জাতিগত বৈশিষ্ট্য দেখায় । তাছাড়া তখনকার দিনে ভারতীয়েরা সব খেলত খালি পায়ে, এগার মোড়া বুটের বিরুদ্ধে ; কিন্তু তাদের এমন চাতুর্য, পারের চাতুর্য, যে বুঝ কনই হুতোর আঘাত লেগে আহত হত । বনে হর খালি পায়ে পারের আত্মসংরক্ষণ স্বাধীনতা ও স্বচ্ছন্দতা পার তাতে সহজ চাতুর্য ফুটে ওঠে । ক্রিকেটে বোলারের প্রত্যেকটি আত্মসংরক্ষণ নাত করে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য । ফুটবলে খালি পায়ে পারের প্রতিটি আত্মসংরক্ষণ স্বাধীনতা নাত না করলেও কতকাংশে তা পার, এতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সৌভ-বেদ্যে যায় । কিন্তু ছাত্রের ব্যক্তিগত চাতুর্য হেরে যায় মোটবীধা আক্রমণের কাছে ।

বাহ্যিক, কি বলতে গিয়ে কি বলা শুরু করেছি । গানের কথায় ফিরে আসা যাক । কনকাতায় বছরপানেক থাকতে থাকতেই ঘটল এমন জিনিস যাতে ফুটবলের চিন্তা ভেসে গেল, এমন কি পড়াশুনার চিন্তাও সর্বসর্বা রইল না । তবে গানের দরগুন সেটা হয়ে পড়ল বটে । নদীতে বর্ষার নতুন জলের নত ফুলে ফেঁপে ফুঁসে চলল সে বস্তু, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের কণ্ঠ ও স্নান তারসরে বলে উঠল

এ বোবন-জনতরঙ্গ রোধিবে কে,

হরে নুয়ারে হরে নুয়ারে

তখন ত কণ্ঠের আর অর্গল নাই, শ্রাণের নল্লজাসর নাই, চক্ষুর পর্বা নাই । তখন নাথ, রাধা স্বামীনা ভেল...

গান অর্থ চীৎকার । বাইবেলে আছে না সববেত চীৎকারের চোটে কোন সহরের বেয়ান সব স্বপ্নে পড়ল, আনন্দেরও স্বোধর্য সেই স্বপ্নে বিশ্বাস ছিল যে চৌচানোয় চোটে বৃষ্টিপাতা পালিয়ে যাবে । সে যাহোক, গানের পাঠটা বুঝ সহজ হয়ে গেল, singing without tears ; অর্থাৎ: গলাসাধা বুঝ হল, যদিও কিছু unscientific ভাবে ।

কিন্তু হাসির কথা ছাড়া, একটা বেশ পরিবর্তন এল যখন চুকলান জেনে । বসেছি আগে 'সেনে' আবার সঙ্গী হল শটান (উপেনন্দা'র সঙ্গে), শটান সেনগুপ্ত, এবং সে বেশ প্রাইত, গুস্তান নয়, তবে স্নকঠ । 'আমিও তার সঙ্গে গলা বিলাতে চেষ্টা করলাম । জনে দেখলাম গদার এসেছে একটা ভাবের রেশ, দরদের আবেশ ; ছন্দ বল, ভাল বল, জেন বল, সে-সবের ভোয়াক নাই ; স্বর সাধামাঠা কিন্তু তাতে ভর করেছে আর একটা বস্তু—দুরীয়া । জেনে অধিবাস অন্তরে চেতনার নিশ্চরই একটা পরিবর্তন এসেছিল, এনেছিল দরত একটা

গাঢ়তা গভীরতা। শরীরে ও তার ছায়াপাত নিশ্চয় হয়েছিল। বলব একটা নজার কথা? সরন হচ্ছে কিছু। শ্রীযুগবিল নতুন করেছিলেন একবার, আমার কৃপার সম্বন্ধে আনোচনা প্রসঙ্গে, যে তিনি শুধু একটিবার লক্ষ্য করেছিলেন মনিনীর chubby cheeks হুটপুট নুখ—সে হন জেলের মধ্যে। বুঝতে পার জেলের 'লক্ষী' বেয়ে কি রকম স্বয়ং হয়ে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। আশ্চর্য নয়, অস্তরের একটা নিবিড় স্বভাব বাহিরেও, গায়ের ও নুখে শুধু নয়, কঠেও এসে নিশ্চয় পরিচালন করেছিল।

ফলত গাইবার প্রেরণা এবং কিছুটা সাধনা হল জেলের গান, যেমন নিব্বার প্রেরণা ও ক্ষমতাটা অর্জন করেছি জেলের মধ্যে থেকেই। জেল থেকে বের হয়ে গান গাইবার ইচ্ছা ও সাহস পাই। কিন্তু গেয়েছি শুধু ভাইবোনদের কাছে, পুঁচারজন সববয়স্কদের কাছে যারা সহজ সবধরার। এই সবরটা আমার একটা বিশেষ অনুভূতি বা উপলব্ধি হত সেখেনি। বুকের মধ্যে, স্বপ্নে শুভ্রতায় গান ও বাজনা—কি অতুলনীয় অনির্বচনীয় বনো-হারী নাধুর্ন তার; আমি নিজেও গেয়েছি সেখানে, কি হৃদয়ের গলা, শুনে নিজেই মোহিত হয়েছি। গাছবলোকের সে-অভিজ্ঞতা অনুপম।

তারপর যখন এলাহ এখানে তখন প্রবৃত্তিটা তিনিত হয়ে এল ক্রমে, আর বোড়টাও কিছু বুঝে গেল। অর্থাৎ অভ্যাস করতাম ফরাসী গান। আমার এক বালকবন্ধু ছিল (বুট্রিয়ান পরিবারের, Cercle Sportif আমাদের খেলাধুলার গোষ্ঠির সম্পর্কে), তার কাছে শিখেছি অনেকগুলি ফরাসী গান। Allons enfants থেকে Le regiment de Sambre et Meuse দিয়ে একেবারে Quand Madelon অবধি। বাংলার গাইতান নথির নেতৃত্বে খেলার মাঠে, পিকনিক পার্টিতে সববেতকঠে আকাশভেলী হয়ে ও হয়ে

হানারা সোনেকি হিশুয়ান...

ভোবরা এখন নুহ অর্থ Benjamin-এর তপুস্বীর্ণ কঠে হয়ত শুনেছ তার সেই পুরাতন স্মৃতির বেশ কিছু। Grand Etang অর্থাৎ লেক-এ, ভিন্নিগানুরে কতবার গিয়েছি দল বেঁধে হেঁটে মাঠ করে। তাল-তালে পা কেনে গেয়ে চলেছি

Aux petits pas, aux petits pas

Nous irons là-bas.

এবার ভোবরা জিজ্ঞাসা করতে পার এখনো আমি গান করি কি না। তা করি বৈ কি গুণগুণ করে, তবে অনিন্দবরণ কি রাজস্বয়ের পর্ব্বারে আনাকে তুলে ধরে না, অভ্যুত এখনো উঠি নি। এই সেদিনও ত গাইলাম, আমার শ্রোতা হল অস্ত, হাঁ করে আমার বুকের দিকে তাকিয়ে রইল যখন গাইলাম

En revenant des nocces.....

সেই সবরটার একদিন একটা নজার খেলা আমার আবিষ্কার করলাম। গেট হাউসে,

টেবিলের চারদিকে বসেছি শ্রীঅরবিন্দকে ঘিরে, রাত হবে। প্রস্তাব উঠল সবাইকে গাইতে হবে, এক এক টুকরো করে, যে যা পারে, টু টু হলেও। শ্রীঅরবিন্দকেও ধরে পড়লাম। কিন্তু তিনি ত ধরা দেবার মত মানুষ নন। ও-পাঠটি থেকে বিধাতা তাঁকে বঞ্চিত করেছেন একেবারে, হুতরাং একান্ত অক্ষম। তিনি ম্লর করে বেদপাঠ গীতাপাঠ, বলা বাহুল্য কবিতাপাঠও বিভিন্নভাষায় করেছেন; কিন্তু সঙ্গীত নহি নহি। তাঁর লেখার কোথাও ঐচ্ছিক কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। অব্যত তখন এসে উপস্থিত হয় নি—তার ভাগ্য জান বলতে হবে, নতুবা তার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য হত। আনিও গাইলাম একটা, এক লাইন স্বদেশী গান একটি হবে। শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশী গান পছন্দ করতেন। যদি ছিল আনন্দের মধ্যে ওহাৎ, সে নিশ্চয় পেয়েছিল পুরো একটি গান। সর্বশেষে সৌরীন ভায়া তাঁর থাকে বলে রাসভূগিন্ধিত কঠে শেষ করলেন এই কলি দিয়ে

দেখো সখা ভুল করে ভালবেসো না বেসো না

এখন তবে শেষ করি একটা কৌতুককর কাহিনী অর্থাৎ ব্যঙ্গ্য ঘটনা দিয়ে। জেল থেকে বের হবার অব্যবহিত পরেই কাসিরাঙে এসেছি, ঘনপ কাগণ, আবার মানী-পরি-বারের সঙ্গে, যে-মানীর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। একদিন বিকেলের দিকে একা একা বেড়াতে বের হলাম, বড় সড়কটা ধরে কিছু নেমে গেলাম সহরের একটু বাহিরে। বেশ নির্জন নিরিবিবি চায়না, তৃশর পরিবেশ, ছিমানয়ের গা কেটে রাস্তা চলেছে একে বেকে; এক দিকে উঠে গিয়েছে অঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের গা, অন্য দিকে নেমে গিয়েছে গভীর খাঁদ। একটা ছায়ণা বেছে নিলাম রাস্তার একপাশে বাঁদের বাবে একটু উঁচু বাঁধ আছে তাঁর উপরে। সব নিস্তরু—বন-ভঙ্গলের স্তম্ভতা এক অপক্লপ ভিনিল, গাঢ় ঘন নীরবে আর অসীম। চুপ করে বসেছি, যাতে যান্ত্রে গানে পেল, ক্রমে উচ্চকণ্ঠে, লোকজন ত নেই, নিরঙ্কুশ গাইলাম

তুমি নির্বল-কর মঙ্গল-করে মনিনমর মুছারে

চললাম গেয়ে,

আছ অনল-অনিলে চির নভোনীলে

ভূমরে সলিলে গহনে

কিন্তু হঠাৎ পরের কলিটি বেনন ধরতে যাব অননি আমার মুখ থেকে কথা বেন কেড়ে নিয়ে এক ভঙ্গনীয়কণ্ঠ গেয়ে উঠল

আছ বিটপীলতার অলসের পায়

শনী তারকার উপরে

শাট, পরিষ্কার, হৃকণ্ঠ, আকাশ যাতন পুলিরে দিয়ে।

আনি ত ব্রহ্ম ভক্তিও। বাঁড়িরে উঠলাম, এদিকে ওদিকে তাকানো, কেউ কোথাও

দৃষ্টিগোচর হল না। বামা! নতুন! নথ্য লখা পা চালিয়ে চললো বামার দিকে। আর একবার পাশে তাকিয়ে সেরলো। বোধ হল যেন একখানা বাড়ী নুকিয়ে যাতে গাড়িপালার মধ্যে, সেখান থেকেই এল কি কঠ? ধরা পড়ে গেলো। কি লজ্জা। ছুটে বাড়ীর মধ্যে এসে পালিয়ে যেন পাঁচলো।

অনুরূপ একটি কৌতুকেন ঘটনা হয়েছিল আরো একবার, অনেক পরে dramatic বটে কিন্তু হয়ত অত্যাশ্চর্য romantic নয়। পত্রিচেরী থেকে প্রথমবার ফিরেছি চার বৎসর পরে, নবি আর নবি। কলকাতায় হেদুয়ার ধারে এক বেসে আছি কি বেড়াতে এসেছি। পত্রিচেরী থেকে এসেছি, ফরাসী ভাষা শিখেছি, কামেই তার নমুনা প্রদর্শন করতে হল। নবি গাইতে শুরু করল ফরাসী জাতীয় সংগীত,

Allons enfants de la patrie

গোলে চলো, চঠাং গানের refrain-টা বেয়েলী কন্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল কোথা থেকে,

Aux armes, citoyens...

ব্যাপার কি? হাতার দিকে তালো। জানাল দিয়ে বেরলো অপর পারে একখানা বড় বাড়ী, বেয়েলের হোটেল। সেখান থেকে নিশ্চয় ফরাসী কনভেনশনে পড়া কোন বেয়ে আনাদের বুঝে ধরে গেয়ে উঠেছিল। আনাদের নত তাদেরও শ্রুতি সেবারার জন্যে।

...এশিয়াতেই এর চেয়ে বিপজ্জনক এক অবস্থা দেখা দিয়েছে, বিশ্বের এই প্রান্তে এক মহাদেশিক ঐক্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে নব-উদ্ভিত কম্যুনিস্ট চীন। এর অর্থ রুশ ও চীন এই দুই প্রান্তে কম্যুনিস্ট শক্তির মিতালীতে একটা বিরাট বলের সৃষ্টি যা অনায়াসে গোটা উত্তর এশিয়া গ্রাস করতে পারে, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও তিব্বত পর্যন্তও উৎসাহ করতে উদ্বৃত্ত হতে পারে এক, এমন কি, ভারত-সীমানার গায়ে এসে পৌঁছাতে পারে, একটা বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনায় ভারতের এক পশ্চিম এশিয়ার নিরাপত্তা তখন বিপন্ন হয়ে উঠবে...

এপ্রিল, ১৯৫০

শ্রীঅরবিন্দ

যোগসম্বন্ধ-প্রসঙ্গ

অনির্বাণ

[তৃতীয় পাঠ—ভক্তিযোগ]

১

যোগত্রয় ও ভক্তি

তিনটি যোগের কথা আমরা জানি—কর্মযোগ জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগ। আমাদের চৈতন্যের অন্যান্য সমস্ত তিনটি বৃত্তি—সঙ্কল্প ভাবনা আর বেদনা (feeling), যথাক্রমে ত্রাণাই হল ঐ তিনটি যোগের সাধন। সংকল্প ও কৃষ্টির বশে একেকটি যোগের উপর আমরা হোল ছিটে, কিন্তু বহুত তরা অন্যান্যাবিবোধী নয় কিংবা তাদের মাঝে যুগ্ম-যোগের প্রশ্নও নাই। তিনটি যোগের অন্যান্যসম্পদে সিদ্ধির পূর্ণতা। কর্মযোগ আর জ্ঞানযোগের কথা বলা হয়েছে, এইবার ভক্তিযোগের কথা।

*

*

*

সাধনার দিক দিয়ে দেখতে গেলে কর্ম জ্ঞান আর ভক্তির মাঝে স্বাভাবিক একটা গৌণ কর্ম আছে। সবারই জীবন শুরু হয় কর্ম দিয়ে। কর্মের খানেকা আছে; কিন্তু তাব'লে তাকে এড়ানো যায় না, এড়ানোর চেষ্টাই আন্তরিক স্বাস্থ্যের অনুকূলও নয়। অন্যসত্ত্ব হয়ে সনর্পণ বৃত্তিতে কর্ম করতে করতে চিত্ত শান্ত শুদ্ধ এবং প্রসন্ন হয়। সেই চিত্তে জ্ঞানের সঞ্চার হয়; আনন্ডা জানি নিম্নে, জানি অন্তর্ধানীকে, জানি বিশ্বকে। সর্বসমস্ত জ্ঞানের পরিপাকে চিত্ত নশিত হয়, রসায়িত হয়—জন্মে ভক্তি। জীবন তখন সহজ হয়, অশ্বও পরিপূর্ণতায় গভীর হয়। আমার কর্মে তখন তাঁরই সত্তাসম্পদের রূপায়ণ, আমার বোধে তাঁরই সম-জ্ঞাওয়া সম-বেদনো সম-জ্ঞাপানো চৈতন্যের দীপ্তি, আমার দ্বন্দ্বের তাঁর অকারণ অব্যবণ সহজাননের দিমোহ।

যেমন কর্ম দিয়ে, তেমনই আবার জ্ঞান দিয়েও সাধনা শুরু করা যায়। বিশেষু তিনি প্রকাশ হয়েছেন বিচিত্ররূপে। এই বৈচিত্র্যের মাঝে একটি ঐক্যের সূত্র আবিষ্কার করে তাঁকে জানতে হবে। এই জানা যনের জানা নয়, বিজ্ঞানের জানা—বাইরে-ভিতরে ভেদ বুজিয়ে দিয়ে সখ-কিছুকে অন্তঃসত্তার রসিয়ে জানা। তখন জানা যানে হওয়া; সবাইকে ছাপিয়ে খেকেই সবার সঙ্গে এক হওয়া—জন্মে, সৌন্দর্যে, অবিরোধে। এই এক হওয়া

আনে শক্তির বোধ। জ্ঞানি, তিনি শুধু প্রজ্ঞা নয়, তিনি প্রাণও। তাঁর প্রজ্ঞা প্রাণে স্পন্দিত। সেই স্পন্দন তাঁর সম্বরণ, আবার কর্ব। এবনি করে প্রজ্ঞা উৎসারিত হয় সহজ ও স্বন্দর কর্বে। তাই স্বপ্নের আনন্দ। আর সেই আনন্দই যুগল সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে কোটে প্রেরণ হয়ে। সূর্যের প্রেরণ আনন্দে স্বরে পড়ে সূর্যযুগলীর 'পরে, সূর্যযুগলীর বধন আকৃতি উচ্ছলিত হয়ে ওঠে সূর্যের পানে। প্রজ্ঞা প্রাণ আর প্রেরণের ত্রিবেণীসঙ্গমে জীবন হয় পূণ্যাতীর্থ।

আবার কখনও কখনও সাধনার শুরু হয় প্রেরণ দিয়ে। আবার সমস্ত সত্যকে তিনি আকর্ষণ করেন আচরিতে। আবার হৃদয় উথলে ওঠে, আনি গোপীর নত বিবশ হয়ে কুল ছেড়ে অকুলে ঝাঁপ দিই। তাঁকে পাই তিনে-তিনে, পাই বনকে-বনকে, পাই সাগর-আগারের কুলছাপানো প্রাবনে। আর সে-পাওয়াও তো জানা। জানি সব দিয়ে, 'সর্বভাবেন', সবরসে রসায়িত হয়ে—শুধু তটের বৃত্তি দিয়ে নয়। আবার জ্ঞানি নিশানের নাখে ছড়িয়ে পড়ে নিশান হয়ে, আলো যেনন আকাশকে জানে তেননি করে—শুধু আনন্দের সঙ্গীর্ণ পন্থে তুলান তুলে নয়। হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে তাঁকে জানি বলেই নাড়ীতে-নাড়ীতে অনুভব করি তাঁর শক্তির স্রোত। তিনি সম্বরণ (will), আনি তাঁর সাধনা (Execution); তিনি অধ্যাক্ষ পুরুষ, আনি তাঁর সাক্ষী প্রকৃতি। প্রেরণের ভিতর দিয়েও আবার তেননি পৌঁছই প্রের প্রজ্ঞা আর প্রাণের ত্রিবেণী-সঙ্গমে।

*

*

*

জ্ঞান কর্ব আর ভক্তিতে কোনও বিরোধ নাই, এই ধারণাকে পাকা করে নিয়েই পূর্ণ-যোগীকে ভক্তির পথে অগ্রসর হতে হবে। এদেশে জ্ঞান আর ভক্তির নাখে প্রায়ই দেখি অহি-নাকুলের সম্পর্ক। জ্ঞানের উদ্বুদ্ধতার গর্বে জ্ঞানপরীয়া অনেক সময় ভক্তিপরীষের অবজ্ঞানিশ্রিত করুণার চোখে দেখেন, যেন যাত্রা বন্দবুদ্দি এবং নিশ্চাধিকারী। ভক্তির মাতনানি ভাবেরই অন্যো। অপরিভুক্ত পাত্রে ভক্তিময় সহজেই গেরে উঠতে পারে এবং ওঠেও—একথা সত্য। কিন্তু বহুদারিণ (dogmatism) সঙ্গীর্ণতা কি জ্ঞানপরীষের নাখেও নাই? বুদ্ধি কাছে হৃদয়কে খাটো করে পরিপূর্ণ পাওয়ার একটা দিকের প্রতি তাঁরা কি অন্ধ নয়? কাঁচা অবস্থায় সব সাধকের নাখেই কিছু-না-কিছু ন্যূনতা থাকে। কিন্তু শেষ পরিণাম না দেখে কোনও পন্থার প্রতি কটাক্ষ করা ভাব'লে সমস্ত হয় না।

জ্ঞানপরীষের গর্বে, তিনি অমৈতবাদী—ভক্তের মৈতবাদ অমৈতবাদের চাইতে খাটো। কিন্তু পরমার্থতত্ত্ব যেনন এক, তেননি আবার দুই ও বহু। উপাস্য-উপাসকের মৈতকে ধরেই ভক্ত পৌঁছন পরমবিনয়ের অমৈত, আবার সেই অমৈতের নাখেই তোলেন মৈতনীনীর তরঙ্গ। তবুও যা এক, নীলায় তা যুগল বা ব্যূহ—পরমার্থের এই তো স্বরূপ। একেজো এক আর দুয়ে বা বহুতে বিরোধের সৃষ্টি করা বস্তুত অজ্ঞান মানসেরই পরিচয়।

জ্ঞানের পথ সাধারণত বিচারের পথ, 'নেতি নেতি' করে সাক্ষিক্ত হেঁটে ফেলে এক বা শূন্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ। পথের শেষে জ্ঞানপরীষ যা পেলেন, তার তুলনার

যা-কিছু ছেড়ে এসেছেন তা তাঁর কাছে তুচ্ছ বলে হতে পারে। কিন্তু তুচ্ছতাবোধও তাঁর মনেরই মাত্র। জ্ঞানের পনিপাকে কোথাও তুচ্ছতাবোধ থাকে না, 'নেতি নেতি'র স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণ হয় 'সর্বং বহিঃ; ব্রহ্ম' এই অনুভবে। পরমার্থকে তখন আর দর্শনোপ-নির্দেশে সঙ্কণ-নির্দেশ বা স্কন্ধ-স্কন্ধে জাগ্রতাবি করতে পারি না। সেহি, তিনি স্কন্ধ অক্ষরও, আবার স্কন্ধকে ছাপিয়ে এবং অক্ষরকে রসিয়ে রসিয়ে পুরুষোত্তমও। জ্ঞান আর ভক্তি দুয়েরই চরম এই পুরুষোত্তমকে পাওয়ায়।

জ্ঞানপন্থী যেন ভক্তিপন্থীর উপর বিক্রম, তেমনি ভক্তিপন্থীও স্বচ্ছন্দে বলে বলেন, 'অভাগিয়ার কাক নড়ে জ্ঞান-নিষফলে।' এও এক পাট্টা হতুয়ারি। জ্ঞানের বিচার যদি দুরাগ্রহবশত কেবল অর্কের প্যাচ কসাকসি হয়, তাহলে জা যে নীরস এবং নিরর্থক তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্যোক্তির আকৃতিতে কে-জিজ্ঞাসার উদ্বিগ্ন তার তপণেও চিত্ত আশুত এবং স্বস্বাশ্রিত হয়। তাহাড়া বিচার বিবেক বৈরাগ্য এগুলি ভক্তিপন্থেরও গোড়ার সাধন; জ্ঞানের রাস চানবার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও অনবীকার্য। গীতাতোও অর্ন্ত এবং অক্ষরের সঙ্গে জিজ্ঞাসা ভক্তকে উপার বলে জানাী ভক্তকে বলা হয়েছে পুরুষোত্তমের আশ্রয়স্থল। 'আনি অতশত বুদ্ধি না, শুধু ভানবাদি'—ভক্তের এই উক্তি মোকোক্তি নাত্র, কেননা প্রাণ চেলে ভানবাসতে পারাটাই যে জ্ঞান দিয়ে বোঝা অতএব শুদ্ধবুদ্ধি দিয়ে বোঝা।

*

*

*

জ্ঞান ভক্তি আর কর্মে যে কোনও বিরোধ নাই, তা পূর্ণব্রহ্মের স্বরূপ থেকেও বোঝা যায়। ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ হল সং চিৎ আনন্দ এবং শক্তি। জ্ঞানযোগের আলোচনার সময় দেখেছি, এই ব্রহ্মকে যুগলক পুরুষ-প্রকৃতির যিদলরূপেও আনরা দেখতে পারি এবং সেই দেখাতেই ব্রহ্মোপলব্ধির পূর্ণতা। তখন ব্রহ্মের সত্তা এবং চিৎভাবে বলতে পারি তাঁর পুরুষত্ব এবং আনন্দ ও শক্তির উদ্বাসকে বলতে পারি তাঁর প্রকৃতি-স্বভাব। আনরা জ্ঞানযোগের দ্বারা বিশেষ করে অনুশ্রবণ করি ব্রহ্মের সত্তা বা তাঁর প্রপঞ্চোপলব্ধি এবং প্রপঞ্চাধিষ্ঠান প্রশান্তিকে, আবার ব্রহ্মের চিৎত্ব বা তাঁর শক্তিচৈতন্য এবং স্বর্গের প্রয়োজন তপঃশক্তিকে। ব্রহ্ম বিশেষ অতীত থেকেই বিশেষ অধিষ্ঠান প্রকাশক এবং প্রয়োজক—যেমন আকাশ আর সূর্যের মত। এই হল সকল জ্ঞানীরই ব্রহ্মোপলব্ধির স্বরূপ। ব্রহ্ম সত্তা আকাশের মত এবং চৈতন্য সূর্যের মত—তাঁর পুরুষত্বের এই উপমা। কিন্তু আকাশ আর সূর্য যেমন তাঁর স্বরূপের সত্তা, তেমনি ঐ উপমারই ক্ষেত্র চেনে বলা যায় পৃথিবীতে তাঁর স্বরূপের সত্তা। বৈদিক ঋষিদের ভাষায়, দ্বাযা-পৃথিবীর বিধানে ব্রহ্মের অর্ন্ত স্বরূপের পরিচয়। পৃথিবী হল স্বর্গ বা প্রপঞ্চের উপলক্ষণ। স্বর্গতে ব্রহ্মই নিম্নে উৎসারিত করেছেন—আনন্দে আর এই স্বর্গের নীলার তাঁর শক্তির প্রকাশ। শক্তির মূলে রয়েছে তাঁর কামনা বা সঙ্কল্প। আনরা ভক্তিযোগে উপলব্ধি করতে চাই তাঁর আনন্দকে এবং কর্মযোগে তাঁর শক্তি ও সঙ্কল্পকে। তাঁর সত্তা আর চৈতন্যের সঙ্গে এই আনন্দ আর শক্তির কোনও বিরোধ থাকতে পারে না।

আমাদের প্রাকৃতজীবিতে তাঁরই অগ্নি স্বরূপের অনুসৃতি : তাইতে দেখি, অত্যন্ত সচজভাবেই আমাদের অস্তিত্ব বিচ্ছুরিত হচ্ছে হৃদয়ে, ভোকুর্বে এবং কর্ণে। চারালি নাখে সেখানে অন্যান্যবিরোধ নাই, আছে সৌখ্য এবং গম্ভীর। তবে প্রাকৃতজীবিতে সীমার বেটানে আমাদের প্রবৃত্তি (functioning) কৃত্রিম, আর ব্রহ্মোপলব্ধির আগন্তো তারা অকৃত্রিম। কিন্তু এখানে-ওখানে কোথাও তাদের নাখে বিরোধ নাই। সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপোপলব্ধিই যদি অধ্যায়সাধনার লক্ষ্য হয়, তাহলে জ্ঞান ভক্তি কর্ণের নাখেও কোনও বিরোধ থাকতে পারে না।

২

ভক্তির প্রয়োজন

বহাওনেরা বলেন, ভক্তির লক্ষ্য হল ভগবানকে পাওয়া। তাঁকে পেলে আমাদের নাখে তাঁর আনন্দস্বভাবের স্ফুটি হয়। আনন্দ সম্বন্ধে বিনসিত হয়ে হয় প্রেম—আমরা স্বভাবের প্রেরণায় তাঁকে ভালবাসি। যেখানে স্বভাবের স্ফুটি, সেখানে হেতুর কোনও প্রশ্ন ওঠে না। ভালবাসা আমাদের স্বভাব বলেই তাঁকে আমরা ভালবাসি। সুতরাং শেষ-পর্যন্ত এই অহৈতুক প্রেমই আমাদের ভক্তির 'প্রয়োজন' বা প্রবর্তক (motive)।

কিন্তু অহৈতুক প্রেম হল শেষের কথা, যখন জীব তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখনকার কথা। তার আগে তাকে সাধনার যোগ্যতালি পাঠ হতে হয়, তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে নিই।

*

*

*

চেতনার উন্মেষের একটা পর্বে জীব যখন আত্মসচেতন হয়, তখনই সে মানুষ। আত্মসচেতনতার সঙ্গে-সঙ্গেই তার নাখে আগে বৃহত্তর চেতনা। যে-প্রকৃতি তার অনুভব এবং ব্যবহারের ক্ষেত্র, তাখেকে আলাদা করে নিজের নাখে নিজেকে সে যেমন অনুভব করে, তেমনই অনুভব করে প্রকৃতিকে ছাপিয়ে একটা বৃহত্তর শক্তিকে। সে সঙ্গীত, আর এই শক্তি অসীম; সে নিয়ন্ত্রা, আর এই শক্তি তার নিয়ন্ত্রা। এই শক্তির প্রতি তার যে নির্ভরের ভাব এবং তার ফলে, তার সঙ্গে যোগ স্থাপন করবার জন্য তার নাখে আগে যে উপাসনার প্রবৃত্তি, তাইতেই মানুষের অধ্যায়বোধের শুরু। এই বোধের আদির পরিচয় ভক্তিতে, কেননা প্রপত্তি বা নির্ভরতাই হল ভক্তির প্রাণ।

বৃহত্তর প্রতি নির্ভরতার প্রথম প্রেরণা যোগায় মানুষের কাবনা এবং ভয়। জীবনের বা অনুকূল তা চাই, বা প্রতিকূল তা চাই না—এ-প্রবৃত্তি আমাদের সহজাত। অনুকূল আর প্রতিকূলের অর্থ-অর্থন বতকণ আমার শক্তির আরম্ভে, ততকণ আমি নিশ্চিত। কিন্তু

আমার শক্তি বহন পূরাতন হয়, তখন বাধ্য হয়ে আমাকে বৃহত্তর শক্তির শরণ নিতে হয়। এ-শক্তিকে আমি যে ঠিক ভাসবাসি তা নয়। আমার চাইতে বড় বলে তাকে আমি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার উপর নির্ভর করি, আমার তার ধানধেয়ালীকে ভয়ও করি। নানা অনুষ্ঠানের দ্বারা তাকে তুষ্ট করা যা তার যোগ এড়ানো—এই হয় তখন আমার উপাসনার চেহারা। এও ভক্তি, কিন্তু সাংখ্যের ভাষায় ভয়ে তামসিক আর কামনার স্বাক্ষরিক ভক্তি। এর মূলে আদিম জৈবধর্মের ভাগিদ, যার মাঝে চেতনার বোড় ফেরানো রয়েছে বাইরের দিকে।

কিন্তু চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যেমন বাইরের ভগৎটাকে মুক্তির শাসনে গুছিয়ে আনবার চেষ্টা করে, তেমনই অন্তরেও আত্মবোধকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। বাইরে-ভিতরে সৰ্ব-কিছু তখন তার কাছে মনে হয় কার্য-কারণের শৃঙ্খলে বাঁধা। সেই সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর শক্তির সহজে ও তার ধারণার পরিবর্তন হয়। আগে যে ঈশ্বর ছিলেন ধানধেয়ালী, তিনি এখন ন্যায়পরায়ণ, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, কর্কশলের বিধাতা। তাঁর অনুগ্রহের প্রত্যাশা এবং নিগ্রহের ভয় তখনও থাকে, তবুও তাঁর প্রসাদ আর করুণার মুখ চেয়ে তাঁর প্রতি নির্ভরের ভাবটা আরও স্বচ্ছ হয়। বলা বাহুল্য, এও শুদ্ধা ভক্তি নয়।

পূর্ণপ্রতি যেনন অধ্যাত্মবোধের একটা বোল লক্ষণ, তেমনই তাঁর আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে মহিবোধ (sense of the sublime)। আত্মবোধ ধানিকটা স্থিতি হলে আমাদের মাঝে এই মহিবোধ জাগতে পারে। তার গোড়ার কথা হল চেতনার বিস্ফোরণ। বৃহৎক তখন আমি ভয় করি না, তার আবেশে আমিও উদ্দীপ্ত এবং বৃহৎ হই। মহিমা যদি আমার অভিজুত করে, তাহলে ভক্তি যেক্রম দেখা দেয় তার ইংরেজী সংজ্ঞা হচ্ছে awe—যা ভয়-ভানবাসার একটা বিশৃণ এবং যার প্রতিফল আমাদের সেনের ভক্তিশাস্ত্রে বুঝে পাওয়া যায় না। মহিবোধে চেতনার যে-উদ্দীপনা, তাহতেই সত্যাকার অধ্যাত্ম-জীবনের শুরু—যার একটি পরিণাম জ্ঞানীর সামুদ্র্যবোধে, আর আরেকটি পরিণাম ভক্তের সঙ্কল্পেব প্রতিষ্ঠা বা অন্তরঙ্গতার বোধে। তাঁর হয়ে তাঁর মহিমায় আমার মহিমা—এই হতে ভক্তিবোধের শুরু।

*

*

*

কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রের পিছুয়ে মানুষের আপত্তিও আছে। একটি আপত্তি প্রকাশ পায় জড়বাদীর নাতিকো। জড়বাদীর কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইহলোকই সত্য, লোকান্তর বিষয়া, বৃহত্তর কোনও শক্তির উপাসনা নিরর্থক। জীবনে অভ্যুদয় (welfare) চাই। তা আসে জড়পন্থিক বশে এনে। জড়বিজ্ঞান তাই করছে। তার জন্য কারও উপাসনার তো কোনও প্রয়োজন নাই।...উঠলে বলা চলে, শুণু অভ্যুদয়ই নয়, নিঃশ্রেয়সও (Summum bonum) জীবনের লক্ষ্য। আরটোড়নোর বিস্ফোরণ এবং উৎকর্ষও চাই। শুণু ভোগে তা হয় না, হয় বোধে। বোধে যে বিভিন্ন আরটোড়নোর অনুভব পাই, জ্ঞও

সত্য, তাও আনন্দে পূর্ণমার্গ। আত্মানুভবের স্পষ্টতা হতে যাকে আত্মচৈতন্যের বিস্তারণ, বৃহত্তের অনুভব। যাত্রা চৈতন্যের উৎসঙ্গপে আবিষ্কার করি অনন্ত চৈতন্যকে—যেমন সত্য জড়শক্তির মূলে বৈজ্ঞানিক অনুমান করেন অনন্তজড়শক্তিকে। আনন্দোত্তর বোধ উত্তর-ক্ষেত্রেই সনান : তবে একক্ষেত্রে তা প্রত্যক্ষ এবং চিত্তপ্রকর্ষের চেতু, আরেকক্ষেত্রে নিঃসাড় অনুমান মাত্র। নিঃস্বপ্নে মনি এবং জ্ঞানি বলেই ভগবানকে মনি এবং তাঁর উপাসনা করি। না মননে আপাতসূত্রে বাইরের কোনও ক্ষতি নাই, কিন্তু তাতে অন্তরের কার্পণ্য। সে-কার্পণ্যে শেষ পর্যন্ত বাইরেরও ক্ষতি।

আরেকটা আপত্তি জ্ঞানপন্থী নেতিবাচীর। অন্তরাবৃত্তির পথে পরমার্থের (Supreme Being) স্বরূপ আবিষ্কার করতে গিয়ে 'নেতি নেতি' বলে তিনি সৰ্ব-কিছু ছাপিয়ে শৌঁছান এক প্রপঞ্চোপশন নির্বিশেষ অব্যবহার্য নৈঃশব্দ্যে। এই তো চেতনার তুলন্তর ভূমি, তার পরে আর কিছুই নাই। স্তত্তরাং এই পরম সত্য। কিন্তু এসত্যে অবগাহন করাই চলে, তার উপাসনা করা চলে না। নির্বিশেষ বলেই এসত্য জীবনের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক। ভালবাসা জীবনের ধর্ম, সখ্যতবে তার উন্নয়ন। কিন্তু এখানে শুধু 'শান্তঃ শিবঃ সর্বৈভবঃ'। তারও একটা আকর্ষণ আছে, আবেশ আছে, অন্তঃস্বপ্নেও কিছুটা আভাস আছে সত্য; কিন্তু সে-সখ্য বিনাশের—সত্ত্বাতির নয়, উপশবের উন্নয়নের নয়।

জ্ঞানীর এই অবর্ণ অনুভব বিখ্যাত নয়, কিন্তু অর্থও সত্যের সম্বন্ধানিও নয়। অবর্ণও যেমন সত্য, তেমনই বচসা বর্ণের বিকিরণও সত্য। যেমন আকাশ, তেমন আবার দু'লোককে আদিত্যের প্রভা। অন্তরিক্ষে ইন্দ্রধনুচ্ছটা, পৃথিবীতে বর্ণের সমারোহ। সব নিয়েই সত্য অনির্বচনীয়। জ্ঞানীর যিনি স্বকল্পব্রহ্ম, তিনিই ভক্তের পুরুষোত্তম। তাঁকে ভালবাসা যায়, সব দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়—যেমন সব ছাড়িয়ে তাঁর কাছে নিঃশেষ হওয়াও যায়।

*

*

*

ভক্তিবাদ তাহলে এই কয়টি অভ্যুপগমের উপর প্রতিষ্ঠিত :

(১) পরমার্থ শুধু নির্বিশেষ সন্মাত্র মন, তিনি চিন্ময় পুরুষও : (২) যেমন তিনি বিশ্বাতীত, তেমনই আবার বিশ্বাত্তও—তাঁকে ওখানে-এখানে দু'খানেই পাওয়া যায়, (৩) যেমন তিনি অবিগ্রহ, তেমনই আবার সবিগ্রহও, স্তত্তরাং তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সখ্য স্থাপন করা চলে ; (৪) তাঁকে ভালবাসলে পর তিনি সাজা সেন। তা'লে তিনি মানুষের মত মন, যদিও ভক্তির প্রথম অবস্থায় তাঁকে আনন্ড আনন্দের মত করেছে বেশি। অথচ মানুষের মাঝেই একগণ্ডে তাঁর উৎকৃষ্ট প্রকাশ : স্তত্তরাং বলতে পারি, একপ্রকারে চরম উৎকর্ষ যেখানে, সেখানে তিনি আনন্ড হয়েও পুরুষোত্তম। ছন্দ দিয়ে আনন্ড সেই পুরুষোত্তমকেই পেতে চাই। সে-চাওয়ায় তিনি সাজা সেন, ছন্দে এসে আসন পাতেন।

আবার তিনি বিশ্বাত্তক বলে বিশ্বের সঙ্গে আনন্ড কে-বে সখ্য স্থাপন করি, তাঁর সঙ্গেও সেই সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। বস্তুত, বিশ্বের কোনও-কিছুকে চাওয়ায় অর্থ তার ভিত্তর

দিয়ে তাঁকেই চাওয়া। ‘কে-কিছু আনন্স আছে দেখা থাকে গানে’ তার চরনে তাঁরই আনন্স-
বক্তৃতা আরম্ভ। হৃদয়ের যে-কোনও তুষ্কার তুষ্টি ভাবের উত্তেজনা—বস্তু তার উপলব্ধি
নাই। ‘হৃদের বসে হারিয়ে যাওয়া, সেই জো দেখা সেই জো পাওয়া’ তাইতে রসিকের
অনুভবে ‘ধায়া ধায়া দৃষ্টি পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্কুরে’।

সবস্তু জীবনটাই একটা যোগের সাধনা। সে-যোগ ভ্রমের সঙ্গে অবেগের, পূর্ণের সঙ্গে
অপূর্ণের। ‘সাগর যেমন সন্ধ্যা ধৌ চানে নদীর পরাণ’—তেননি অসীমের আকর্ষণ সীমার
অন্তরে-অন্তরে। সে-আকর্ষণে সীমার মাঝে যে ‘হিমালয়গর্গি পরাণ পোড়নি’ তারই নান
শ্রেণ। শ্রেণই পরিপূর্ণ মিননের দৃষ্টি। প্রত্যেক জীবের স্বভাবে তা নিহিত রয়েছে
আত্মবিস্ফোরণের আকৃতিরূপে : নিজেই পরিপূর্ণরূপে পাওয়ার অর্থই তো হল সেই পরবের
মাঝে অনিশ্চেষ্টে নিজেই হারিয়ে ফেলা। অন্তর্গত চেতনায় এই আকৃতি যখন জাগে,
তখনই যোগের শুরু। মানুষ তখন আর-কিছু চায় না, চাইতে পারে না। অসীমকে সে
তখন অসীমের জন্যই জানবাসে, আর-কিছু জানা নয়। ভক্তি তখন অহৈতুকী, জীবের
স্বভাবের সনাক্ত স্ফূর্তি। তখন তাঁরই অন্যো তাঁর আলোর নিজেই কুটিয়ে তোলা ছাড়া
তাঁর আর কোনও-কিছুর অপেক্ষা থাকে না। ভক্তিব্যোগের এই হল রহস্য।

ভক্তির পথে হৃদয় হল শিখারী, বুদ্ধি নয়। আগেই বলেছি, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির
কোনও বিরোধ নাই ; কিন্তু তবুও ভক্তি জ্ঞানে হৃদয় দিয়ে, বুদ্ধির বিচার দিয়ে নয়। বিভজ্ঞা-
নশী (analytic) বুদ্ধির অনেক বিরোধ অনেক সংশয়ের সমাধানকে পায় হৃদয়ের অর্থ-
প্রাতিষ্ঠা দিয়ে। এই অর্থপ্রাতিষ্ঠা বোধের ধর্ম ; আর বোধি সমাকৃদান এবং শুদ্ধ ভক্তি
দ্বয়েরই সাধন। জ্ঞান আর ভক্তির মাঝে কোনও কোনও বিষয়ে বিরোধের সৃষ্টি করে বুদ্ধির
একদেশমণ্ডিতা ; যেমন, পরমার্থ অরূপ বা সত্ত্বপ, এক না দুই—এ নিয়ে জ্ঞানপরী আর
ভক্তিপরীর যে-স্বগতা আসলে তা বুদ্ধির লোভে। ঐক্যের অভ্যুত্থানের (postulate) ;
যা ধরে পথ চলেতে শুরু করব, তাই নিয়ে মতান্তর। কিন্তু পথ চলেতে-চলেতে দৃষ্টি যতই
উদার হয়, বোধির উন্মেষ হয়, ততই ঐক্যের আর থাকে না। তখন সেধি, যিনি অরূপ
তিনিই রূপ-রূপে প্রক্টিত—যেমন বস্তুতে, তেননি ভাবে ; যিনি সীমার বহু, বিশালে
দুই, তিনিই আবার সাত্ত্বিকের পরমতার এক।

৩

ভাবের সাধনা

আত্মচৈতন্যকে বুদ্ধিচৈতন্যে রূপান্তরিত করার সাধনাই হল যোগ। বুদ্ধি সং চিত্ত
আনন্দ এবং শক্তি-স্বরূপ। চৈতন্য আনন্দ এবং শক্তির সুপ্রত্যয় সত্যের সত্যোচ ও বৈদ্য

হল আবার প্রকৃত রূপ। 'প্রায় রূপান্তরই আবার পরম প্রকৃতি'। এই রূপান্তর নিম্ন হলে বুদ্ধচেতন্যের সংস্পর্শে, তার সঙ্গে যন্ত্ররসত্ব এবং অবশেষে সাদৃশ্যে। তন্ত্রের পাশে এই সাদৃশ্য নিম্ন চর ভাবের (emotion) দ্বারা। বুদ্ধের চিন্তাধরূপের অভিব্যক্তি যেমন আমাদের জানে, নৃত্যধরূপের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে এবং কর্মের, তেননি মানসধরূপের অভিব্যক্তি ভাবে। নির্দিষ্ট আনন্দের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার দিকে যেমন জানের স্তোকে, তেননি ভাবের স্তোকে হল বিশেষকৈ নির্বিড় করে ছড়িয়ে ধরে তারই মাঝে আনন্দের আশ্রয়নের দিকে। একটি প্রকারের ধর্ম, আরেকটি প্রকৃতির। প্রকৃতির কাজে নৃত্য রূপ চণ ক্রিয়া সবই নৃত্য। তাই এই সব নিয়েই তন্ত্রের সাধনা—আনন্দের প্রতি উন্নত ভাবকে আশ্রয় করে।

আমাদের প্রাকৃত জীবন বুদ্ধির চাইতে ভাবের দ্বারা বেশী শাসিত একথা স্বচক্ষে বলা চলে। কিন্তু সচরাচর এই ভাব অবিকৃত অর্থাৎ এতে সজ্ঞাত চাকলা এবং বুদ্ধতার ভেদাল আছে। অধ্যাক্ষেপের উৎসবের সময় মানুষ এই অবিকৃত ভাব নিয়েই বুদ্ধতের উপাসনা করে। আগেই বলেছি, তাই একটি বিশিষ্ট রূপ হল ভয়। ভয়ই অধ্যাক্ষেপের একমাত্র প্রযোজক না হলেও সর্বসাধারণের মনের অনেকখানি যে সে ভুড়ে আছে তা বিখ্যাত নয়। কোমল-কোমল ধর্ম ভয়কে শেষ পর্যন্ত মিইয়ে রাখা হয়, ঈশ্বরভীরু মানুষ তাদের আদর্শ। মহিমাবোধ সব ধর্মের মূলে। কিন্তু বুদ্ধতের মহিমাকে যোগ করে মানস চেতনা যদি উর্ধ্বতন না হয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে, তাহলেই ধর্মভাবের মাঝে সেবা সেবা ভয় এবং তার অনুযুক্ত আত্মদৈন্য এবং পাপবোধ। ভয় আর পাপবোধ যেসব ধর্মে প্রধান, তারা বুদ্ধতের মাঝে প্রত্যক্ষ করে নিমজ্জন শক্তির রূপ। এই শক্তি যখন দুর্জয়, ভগবান তখন মানবোন্মাদ। কিন্তু শক্তির মাঝে মানুষ যখন কার্য-কারণের শৃঙ্খলা আবিহাব করে, ভগবান তখন বিহাঙ্ক-পুরুষ, বিশেষ রাজা, মানুষের হৃৎপুরুষের দাতা। পাপবোধের অসহায়তা হতে আসে অপরাধকথাপনের ভাব, তাহলেই আগে করুণার প্রত্যাপনা, ভগবান তখন পতিভোক্তারূপে আসে। তিনি তখন অগতির গতি, মানুষের জীবনের পরম নির্ভর। ভয়ের ভাব এমন করে অবশেষে পর্যবসিত হয় পরশাগতিতে। কিন্তু যে-অজান থেকে ভয়ের উৎপত্তি, তার একটা সূক্ষ্ম সংজ্ঞার তখনও ভাবের মাঝে থাকে বলে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের পূর্ব কিছুতেই যেম হুজুতে চায় না।

এদেশের তন্ত্রসাধনা কিন্তু গোড়া হতেই আশ্রয় করেছে ভয়ের পুরস্কে নয়, সম্বন্ধের অন্তরঙ্গতাকে। মানুষ 'পাপাত্মা পাপসত্ত্বা', আদিপুত্রিতের (original sin) অবোচন লাক্ষ্যে লাক্ষিত—এই ভাবসিক ভাবনার দ্বান আর্ষণ্যে নাই। তার কর্ম জ্ঞান ভক্তি সব সাধনারই মূলে এই প্রত্যয়—মানুষ অন্তের পুত্র। তার কর্মবাদ ভগবানকে পাপ-পুণ্যের বিচারের তার হতেও অব্যাহতি দিয়েছে। হুজুয় ভয় ভগবান অন্তর্ধানী নিরজ্ঞা এবং পুত্র হলেও ভক্তের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভয়ের নয়, পুত্রের নয়—ভাববোধে কাছে পৌঁছায়। আবার কর্মের তিনি তাঁই বিচারক নন, তার অধাক। আবার বর্বাদর্শের প্রবৃত্তির মূলে তাঁই প্রেরণা এবং তা প্রতিনিষেধ আনাকে প্রচোদিত করছে নিশ্চিত প্রেমে দিকে।

সেনৈতিক ধর্মভাবের সঙ্গে আর ধর্মভাবের সুরমিতে এই তফাত। আগেও বলেছি, মহিমাবোধ এবং আত্মবোধই হল অধ্যাত্মভাবনার মূলে। আত্মভাবনায় এই আত্মবোধ অত্যন্ত সূক্ষ্মশিষ্ট, বৃহত্তর সঙ্গে সামুদ্রিকবোধের একটা অকুণ্ঠ প্রত্যয় তার মাঝে দেখা দিয়েছে একেবারে প্রথম থেকেই—আকাশভাবনা এবং আদিভ্যোপাসনার ফলে। তাইতে তার ভক্তিরূপে সেনৈতিক ঐশ্বর্যবৃত্তির পূর্ণাঙ্গার আদর্শের চাইতে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ঐশ্বর্য প্রৈনিক অকৃতোত্তর সর্বভূতহিতরত শুদ্ধাত্মার আদর্শ।

★

★

★

ভাব (emotion) আর সঙ্কল্প (will) দুইই প্রকৃতির ধর্ম এবং তারা অন্যান্য-সম্বন্ধ। অবিকৃত প্রকৃতিতে ভক্তির প্রয়োজনরূপে ভাবের দিক দিয়ে যেমন দেখা দেয় ভাব, তেমনই সঙ্কল্পের দিক দিয়ে দেখা দেয় কামনা (desire)। ভাব অথবা কামনা নিয়ে ভগবানকে যারা ভক্তি করে, তাদের ভক্তি এখনও বোগ হয়ে ওঠেনি। গীতার আর্ত এবং অর্থাধী ভক্ত বর্ধাক্রমে এই শ্রেণীর।

কামনা আর সঙ্কল্পে তফাত আছে। যে অশক্ত, সে-ই কামনা করে; যে শক্ত এবং সর্বধ, সঙ্কল্প তার। মহত্তর শক্তির সঙ্গে যখন সাযুজ্য অনুভব করি, তখন কামনা রূপান্তরিত হয় সঙ্কল্পে। তখন আমার আর চাইবার কিছু থাকে না অনুভব করি, আমার ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছাতে লয় হয়ে গেছে, আমি তাঁর সত্যসঙ্কল্পের বাহন। ভক্তি তখন অটুট, কর্ম সেবা, কর্তা তাঁর নিমিত্তনাম।

কামনা জীবনের মূলে, তাকে ছাড়া যায় না; কিন্তু তাকে পোষিত এবং রূপান্তরিত করা যায়। মহাত্মনেরা দু'রকম কামনার কথা বলেন—অসতী কামনা, আর সতী কামনা। অবিন্যাচ্ছন্সের কামনা অসতী; আর বিদ্যার অতীশা জেগেছে যার মাঝে তার কামনা সতী। ভগবানের কাছে 'এটা চাই ওটা চাই' যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ চাওয়াটা অসত। যখন বলতে পারি 'শুধু তোমাকেই চাই', তখনই চাওয়া সত্য হয়ে ওঠে, কেননা এ-চাওয়া স্বরূপের চাওয়া, তার একটা নিশ্চিত সার্থকতা আছেই।

কিন্তু এটা-ওটাও তো চাই, নাচলে সংসার চলবে কি করে? ভক্ত বলেন, 'সে-ভাবনা আমার নয়, ধীর সংসার তাঁর। তিনি যা কেন আমি তাতেই যুগী। স্বপ্নে-মুগ্নে সম্পদে-বিপদে তাঁকে কেন না ভুনি, আমার চাওয়া শুধু এইটুকু—আর-নয় দায় তাঁর। কিন্তু এও সেরি, যে ঝায় চিনি, তারে যোগান চিন্তাবশি। পাতাতেও তিনি বনছেন, সবতক্ষণ আমার দিকে নমখানি যে ফেলে রেখেছে, তার যোগ্যকেন আমিই যখন করি।'

এ হল ভাবের কথা। কিন্তু তার মূলে বৃত্তিও আছে। চিত্তপ্রকর্ষই একমাত্র পুরুষার্ধ এই অন্তর্লক্ষ্য যার দ্বির হয়ে গেছে, বাইরে-ভিতরে সর্ব-কিছু তার গুহিরে আসে। সে তখন সেবে, সব ঘটনারই এক অর্থ—শুধু ভিতরটাকে জাগিয়ে তোলা, গুরিয়ে তোলা, রসিয়ে তোলা। অনুকূল-প্রতিকূলে তখন ভেদ বুচে যায়, সব অবলম্বই হয় অনুকূল। তাইতে

চাওয়া-পাওয়া প্রণু আর তখন থাকে না। জানীর নিঃশ্বাস, ভক্তের আত্মসমর্পণ, কবীর ফলাকাণ্ডকার্জন—সবান মূলে ঐ কথা।

তবুও একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, উপাসনার প্রার্থনার সার্থকতা কি? প্রার্থনার কি কেউ সাড়া দেয়? চাইলে কি পাওয়া যায়? প্রার্থনার কি কোনও শক্তি আছে?

উত্তরে বলব, প্রার্থনার শক্তি আছে বই কি। কিন্তু প্রার্থনা ঠিক বসে চলে চাই, তার প্রকৃতি এবং পরিণাম সম্পর্কে সঠি ধারণা থাকা চাই। প্রথমেই বলা যেতে পারে, অশাস্ত চিন্তের প্রার্থনায় কোনও ফল হয় না—যদি যা ফল দেখা দেয় তা প্রায়ই হয় কাকতালীয়রূপে। যনের মাঝে নানারকনের চাওয়া আছে। কতকগুলি চাহিদা আবার নিজের শক্তিতেই মিটিয়ে নিতে পারি। নিজের শক্তিতে যেখানে কুলয় না, সেইখানেই উৎসর্গশক্তির কাছে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই উৎসর্গশক্তির স্বরূপ কি, আমাদের জীবনে তার কাল হচ্ছে কি-ভাবে, আবার তার কিছুই জানি না। একেত্রে প্রার্থনা শুধু অসহায় যনের একটা আকুল-বিকুলিক প্রকাশ করা মাত্র, তা বস্তুত্বের 'পরে রাখা ঠোকাও' হতে পারে।

আমাদের প্রার্থনার মূলে আছে একটা সম্বলশক্তির প্রবেশ—'আনি চাইছি এই হ'ক।' কিন্তু বিশ্বের মূলে একটা বিরাট সম্বল কাজ করছে, সমস্ত জগৎকে এক নিশ্চিত পরিণামের দিকে সে নিয়ে চলেছে। সেই সম্বলের সঙ্গে আমার সম্বলের সঙ্গতি থাকে যদি, তাহলেই প্রার্থনা ফলবে।

বাইরের ঘটনা দেখে ঈশ্বরসম্বলের রহস্য বোঝা কঠিন। জগতে কেন কি ঘটছে তা আমার কাছে সঠি নয়। কিন্তু তাঁর সম্বল আবার জীবনে কি রূপ ধরতে চাইছে, চেষ্টা করলে তা বোঝা যায়। এখানেও বাইরের ঘটনা বুঝা নয়, বুঝা হচ্ছে তান থাকার আমার অন্তরের কি পরিবর্তন হচ্ছে, তা-ই। পাখরে পাখরে ঠুকলে যেন আঙনের ফুলকি খেঁদে, তেনি বাইরের আঘাতে আমার মাঝে আঙন ছুঁক, আমার ভেতর আর চাকলা চৈতন্যের দ্বির নিখা হয়ে জলে উঠুক—বলা যেতে পারে, মানুষের জীবনে ঈশ্বরসম্বলের এই হল সর্বজনীন রূপ। এটি যখন বুঝতে পারব, তখন আমাদের প্রার্থনার প্রকৃতি বদলে যাবে। তখন বলব, 'বিপদে বোরে রক্ষা কর এ নয়ে বোর প্রার্থনা, বিপদে যেন কসিতে পারি জয়।' কি দিয়ে জয় করব? স্বর্ষ দিয়ে, ভিত্তিকা দিয়ে, তাঁরই শক্তি দিয়ে।

এই হতে প্রার্থনাবোধের স্তর। স্বর্ষে চিত্ত অন্তরূপ হবে, ভিতরে আলো জ্বলবে। সেই আলোতে বুঝতে পারব, আমাকে আশ্রয় করে তাঁর সম্বল বাইরে-ভিতরে কি ঘটছে চলেছে। যখন বুঝব, তখন বাইরের কাব্য সম্পর্কেও ঠিক বসে প্রার্থনা করতে পারব। সে-প্রার্থনা আর অজানীর কাননা নয়, বিজ্ঞানীর সম্বল—যা ঈশ্বরসম্বলেরই প্রতিরূপ। বাইরে-ভিতরে আমার চাওয়া আর তাঁর চাওয়া তখন এক হয়ে যাবে। সে-চাওয়া থাকবে আলো আনন্দ আর শক্তি। তখনই প্রার্থনাবোধের সিদ্ধি।

*

*

*

গীতায় চার ব্রহ্ম ভক্তের কথা আছে। এতক্ষণ আর্ত আর অর্গাধী ভক্তের কথা হল। আর দু'ব্রহ্ম ভক্ত হলেন দ্বিজানু এবং জ্ঞানী। তাঁকে জানতে চাই, পেতে চাই, 'ধরদী নইনে প্রাণ বাঁচে না'—এই দ্বিজানু আর অর্গাধী হতে ভক্তিবোধের শুরু। জানাতে পাওয়াতে হওয়াতে তার সারা। গীতায় ভগবান বনছেন, আর্ত অর্গাধী এবং দ্বিজানু এই ভক্তেরাও উপর, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত আবার আশ্চর্যরূপ।

কিন্তু ভক্তির জ্ঞান আর পাওয়া হৃদয় দিয়ে। ভাব হল তার সাধন। মানুষের যত্নরকম ভাব আছে, সবেরই উর্ধ্বাধানে (sublimation) তাঁকে পাওয়া যায়। জানেন যে মানুষকে যেন সহজে বুকের কাছে পাই, ডেরনি করে তাঁকেও পেতে পারি।

অসংখ্য ভাব, বিভিন্ন তাঁকে আচ্ছাদন করার আনন্দ। তবুও তাদের কয়েকটি জাতিক্রমে (type) ভাগ করা যায়। মহাজনেরা বলেন পাঁচটি ভাবের কথা—শান্ত দাসা সখা বাৎসনা এবং নৃধর। চিংপ্রকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে জ্ঞানবীজের উত্তরতা হয়, সেই অনুসারে এই ভাবগুলির একটা পর্যায় আছে। ভাব উত্তরোত্তর বড় গাঁচ হয়, ততই তার মধ্যে দেখা দেয় বৈচিত্র্য, পরের ভাব আগের ভাবগুলিকে আচ্ছাদন করে নেয়। অবশেষে নৃধর ভাবের মাঝে জাগে সমস্ত ভাবেরই অসামান্য (unparalleled and unsurpassed) উদ্ভাস।

মানুষের ভাবই ভগবানে আরোপ করা হচ্ছে, কিন্তু তবুও দুটি ভাবের ছাত আলো। মানুষের বৈশাখ ভাবে-ভাবে বিরোধ থাকতে পারে—কেননা ভাব সেখানে ব্যবহারের দ্বারা নিরস্ত্রিত আর ব্যবহারের মূলে রয়েছে দুষ্টির সঞ্চার। বাবাকে বন্ধু করা কি বোনকে না করা আনন্দের কাছে বিসর্জন থেকে। তাই একেকজন মানুষের প্রতি আনন্দের একেক ভাব। কিন্তু ভগবানকে ভক্ত যুগপৎ সব ভাবেই ভাবতে পারেন। ভাব সেখানে উৎসারিত হচ্ছে চিন্তায় যত্ন:সত্তার গভীর হতে, ছৈব বা মানসভাবনার সঞ্চারে দেখানো নাট, ব্যবহার সেখানে চিত্তবিন্যাস। 'তাই আনন্দে গলে গিয়ে ভগবানকে বলতে পারি: 'হবেন বাতা পিতা হবেন, হবেন বন্ধু হবেন সর্গ: মন দেবদেব,' অথবা 'জ্ঞানী তনয় ছাত্রা সহোদর কি অপরে।' ভাবের এই স্বচ্ছন্দ সঙ্গরপ এবং সংক্রমণ যেন শুভ পৌরবর্ষের ইন্দ্রধনুচ্ছটার বিকিরণ। ভগবদ্ভাব রক্তবোনেশূন্য শুদ্ধস্বেরই বিন্যাস, প্রাকৃত ভাব তা নয়।

ভাবের স্বরূপ সম্পর্কে এই কথা কয়টি বনার পর তাদের প্রকার নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

★

★

★

আগেই বলেছি, অধ্যাক্ষেপের উদ্দেশ্য হয় বহিবোধ থেকে। সুতরাং বহিবোধে জ্ঞান ও ভক্তি দুয়েরই বীজ। বৃহত্তর আবেশে বৃহৎ হওয়াই যদি অধ্যাক্ষেপের সবগ্রহ পরিণাম হয়, তাহলে বহিবোধে হতে সাধক কখনও বিচ্যুত হতে পারে না। সাধুপিতামহ অনেক ভক্তের ঐশ্বর্যের প্রতি একটা বিরূপতা দেখা দেয়। সাধকের পক্ষে এবং জনসাধারণের পক্ষেও এই বিরূপতা স্বাভাবিক নয়। এদেশের প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্রেও তাঁর সমর্থন

পাই। নারদ শ্রীষ্টই বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীর ভালবাসার মূল যদি বহিনবোধ না থাকত, তাহলে তা চান্সের প্রতি ভালবাসার উর্ধ্বে উঠত না। সব বা-ই সম্ভাবনাকে প্রাণ তেলে ভালবাসে; কিন্তু তারা সবাই যশোদা বা বেনকা ভেদে নয়।

বহিনবোধ থেকে মাগে শাস্ত্রভাব। ভাগবতের ভাষায় তা নিখুঁত মূনির আশ্রয়গতা। একদিক দিয়ে যেমন জ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য, তেমনি তত্ত্বেরও ভিত্তি। বস্তুজ্ঞানের বসন, প্রশান্ত ও নির্বিক চিত্ত ধর্পণের মত মঙ্গল হলে তবে সে প্রেমসুখের অংককে ধারণা করতে পারে। ভাব প্রশ্রবেরই উদ্ভাস, প্রবর্ততা নয়। সমুদ্রের উপরে বত তরঙ্গতর, গভীরে ততই গুহুতা। এককথায় শাস্ত্র ভাবেই সমস্ত ভাবের অধিষ্ঠান। এই কথাটি বুঝতে পারলে জ্ঞান আর তত্ত্বের মাঝে বিরোধ কল্পনা করবার কোনও দরকারই হয় না।

শাস্ত্রের পর দাস্য। সম্বন্ধই (mutual elatedness) হল তত্ত্বের প্রাণ। দাস্যে সম্বন্ধ স্ফুটত হয়, শাস্ত্রের প্রসঙ্গভাব মাগে মাধুর্যের স্বঃ। দাস্যের মাঝে বহিনবোধ প্রকট : ভগবান বড় আনি ছোট, তিনি বিধাতা আনি বিধেয়—এই হল দাস্যের মূল ভাব। এই ভাবেরও তিনটি পর্যায় আছে—পূর্বত সাধক এবং সিদ্ধ। আর্ত এবং অর্থাধী ভক্তের ভাব দাস্যের অন্তর্গত, কিন্তু তত্ত্ব সেখানে পূর্বতমাত্র। ঈশ্বরভীতির দাস্যভাবকে বলতে পারি সাধকভাব। আর সিদ্ধ দাস্যভাবে আনি ছোট হলেও ভগবান আবার বড় আপন, বড় কাছে। ভালবাসায় তাঁর পায়ে আনি বিকিরে গেছি, তিনি ছাড়া আমার কেউ নাই কিছুই নাই—এই একান্ত সমর্পণে দাস্যের মাধুরী।

অন্তরঙ্গতার নিবিড়তা অনুসারে এরও মাঝে আবার তিনটি ভাবের স্ফুটি হতে পারে। প্রথম ভাবে ভগবান আমার অন্তর্ধানী আমার প্রভু, আমার গুরু। তিনি যন্ত্রী আনি ঘর, আমার সবস্ত কর্তার তিনি প্রয়োজক এবং অধ্যাক, তিনি শাস্ত্রা আনি প্রপন্ন শিষ্য। আমার কর্তারই অর্চনা। গাঁতায় এই ভাবটি মূল্যন ফুটে উঠেছে।

আরও অন্তরঙ্গ ভাব হল পিতার প্রতি। এখানে বেন গভীর যোগ। দ্বিতীর্থধর্মে এই ভাবটি পরিস্ফুট। বৈদিক ধর্মেও এর উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এসেলে ভগবানের প্রতি পিতৃভাবকে ছাপিয়ে উঠেছে মাতৃভাব। পিতার চাইতে মাতা আরও কাছে। পিতা অধ্যাক, কিন্তু মাতা প্রসুতি—সেহে প্রাণে বনে চেতনার আনি একান্তভাবেই মাগের। আশ্রয়-আশ্রয়িতার সেখানে মুখ্য, সেখানে মাগের অভল অপার সেহে আর শিশুর সহস্র অনিঃশেষ আত্মসমর্পণে ফে-মাধুরী ফুটে ওঠে, তার তুলনা নাই। অন্তরাবৃত্তি যদি অধ্যাকচেতনার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হয়, তাহলে আমাদের প্রবস্ত অহংকে আবার শৈশবের মারলো কিরিয়ে নিতে পারাকে একদিক দিয়ে অধ্যাকসিদ্ধির পরাকাষ্ঠা বলা যেতে পারে।

দাস্যভাবের পর সখ্যভাব। এখানে আর তুমি বড় আর আনি ছোট নই, তুমি আর আনি সমান-সমান। বৈদিক ভাবনায় এই বোধটি খুব শ্রীষ্ট ছিল, যেহেতু সেখানে সাধকের 'সবুখ্ সখা'। এই বোধই অবশেষে পর্ববসিত হয় অমৈত্বেবোধে : 'ঐ আদিত্যে কে-পুচ্ছ

আর এই হৃদয়ে যে-পুরুষ দুইই এক'। এ হল স্বরূপোপনঞ্জির দিক, জ্ঞানের দিক। এই সত্যস্বরূপে আবার বিনসিত হয় কর্ণে এবং ভাবে। তখন সত্যের আরও দুটি প্রকার দেখা দেয়—যেমন কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের প্রতি অর্জুন আর ভৃঙ্গার সখ্য, আবার বৃন্দাবনের চিরকিশোরের প্রতি কিশোর গোপ আর কিশোরী গোপীর সখ্য। প্রথমটিতে বহিমবোধ কিছুটা উন্মিল, কিন্তু শেষেরটিতে তা সম্পূর্ণ বিগলিত। একটিতে ভক্ত ভগবানের কর্ণসচিব, আরেকটিতে নরসচিব। তাঁর নিমিত্ত হয়ে একটীতে তাঁর সঙ্গে কাষ করি, আরেকটিতে অনন্তকাল ধরে তাঁর সঙ্গে খেলা করি। একটিতে বেশি তাঁর প্রজ্ঞা ও শক্তির রূপ, আরেকটিতে তাঁর আনন্দরূপ।

সত্যের পর বাৎসল্য। এখানে আবার বৈষম্য দেখা মিল—কিন্তু দাস্যের বিপরীত-রূপে। এখার ভূনি ছোট, আনি বড়। জোনার সহস্র বহিনা বিগলিত হয়ে গেছে, ভূনি এখন ছোট শিঙটি। জোনের কচি আলোর নত, ফোটো-ফোটো ফুলের কুঁড়ির নত। বাছ বুক ভুড়ে, লাবণ্যের ছোঁছনা হয়ে। যেন স্তম্ভযিতীয়ার চক্রকলা—আনার বনভার ভিলে-ভিলে বেড়ে উঠবে। জোনার জন্য আবার ভাবনার অস্ত্র নাই। আনি না দেখলে জোনার দেখবে কে! ঐ চুটলে নৃত্যর একটি বিলু, তা-ই যে সপ্তসিদ্ধির মোয়ার কি করে উখানে তুলন হৃদয়ের কানায়-কানায় বৃষ্টিতে পারি না।

'ঘরের ভেলের চক্ষেতে হেরি যে বিসৃজ্যের ছায়া'—এই ভাবটি এদেশের ভক্তহৃদয়কে আবিষ্ট করে রেখেছে। এখানে শাস্ত্র বৈষ্ণবের রাধিবন্ধন হয়েছে ঘরে-ঘরে উনাকুনারী আর বানগোপানের বেলার।

সমস্ত ভাবের শ্রেষ্ঠ হল কিন্তু নধুরভাব—কান্ত আর কান্তার ভালবাসা। এই রসই আদিরস—সে-রসে এক দুয়ে বিনসিত, আবার দুই একে বিগলিত। যেমন শান্তভাব সব ভাবের আদি, তেমনি নধুরভাব সব ভাবের অবসান। দুটি ভাবে একটি সম্পূর্ণ, তাই মাঝে হিন্দোলিত হচ্ছে আর তিনটি ভাব বহিমবোধের উচ্চাষচতা নিয়ে। শান্তভাবের লোক-ভিগজাই নধুর ভাবের লোকোত্তরতার প্রতিষ্ঠা। অথচ সনাত্ত যেমন পুরুষ-প্রকৃতির মিল, তেমনি এই শান্ত আর নধুরের রস আর রক্তির মিল। আত্মবাসের আনন্দ নীনা-কৈবল্যে বিচ্ছুরিত হল রূপে। মিলন-বিরহের মোয়ার-ভাটায় সেই রূপের যে অন্তরীণ অভিনায়, তা-ই সত্যের পরম নধুরী। তারই নাম কান্তপ্রের, যার মাঝে ভাবের সর্বাধিকি।

৪

ভক্তিমার্গ

ভক্তি হৃদয়ের সহস্র এবং একান্ত আকৃতি। তাই অন্যান্য যোগের নত তার সাধনার কোনও ধরা-ধাধা নিয়ম নাই : 'ওরে বন ভঙ্গ ভায়ে ইচ্ছা হয় যে-আচারে'—এই তার রীতি।

৩০

মহাজনেরা বিদিনির্গত আর লাগনার্ণের কথা বললেও চিত্তের অকৈতব স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া বৈধী ভক্তিরও প্রসঙ্গ হয় না। কথায় বলে, 'যে-যেজ্ঞে রূপ আর ধরে বেঁধে পিরীত হয় না।' এও জা-ই। সুতরাং ভক্তিসাধনার কোনও ছক না কেটে আসনা ভাবের বিবর্তনের একটা সাধারণ আলোচনাই এখানে করব।

আলোচনার সুবিধার জন্য ভক্তির ত্রৈলোক্যবিন্যাসকে দুই পর্বে ভাগ করা যেতে পারে—সাধনভক্তি আর ভাবভক্তি। আগেবাটিতে যেন উৎসবের পাখর হটানো, আর পরেবাটিতে তার স্বচ্ছন্দ প্রবাহণ। সমস্ত প্রবাহটি চারটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে—পূর্বরাগ, বিরহ, সন্তোষ আর ভাব-সংগমন।

সাধনভক্তির কথাই আগে বলি।

*

*

*

'আমিও শ্রদ্ধা ততো রতি:'—সব যোগেরই এই হল মূল কথা। শ্রদ্ধা হল যেন উষার অরুণিমা, অনির্বচনীয়ভাবে তাঁর আভাস পাওয়া। অস্তরে তখন নিশ্চিত আগুন জ্বলে, তবে আর আলো ফোটানার সেরি নাই। তখনই প্রাণে জ্বলে রতি বা ভালবাসার ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতা রূপ নেয় উপাসনায়। তার আসল অর্থ হল ইষ্টের কাছে বসে, তাঁর নিত্যসান্নিধ্যের অনুভব। অনুভবকে চার্গিয়ে রাখবার জন্য প্রথম অবস্থায় কিছু বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হতে পারে, কেননা কর্ণের প্রেরণায় ভাব অস্তরে গুচনুল হবার সুযোগ পায়। কিন্তু অনুষ্ঠান আন্তরিক না হলে সকলই ব্যর্থ। ভক্তিপথে ভাবের ধরে চূড়ির বত বিড়ম্বনা আর নাই। আবার বাহ্য অনুষ্ঠানকে চিবকান আঁকড়ে থাকাও একটা ব্যসন। বাহ্য উপাসনা ক্রমে রূপান্তরিত হবে আন্তর উপাসনায়। হৃদয়মন্দিরে তাঁর যে নিত্য আসন পাতি সেইখানে চলবে তাঁর নিরন্তর আরাধনা—উৎসব প্রাণের ব্যাকুলতা দিয়ে। অনুষ্ঠান যদি তখনও থাকে, তা হবে স্বচ্ছন্দ সান্নিধ্য এবং একান্তভাবে ভাবের অনুগামী। আগে ছিল কর্মকে ধরে ভাবে যাওয়া, এখন হবে ভাবকে ছন্দোময় কর্ণের রূপ দেওয়া।

উপাসনার সার্থক পরিণাম হল আকোংসর্গে। তাঁকে সব দিতে হবে, নিজেকে দিতে হবে নির্বল নৈবেদ্যের রূপে। তাঁতে আর আনতে যা-কিছু আড়াল, নির্বল আত্ম-বিশুদ্ধিগণের দ্বারা তা দূর করে তিনে-তিনে তাঁর হয়ে উঠতে হবে। আন্তরিকতার লাহন হতে মুক্ত হৃদয় হবে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, তার মাঝে এসে পড়বে তাঁরই আলো—বিচ্ছুরিত হবে সকল ভাবে বাক্যে এবং কর্মে। তৎসংগত জীবনের অন্তর-বাইর হবে তাঁরই প্রতিমা।

উৎসর্গের দুটি ধারা—একটি কর্ণের, আরেকটি ভাবনার। কর্ণের উৎসর্গ ভক্তের মাঝে জ্বরের আবেগে কখনও ধরে কর্মসমুদায়ের রূপ; সংসারবিরক্ত হয়ে অধরার গচ্ছানে তিনি বেরিয়ে পড়েন দেওয়ানার মত, ভজন আর ইষ্টগোষ্ঠী ছাড়া তাঁর আর কোনও কাজই থাকে না—হয়তো কচিং এই আত্মাত্মিক বৈরাগ্য শিখিল হয় আর্ডের সেবার। কিন্তু কর্ণের স্বার্থ উৎসর্গ কর্মসমুদায়ে নয়,—কর্ণের স্বপর্ণে, সংসারকে সহজভাবে গ্রহণ করে সব

করকেই তাঁর অর্থনায় রূপান্তরিত কবোতে (গীতা)। তখন আর আমার কাজ নয়, তাঁর কাজ : হৃদয়কেশ হৃদয়ে থেকে যে-কাজে লাগিয়ে দেন তা-ই করি—‘যথা গিবুজোহনি তথা করোমি’।

তেননি ভাবনার উৎসর্গ। তারও ঐকান্তিক (exclusive) এবং সমাক্ (integral) পূর্ণি রূপ আছে। করসন্ধ্যাসেরই নত ঐকান্তিক ভাবনা চল একাগ্রচিত্তে তাঁরই নামরূপের তৈলধারাৎ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন। অবশ্য বৃত্তির নিরোধ তার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য চল বৃত্তির উল্লাসে—মনের পৃথুলের সমুদ্রে গলে যাওয়া নয়, তার পাখর চরে ছানে গিয়ে সমুদ্রের আনন্দসেনার সোল খাওয়া। কিন্তু সমাক্ উৎসর্গ আরও এক বাণ এগিয়ে যায়। তার মাঝে সমাধিতে আর বুঝানে ভাবনার ভেদ থাকে না। তখন চোখ বুজে যেমন ইষ্টকে হৃদয়ে পাই, তেননি পাই চোখ খেলে। রূপে-রূপে লেখি তাঁরই প্রতিরূপ, ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বৃত্তি হৃদয়ের সমস্ত সোলন চিত্তের বিভ্রম দিয়ে আশ্বাসন করি তাঁরই উন্নতন বহিনার নাহরী। জীবন তখন সহজানন্দে চিন্ময়—অস্তরে-বাইরে সক-কিছুই ‘হৃদি সন্নি-বিষ্টঃ’ সেই পরম পুরুষের তনুজ।

*

*

*

এই পর্যন্ত আমার চাওয়া এবং আমার পাওয়া। তারও পরে আছে তাঁর চাওয়া এবং তাঁর পাওয়া। আমি তাঁকে বরণ করি, তাতে আমার গোত্রান্তর। কিন্তু তিনি আনাকে যখন গ্রহণ করেন, আমার তখন রূপান্তর। সে-উল্লাস বিগলিত বেদ্যান্তর, অনির্বচনীয়। কলসীকে সমুদ্রের মাঝে ডুবিয়ে দিলার—তার বাইরে সমুদ্র, অন্তরে সমুদ্র। অন্তর দিয়েই সে তার মত করে সমুদ্রের আশ্বাসন পায়, বাইরের সমুদ্রের আভাসও কিছুটা পায়। কিন্তু এখন অসম্ভবও যদি সম্ভব হয়, অখিল সমুদ্র যদি অনিশেষে আবিষ্ট হয় ঐ কলসীর মাঝে। আর কলসী যদি কলসীই থাকে,—না ভাঙে না গলে, অথচ তার অণুতে-অণুতে লাগে অশীনের উচ্চও বিশ্লেষণও, তখন কি হয়, তা বুঝ ফুটে বলা যায় না। অতনু তনুর নর্মে-নর্মে তীক্ষ্ণতর সূচীভঙ্গের পুঃখের নত সুখ, বিলন রতনের অসহন আনন্দের অন্তরে প্রেম-বৈচিত্র্যের অকৃত্রিম বেদনা। আর তারই মাঝে রসের সাগরে ফুটছে রত্নির পরিনলে উত্তমা রূপের কনন।

এ হতে পারে, এ হয়। করনও ভাবের আবেশ ঘটে সাধনার শেষে—প্রসাদরূপে, করনও বা অসাগরে। করণের বন হতে আচ্ছাদিত ভেসে আসে ননভোলানো কুলনজানো বাঁশির সুর, বয়ঃসহির নিশ্চিন্তপ্রায় শুক্ল চর বিবেক সন্ধানি। রূপের পাখারে নয়ন জুবে যায়, বন হারিয়ে যায় বোধনের গহন বনে। পূর্বপ্রাপ উৎকণ্ঠা অভ্যাস বিলন প্রতীক্ষা বান বিরহ প্রেম-বৈচিত্র্য বিদ্যোন্মাদ—সরসভাষের অকূল সমুদ্রে তরঙ্গভঙ্গের বেন আর শেষ নাই। আসনুজনহৃদবিনোভন ব্যাঘাৎবিধূর্ণন সে-উল্লাস অশীনের রাসচক্রের কেন্দ্র হতে ঝলকে ঝলকে ছড়িয়ে পড়ে বিস্মের প্রত্যয়ে।

[কবণ]

কোরিয়া সম্পর্কে

ঐশ্বর্যবিন্দু

জানি না, কোরিয়া-ব্যাপারে সঠিক চিন্তাভাবার মূত্রটি তোনাকে কেন ধরিয়ে দিতে বলছি। এখানে বিধা করবার তো কিছুই নাই। ব্যাপার সবটা ভালের নতো সহজ।

কমিউনিস্ট অভিব্যক্তি-পরিকল্পনার প্রথম চালই হল প্রথমে উত্তরাংশের ও পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলি দখল এবং জয় করা, এই ভূমিকান্তে আসবে আলোচ্য মহাসমেলের বাকী অংশটি গ্রাসের পাল্লা—পথে তিস্ত পড়বে, তারতে প্রবেশের ঘর হিমায়ে।

এতে সকল হলে ক্রমে ধাপে ধাপে সবচেয়ে দুনিয়ার প্রভু তাদের কেন যে আসবে না তা বলা কঠিন। এরপর আমেরিকার সমুদ্রবীন হতে হবে। অর্থাৎ, নিজের স্বযোগবতো সনরাটির জন্য স্ট্যালিন যদি আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ ঠেকিয়ে রাখতে পারে।

কোরিয়ার টুন্যানের চাল দেখে নলে হয় তিনি অবস্থাটি বুঝতে পেরেছেন, তবে শেষ ফয়সলায় পৌঁছাবার নতো শক্তি তাঁর আছে কিনা তা দেখতে হবে। যেসব প্রতিবেশ তিনি ধাব করছেন তা নলে হয় অসম্পূর্ণ ও বার্থ হবে, যেহেতু আকাশে এবং জলে চাড়া প্রকৃত সামরিক হস্তক্ষেপের এতে কোনো স্থান নেই। অবস্থা নলে হয় এই, তবে পৃষ্টি রাখতে হবে দিনে দিনে তা কী রূপ নেয়।

তবে একটা কথা পরিষ্কার, তা হল বাড়াবাড়ি রকমের আনড়াখাছি যদি দেখা দেয় এবং আমেরিকা যদি এখন কোরিয়া প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ত্যাগ করে তাহলে হঠাতে হঠাতে শেষ পর্যন্ত আর কুল পাওয়া যাবে না। কোথাও না কোথাও তাকে রুখে দাঁড়াতেই হবে, বুঝতে হবে যে নোংরা পাওয়াই দরকার, তাতে যুদ্ধ বাধে বাধুক।

নলে হয় স্ট্যালিন এখনই একটা বিশৃঙ্খলের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়। তা যদি হয় তাহলে পাঁচটা কিস্তি দিতে পারেন টুন্যান—হয় যুদ্ধের ঝুঁকি না হয় ছেড়ে পাও খাঁটির পর খাঁটি আমেরিকাকে। আপাতত নলে হচ্ছে এইটুকুই দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান অবস্থা যথাসম্ভব সামান্তিক।

জুন ২৮, ১৯৫০

যোগের প্রথম পাঠ

শ্রীঅরবিন্দ

॥ চৈত্যা-উন্মীলন ॥

প্রশ্ন “নারের আলাপ”-এ বা হৃদয়ের অন্তর নীরবতার মধ্যে প্রোত্খল এক অগ্নির উল্লেখ করেছেন। এই অগ্নিই কি চৈত্যা-সত্তা ?

উত্তর অগ্নিটা সত্তা নয়—এটা হ’ল চৈত্যিক অগ্নি, অতীন্দ্রের এক তীব্র অবস্থা।

প্রশ্ন চৈত্যাপুরুষের আসন কোথায় ?

উত্তর হৃৎ-চক্রের পিছনে, অন্তর গভীরে।

প্রশ্ন সনয় সনয় অনেকের প্রসঙ্গে বা বলেন যে অনেকের চৈত্যাপুরুষ বেশ ভাল। কিন্তু একথা কি ঠিক নয় যে সকলের চৈত্যাপুরুষই ভগবানের অংশ, সূতরাং সর্বদাই ভাল ? তবে কেন কেত্র বিশেষে বা পার্থক্য করেন ?

উত্তর চৈত্যাপুরুষের ক্রমবৃদ্ধি আছে—অনেকের মধ্যেই তা’ মনের ও প্রাণের বিধু সঙ্গকে কাটাবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী—আবার অনেকের মধ্যে তা’ অপেক্ষাকৃত অপরিণত এবং সেক্ষেত্রে বাধা বিঘ্ন ও প্রচুর।

প্রশ্ন যোগশক্তি কি প্রথমে চৈত্যা দিয়েই আসে ও মনের মধ্যে এক ক্রম পরিবর্তন এনে দেয় না ?

উত্তর : সম্ভব নয় না। অবিকাশ লোকই শুরু করে মনের মাঝে শক্তির ক্রিয়া দিয়ে—তখনই চৈত্যাপুরুষ সামনে আসতে সক্ষম হয়, যখন মন ও প্রাণ বেশ স্থানিকতা পরিবর্তিত হয়েছে।

প্রশ্ন : চৈত্যাপুরুষ কি প্রাণিক, মানসিক ও পারীৱিক সত্তার সাহায্য ব্যতীত আত্ম-প্রকাশ করতে পারে ?

উত্তর : মন, শরীর ও প্রাণ ত্রয় অতিব্যক্তিগত হয়। নিজের হতে বা নিজের মধ্যে চৈত্যপুরুষ স্বয়ং প্রকাশকের ভূমিকা নিতে পারে কিন্তু মূলের দ্বারে অতিব্যক্তিগত জ্ঞান সত্তার অন্যান্য অংশের সাহায্য অবশ্যক।

প্রশ্ন : মন ও প্রাণকে পরিবর্তিত না-করলে কি চৈত্যপুরুষকে জানেন বা না যায় না ?

উত্তর : না। তারা অপরিবর্তিত থাকলে চৈত্যপুরুষকে জানেন আসতে তারা বাধা দেয়।

প্রশ্ন : চৈত্যিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার পার্থক্য কি ?

উত্তর 'চিহ্ন' হচ্ছে নানাসামর্থ্য চেতনা, আশা বা পুরুষ, যা' সর্বদাই ভগবানের সঙ্গে অভিনু—আধ্যাত্মিক চেতনা হচ্ছে যা' সর্বদাই ভগবানের সঙ্গে নিত্য মিলনে বাঁধা কিম্বা অন্ততপক্ষে তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

চৈত্যা হল ভগবানেরই এক স্ফূর্তির যা' সর্বভূতে অধিষ্ঠিত, এবং জীব যতই বিবর্তিত হতে থাকে ততই তার মধ্যে তা' বৃদ্ধি পায় এবং ভগবান ও সত্যসম্বাদী চৈত্যপুরুষ বা অন্তরাত্মা হিসাবে অভিব্যক্ত হয় এবং যেখানে যা কিছুইর মধ্যে সেবা যার ভগবান ও সত্যকে, সেখানে তাকে স্বীকার করে।

প্রশ্ন ভগবান ও চিৎপুরুষের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর ভগবান সর্বময়, অকালের ভিতরেও তিনি আছেন। তিনি শুধু চিৎই মন, তিনি আবার মনে, প্রাণে এবং শরীরেও। মন প্রাণ ও শরীরের নিভৃত অবলম্বন যা তাই চিৎপুরুষ।

প্রশ্ন চৈত্যিক মূর কি অনেক আছে ?

উত্তর : না, একটাই।

প্রশ্ন কোনও ব্যক্তি, যার চৈত্যপুরুষ যথেষ্ট পরিণত নয়, সে কি তার প্রকৃতির প্রধান বিদ্যুৎগুলি অতিক্রম করতে পারে ?

উত্তর না, তার আপন শক্তিতে নয়; তার ভাগবত করুণার সাহায্যে সে তা' পারে।

প্রশ্ন : এক কথা কি সত্য যে চৈত্যপুরুষ যদি জানেন আসে, তবে যাবতীয় সমস্যা ও বিদ্যুৎ অতি নীচুই নাশ হ'য়ে যায় ?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : কি করে চৈতন্যপুরুষকে সামনে আনা যায় ? কুটিল গতি বা কর্তব্যের পরিহার করলেই কি তা' সম্ভব ?

উত্তর : এটাতো অভাবাত্মক পন্থা ; ভাবাত্মক উপায় হ'ল ভগবানের দিকে অনুরক্তি, ভক্তি, আত্মসমর্পণ।

প্রশ্ন : শারীর চেতনা বনমীর রাখলে কি চৈতন্যপুরুষকে সামনে আনা এবং সামনেই রাখা যায় ?

উত্তর : না, তা' বরং শারীর চেতনার ক্রিয়াকলাপ আধ্যাত্মিক ও চৈতন্য উন্নতির পরিধান।

প্রশ্ন : আমি আজকাল মাঝে মাঝে এক তীব্র দুঃখ অনুভব করি, যা' আমার চোখে অশ্রুর বন্যা নিয়ে আসে। তার মধ্যে কোনও উদ্বেগনা বা বিরক্তি নেই, বরং এক নীরবতা ও পবিত্রতা এবং অতল এক পাত্তীর্ষই সেই সঙ্গে আসে। একেই কি চৈতন্য দুঃখ বলে ?

উত্তর : হ্যাঁ, ওই শ্রেণীর এক চৈতন্য দুঃখ আছে—কিন্তু চৈতন্য অশ্রু যে সব সমর দুঃখের হবে তার কোনও নান্দে নেই, আবেগের ও আনন্দের অশ্রুও আছে।*

* Elements of Yoga থেকে

মানের সঙ্গে কথা

[প্রবন্ধ]

(১)

প্রশ্ন মানের ব্যাপী থেকে—“প্রত্যেক সত্তার বা মূল বস্তু তা ভগবানের সঙ্গে এক বিশিষ্ট সম্পর্কযুক্ত, তাই তার ভিতর দিয়ে ভগবানের বা অভিব্যক্তি হবে তাও হবে ঐক্যপই বিশিষ্ট।” এর বিশদ ব্যাখ্যা ?

উত্তর : ভারতবর্ষে সেই জিনিসকেই বলা হয়েছে সত্তার সত্য, তার সূত্র, তার ধর্ম, ব্যক্তিসত্তার কেন্দ্র কারণ।

প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে তার নিজস্ব সত্য বা কেবল তারই, তার আপন ভাবে আপন ব্যক্তির আপনার মধ্যে বিকাশ পেতে চলেছে। কিন্তু কী সেই সত্য ?

আবার কাছে তোমরা প্রশ্ন করছ, “সত্তার এই সত্যটি কেনন, আর কেনন তাতেই তা ব্যক্তির জীবনে রূপায়িত হয় ?”

প্রণালীটা এইরূপ প্রত্যেক সত্তার এক বিশিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে মূলেন সঙ্গে, যদি স্ববস্তুর সঙ্গে, তাৎস্ব স্বষ্টির বা উৎসে। ভগবানের সঙ্গে সেই বিশিষ্ট সম্পর্কটি ধরেই প্রত্যেকের বিকাশ হবে তারই অনন্য ব্যক্তিতে। অতএব প্রত্যেকেই রয়েছে সদাসম্মিভাবে ভগবানের সঙ্গে একরূপ বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ, যা তার পক্ষে একান্ত নিজস্ব। তোমার গ্রহিষ্ণুতা থাকলে সেই সম্পর্কেরই সম্পূর্ণ ফল তুমি গ্রহণ করতে পারবে, তোমার পক্ষে বস্তুর সত্ত্ব,—যা কোনো কিছুই অংশমাত্র নয় বা কোনো জিনিসের পুনরুৎপাদন নয়, তা হবে এক অদ্বিতীয় জিনিস যা কেবল তোমার সেই বিশিষ্ট সম্পর্ক থেকেই গড়ে উঠবে। ইতরায় বস্তুবস্তুর দিক থেকে সেখানে ভগবানের সঙ্গে যেখানে তোমার ঐ বিশেষ সম্পর্ক সেখানে তুমি অনন্য।

প্রত্যেকেই ভগবানের সঙ্গে একক হিসাবে মিলিত (এটুকু না আরো যোগ করে দিলেন ১৩ই মে ১৯৬২ তারিখে)।

তোমার সঙ্গে ভগবানের যে সম্পর্ক তার কোনো ছোড়া বিনয়ে না, সেটির আর দ্বিতীয় নেই। দুজনের জিনিস কখনো এক রকমের হয় না, তাই এমন কখনো হতে পারে না বা তোমার জিনিস থেকে একটু কিছু নিয়ে অপরকে তা দেওয়া গেল। স্বষ্টি হতে সে সম্পর্কটি বাদ গেলে একেবারেই তার অস্তর্ভূমি হকে—যা হওয়া অসম্ভব।

তাই যখন তুমি আপনার সত্তার সত্তোর মধ্যে রয়েছে তখন তুমি সৃষ্টির এক অপরিহার্য অংশ। তার মানে ভেবেনা যে তোমরা জীবনে নিজেরা যেমন ভাবে থাক। সমুচিত মনে করো তেমনভাবে থাকার কথা আমি বলছি : তা নয়, আমি বলছি নিরুপ সত্তার সত্তোর মধ্যে থাকার কথা। ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে উঠতে যদি তুমি ভিতরকার সেই সত্তোর নাগাল পেয়ে যাও, তখনই দেখতে পাবে ভগবানের সঙ্গে তোমার কি বিশিষ্ট সম্পর্ক, যার কোনো দ্বিতীয় নেই, যার নতুন আর কোনোটাই নয়।

এই হলো বোট কথা। বলা বাহুল্য তোমার সত্তার ভিতরকার সেই সত্তাটিকেই তুমি আপন জীবনের মধ্যে তেমনি বিশিষ্টভাবেই বিকশিত করে তুলবে।

(২)

একজন আমার কাছে নানিশ জানিয়েছে যে আমার সেওয়া প্রতিশ্রুতি নাকি রক্ষিত হয়নি, আমি সে প্রতিশ্রুতি কতকটা হানুকাভাবে দিয়েছিলাম! (এমনও হতে পারে যে আমি মানুষের কাছে যা প্রত্যাশা করেছিলাম তা সন্তোষের অতিরিক্ত—ঠিক বলতে পারি না। হয়তো তাই ছিল অস্পষ্ট ধারণামাত্র।)

আমি বলেছিলাম এই কথা যে, তোমরা আশ্রবসানীরা অভিমানন অবতরণের কথা জানতে পারবে। সূতরাং যখন তা ঘটছিল তার আগে যে আমি সে কথা কিছু জানাইনি এ সোম কেউ আমাকে দিতে পারে না, কারণ আমি কিছুই নুকিয়ে রাখিনি। সকলেই তার মধ্যে অংশ গ্রহণ করতে পারতো, আমি কাউকেই আটকাইনি। বরং আমি সকলকে বলে রেখেছিলাম যে নিজেরা নিজেদেরকে খুলে রাখতে চেষ্টা করো, যাতে সে জিনিস এলে তাকে গ্রহণ করে লাভবান হতে পারো।

আরো এ কথা আমি বলেছিলাম (ইংরেজী ভাষাতেই) যে, “সেই মুহূর্ত হতেই অপাত্তনকারী ভগবৎ কৃপার কাজ খুব ব্যাপকভাবে সক্রিয় হবে।” সে কথা যে নিশা বলেছি তা কি কেউ বলবে ?

কিন্তু এখানে একটু গুণগোল রয়েছে...আমি তার সঙ্গে আরো এই কথা বলেছিলাম, “যারা প্রকৃত আশ্রুহ পোষণ করছে তাদের পক্ষে এটা পরম সৌভাগ্যের কথা (যদিও হয়ত এই কথাটিই না নিজে থাকি তাতে কিছু যায় আসে না)—যে এই আনন্দের ভবিষ্যৎ তাদের পক্ষে নিশ্চয় স্কলরে; বিরোধী মানবপ্রকৃতি বতই কেন বাধার সৃষ্টি করুক। ” এখনও আমি তাই বলি, সেই আশাই করে থাকি।

কিন্তু আমার এই প্রশুকারী এখানে অবৈধ হয়ে বলতে চাইছে, “তবে কেন অবিকাপ সাধকের বেলাতে বাধাবিপত্তির রাজ্য বরং আরো বেড়ে উঠছে ?”

তার অবাধে বসি, এমনও হতে পারে যে তোমাদের এই বাধানিষিদ্ধিগুলো আগেও ছিল, কেবল তখন তা এতটা কঠিনও প্যারেনি, এখনও সেগুলোকে উদ্‌গোহন আরো স্পষ্ট ক'রে আসতে পারছ? আর তাতেই সেগুলোকে এখন বেশী বিরক্তিকর বনে চলেছে? তার জন্যে অভিনয়স কেন শরী হবে, সে তোমাদের নিজেদেরই ক্রটি? অভিনয়স তোমাদের এখন আলো দিচ্ছে, চোখের সামনে আরনা বরছে, তাই সব কিছুকে আগের চেয়ে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাচ্ছ; আর বিরক্তির জিনিস দেখে তাই এখন চটে উঠছ (হাস্য)।

প্রশ্নকারী তবুও বলতে চাইছে, “বিরোধী মানবশ্রুতিতে বাধানিষিদ্ধি থাকা সত্ত্বেও কি অভিনয়স শক্তি তার নিজের কাজ করতে পারে না?” নিশ্চয় পারে, আর তাই তো আমি প্রত্যাশা করি। নইলে এখানে কোনো কিছুই করার থাকে না, জগতের পুনরুদ্ধারই হয় না। কিন্তু তোমাদের কাছে কেন যে এটা কঠিন লাগছে তা আগেই বলান। তোমরা এখন আগের চেয়ে বেশী সচেতন হয়েছ বলেই আগে যা নজরে বিশেষ পড়তনি তা এখন নজরে পড়ছে।

এর আরো একটি কারণ আছে। কার্যকরী দিব্য শক্তি বতই বেশী প্রবল ও দুনিয়ার হবে, বিরোধী শক্তিয়াও ততই বেশী জোরে তাকে বাধা দিতে চাইবে। কিন্তু এখানে একটা কথা তোমাদের বসি, যদিও তা শুনতে হয়তো ভালো লাগবে না,—তোমাদের এই সব ছোটোখাটো বিপত্তি আর অসুবিধা আর ভোগান্তি কিংবা তার চেয়েও বড়ো কিছু শেষকৃষ্টি-গুলোর মোহকে জড়িয়ে নিয়ে তাতেই ক্লিষ্ট এবং কাবু হয়ে না থেকে, একবার অপর দিকটার পানে চোখ চেয়ে দেখ,—চেয়ে দেখ যে উচ্চশক্তি তার চেয়েও আরো কত প্রবল, ভগবৎকৃপা আরো কত সক্রিয়, উপর থেকে আরো কত জোরালো সাহায্য আসছে,—অর্থাৎ একেবারে অহংগতিবদ্ধ ও আত্মগত হয়ে না থেকে ধার্মিক ব্যাপকতর দৃষ্টি নিয়ে নিত্যস্থ ব্যক্তিগত ভাবনাটুকু ছাড়া আরো অন্যান্য জিনিসকে চিত্তের অন্তর্ভুক্ত করে নাও, তাহলে ইঙ্গুপ দৃষ্টিভঙ্গীটা ক্রমশঃ বদলে যাবে।

এই জিনিসই তোমাদের করতে বসি। আমার কথা শুনে এই ওষুধটি আগে নিজের প্রয়োগ ক'রে দেখ, তার পরে আবার এ সম্বন্ধে আলোচনা হবে; কেবল নিজের ভাবনা নিয়েই অন্ত বেশী ক'রে ভেবোনা।

যদিও ঐ সমস্যায় তোমাদের কাছে সব চেয়ে জরুরী আর একান্ত নিজস্ব বলে বনে হচ্ছে, কিন্তু চিত্তকে নিযুক্ত রাখার নত্যা ওটাই সব চেয়ে বড়ো জিনিস নয়।

(৩)

এখানকার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে ব্যারান ও খেলাধুলার কি সম্পর্ক সেই সম্বন্ধে তোমরা

প্রশ্ন করছে, আর সাধনপন্থাৰে আনাদের কার্যপদ্ধতির কি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি সে সম্বন্ধে তোনরা জানতে চাও। কিন্তু এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ নিজেও যথেষ্ট নিবেদিতেন আন আনিও বায়ে বায়ে অনেক কিছু বিশেষ তোনাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তা তোনাদের চেষ্টানার মধ্যে প্রবেশ করেনি।

তোমরা যা কিছু ডাৰো আর যা কিছু ক'রে থাকো তার বিরুদ্ধে আনি কোনো সংগ্রাম শুরু করতে চাই না,—কেবল এইটুকু বুঝে দেখতে বলি যে গতানুগতিক পথে চলার বদলে, অন্যভাবে যা করা হচ্ছে তারই নকল করতে থাকার বদলে, বাপ পিতানহ ও প্রপিতানহেরা এবং আত্মীয়স্বদের পূর্বপুরুষেরা যা ক'রে এসেছেন এবং যাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে এসেছেন তার বদলে, কেনই বা আমরা এই নতুন পথে চলছি।

এটা অবশ্যই আনি অস্বীকার করিনা যে প্রকৃতি মানবতাত্ত্বিকে এমনি দুটি বিভিন্ন পর্যায়ে গড়েছে তার নিম্নেরই কোনো বিশেষ প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্য অনুসারে, আর সেই কারণেই সে এই বিভিন্নতার মধ্যে তদনুরূপ চালচলন ও বৃত্তিরও আয়োগ করেছে। কিন্তু তাকে “স্বাভাবিক” বনব না, প্রকৃতি এ স্বীতি অবলম্বন করেছে বলেই তাকে “স্বাভাবিক” আখ্যা দেওয়া ঠিক হয় না।

সে যাই হোক, কিন্তু কেবল একবার মাত্র নয়, শ্রীঅরবিন্দ এবং আনি দুজনেই বহুবার বহুভাবে বলেছি যে এখানে আমরা অন্য কাউকে অনুকরণ করতে চাই না কিংবা অন্যদের মানুষী পদ্ধতির অনুসরণ করতে চাই না। বিশেষ করে আনাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সেই কথাটাই স্পষ্টভাবে কাজে ও মগ্ৰনাং করেছি। তোমরা যেন কিছু মনে কোরো না, কিন্তু তোনাদের মধ্যে যারা এসেছে বাইরে থেকে অনেককাল কাটিয়ে আর বাইরের অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে, তাদের পক্ষে হঠাৎ এখানে এসে এই নতুন মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বাপ খাইয়ে চলা হয়তো কিছু কঠিন হয়েছে,—কিন্তু যারা শিশুকাল থেকে আছে, যারা আগে একটু বিগড়ে গিয়ে থাকেনও বাপনারের গতানুগতিক শিক্ষা ও সংস্কারাদির দ্বারা খুব বেশী প্রভাবান্বিত হতে পারেনি, তাদের চেষ্টনাকে এই সত্যের পথে চালিয়ে বিশেষ সফল পাওয়া গেছে।

বস্তুত এ নিয়ে আনাদের কোন করবার কিছু নেই, কারণ আমরা এর স্পষ্ট প্রমাণ পেরেছি যে ঠিকভাবে কাজ করতে জানলে আমরা যা চাইছি তাই হবে।

আমরা এই কথাই বলি যে অভিনু অবস্থার মধ্যে রেশে যদি পুরুষ ও বেরেদের অভিনু রকম শিক্ষা দিয়ে তাদের একই রকম সত্ত্বাত্মতার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর ভেদ আনবার কোনো প্রয়োজন থাকে না। আমরা বলি যে মানুষ যাত্রই সেই একই আকারে অভিব্যক্তি। আর পূর্বে বলেছি যে প্রকৃতি যদিও তার নিজের উদ্দেশ্য নিয়ে নিজের প্রয়োজনে একটা এমন প্রভেদ এনে থাকে, তাই বলে আমরাও যে তাতে সজ্ঞভাবে সার দিয়ে চলব এমন কোনো কথা নেই। আনাদের নিজেদের প্রয়োজন এবং

উদ্দেশ্য যদি তার চেয়ে অসামান্য হয়, তাহলে শ্রুতির ঐ দুই ধরনের উদ্দেশ্যকেই আমরা চমক বলে মানবো না, মানব-চেতনাকে আরো ভালো করে অভ্যস্ত করে ফেলাবার জন্য আমরা অন্য রাস্তা ধরবো।

হাইন্সের লোক যারা এসেছে তাদের হাইন্সের ধারণাগুলি নিয়ে, তারা শত শত ব্যরই আমাদের এই প্রশ্ন করেছে “ছেলেদের ও মেয়েদের একই রকম শরীরচর্চার নিয়ম কেন এখানে করছেন?” কেউ কেউ একে মনে করে খুবই কলঙ্কের কথা, আমরা কেউ কেউ মনে করে যে বাস্তবের ঠিক থেকে খুবই ভুল কাজ করা হচ্ছে। “ছেলেদের থেকে মেয়েদের আলাদা দৃষ্টিতে দেখা হবে না কেন?”...আর সম্মেলনেই সেই অকাটা যুক্তি, “বেহেতু সব জায়গাতেই তাই করা হয়ে থাকে”।

অশেষ ধমাবাদ। কিন্তু আমি বলি, তবে আমরা এমন আশ্রম করলাম কেন? এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে গেলাম কেন? সব জায়গাতেই যা করা হয় তাই করবার জন্যে আমাদের এত কিছু আয়োজনের দরকার ছিল না, কারণ সে রকম কাজ আমরা করবই তাদের চেয়ে ভালোভাবে করতে পারব না।

লোক যখন আমার কাছে ঐ যুক্তির কথা বলে, তখন তারা বোঝে না যে ওর চেয়ে বোকার মতো যুক্তি আর কিছুই নেই। সর্বত্রই তাই করা হচ্ছে! কিন্তু ঠিক সেই কারণেই এখানে তা করা হবে না কারণ তা যদি আমরা করি তাহলে সে কাজের কোনোই দান থাকবে না। জগতে যা হয়নি এমন কিছুই আমরা এনে ফেলাতে চাই। জগতের পুরোনো অভ্যাসগুলোকেই যদি আমরাও টেনে নিয়ে চলি, যদি সেই সব নিয়ম আর সেই সব প্রণালীর পুনরাবৃত্তি এখানেও করে যেতে থাকি, তাহলে সেই একই ধানের মধ্যে আমরা গড়ে থাকব, নতুন কিছুই হতে পারবে না।

আমার সব ছেলেদেরেরা, ছোমাদের আমি কত ভাবে কত রকম করে প্রভাববান একথা বলেছি “এখানে থাকার পুরো সফল যদি ছোমরা পেতে চাও, তাহলে উচ্চতর ও গভীরতর ও ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গী এনে একটু নতুনতরো ভাবে সব কিছুকে দেখতে চেষ্টা করো, কেবল আজকের দিনের কথাই নয় কিন্তু অতঃপর একদিন যা হবে তারও কথা। আমরা সেই ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে চাইছি বলছি এই বিশেষ রকমের নোভোভাবটি নিয়ে কাজ করছি।”

শুটাই ছোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি যে আমরা প্রত্যেকভাবে বাস্তব প্রমাণ পেয়েছি যে আমরা এ বিষয়ে ঠিক কাজই করছি। অর্থাৎ কলচা দ্বারী হচ্ছে না। তার কি কারণ? কারণ এই যে আমার মামুলী চেতনাকে কিংবা বাওয়া খুবই সহজ, শিঁড়ির মাথার ঊঠতে পারলেও সেখানেই দ্বারী থেকে জগৎকে দেখা খুবই কঠিন।

শ্রুতির হকুম আমরা মানতে চাইছি না, যদিও ওর পিছনে হাজার হাজার বছরের অভ্যাস ও বাধ্যতা জমা হয়ে আছে। তথাপি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে শ্রুতির যে যুক্তি,—

“বরাবর এইই চলে আসছে”, এর মধ্যে সত্য নেই। প্রকৃতি চাক বা নাই চাক, পরিবর্তন আসবেই। এমন দিন আসবে যখন লোকের বলবে, “হাঁ, আগেকার দিনে ঐরকমই ছিল বাটে, কিন্তু এখন হয়েছে অন্যরকম।”

অন্ততপক্ষে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে এই কথা যেমন লাগে যে আনন্দের সেই পরিবর্তনের অবস্থার মধ্যে হাজির হয়েছি, এমন একটা দরকারের মধ্যে এসে পড়েছি যখন অগৎ এক নতুন স্বাভাবিক দিকে মোড় নিয়েছে। এখন কেবল এই চাই যে ঋণিকটা শ্রদ্ধা বিশ্বাস নিয়ে এর দ্বারা নিজেদের পরিচালিত হতে লাগে। নতুন এখানে থাকার যে স্বযোগ মিলেছে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই হলো বোট কথা। তখন আবার বাইরের সেই সব মানুষী দুর্বলতা ও অভ্যাসগুলিকে নিয়েই জীবন শুরু করতে হবে।

[এখানে মায়ের দিখিত পুস্তিকা “To women about their body” থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হচ্ছে, যা লেখা হয়েছিল কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরে :]

ইশুরের সোমসই, তোমরা কি এ কথাটা ভুলতে পার না যে আমি ছেলে কিংবা মেয়ে ? তার বললে আমি শুধু মানুষ, এ কথা কি ভাবতে পার না ?

প্রশ্ন : মেয়েদের পক্ষে দেহচর্চার আদর্শ কেনন হবে ?

উত্তর : মেয়েদের বেলা আলাদা আর ছেলেদের বেলা আলাদা, তাই বা কেন হবে তা বৃত্তি না। দেহচর্চার দরকার দেহকে সাবলীল ও সামন্ত্যাপূর্ণভাবে শক্তিশালী করার জন্য, তার কর্মপটুতা ও সহনশীলতা বাড়ানোর জন্য, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রাদির ক্রিয়াকে সুসংযত করার জন্য, এবং তাকে চেতন ইচ্ছার অনুগামী নির্মিত যন্ত্রে পরিণত করার জন্য। সকল মানুষের পক্ষে এই একই কথা, সুতরাং মেয়েদের জন্য একই রকম ছাড়া যত্নে কোনো নিয়ম থাকতে পারে না।

প্রশ্ন : নতুন জীবন এলে তাতে পুরুষ ও স্ত্রী কেনন অংশ গ্রহণ করবে ? তাদের মধ্যে কেনন সম্পর্ক হবে ?

উত্তর : তখন তাদের মধ্যে প্রভেদ করারই বা কি দরকার ? সকলেই যখন সমান মানবসত্তা, সকলেই সমানভাবে চেষ্টা করবে ভগবৎ-কর্মের উপযোগী যন্ত্ররূপ হতে। সেখানে যৌনভেদ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ, দেশভেদ, কোনো কিছু থাকবে না। সকলে একই অঙ্গীকার মায়ের সম্মান, একই শাপুত পুরুষের সঙ্গে মিলন-প্ররোগী।

প্রশ্ন : মেয়েদের দেহসৌন্দর্য সম্বন্ধে কি আদর্শ হবে ?

উত্তর দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে একটা পরিপূর্ণ সামগ্র্য থাকবে, ভেনি সামান্য শক্তি থাকবে, শক্তির সঙ্গে সোজা থাকবে, নবীনরত্নের সঙ্গে সহনীয়তা থাকবে, আর সব চেয়ে বড়ো কথা অস্ত্র নির্মল পাকার ফলে স্বাস্থ্যও অটুট থাকবে, জীবনের উপর অসীম আস্থা ও ভগবৎ-স্বপ্নার উপর অটল বিশ্বাস থাকবে।

পরিশেষে বলি (এই পুস্তিকার শেষ ছত্রে লেখা)

জেনাবা প্রশ্ন করাতেন এই সব কথা বললাম, কিন্তু তাই বলে গোঁড়ামি করে এগুলিকে নীতিসূত্র করে নিও-না, তাহলেই এর ভিত্তিকার সত্য নষ্ট হয়ে যাবে।

(৪)

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন “ভিতরে প্রস্রবিত করতে হবে চৈতন্যের অগ্নিনিখা, তাতে সব কিছুই অধঃস্থিত দিতে হবে, এমন কি দিবা নানটি পর্যন্ত” (The Synthesis of Yoga, VI p.187)। চৈতন্যের অগ্নিনিখা কি সর্বদাই প্রস্রবিত নয় ?

উত্তর না, সর্বদাই প্রস্রবিত নয়।

প্রশ্ন তাহলে কেমন ক’রে তাকে আনাতে হবে ?

উত্তর তোমার আশ্রয়স্থান দ্বারা, এগিয়ে যাবার আগ্রহের দ্বারা, পূর্ণজানাজের প্রয়োগের দ্বারা। বিশেষ ক’রে নিজের উদ্ভূতিবিধান ও বিচ্ছিন্নকরণের ইচ্ছার বেগেই চৈতন্যের অগ্নিকে প্রস্রবিত করে। যাত্রা আধ্যাত্মিক উদ্ভূতি ও বিচ্ছিন্নের দিকে দৃষ্টিতে আপন ইচ্ছাকে নিয়োজিত রাখে, তাদের অন্তরে ঐ অগ্নি আপনা হতেই প্রস্রবিত হয়।

তোমার যা-কিছু সোষকটি আছে আর যা-কিছু উদ্ভূতি তোমার কান্য, সমস্তই নিক্ষেপ করবে ঐ অগ্নিতে, তাহলে তা আরো তীব্রভাবে গড়ন তেজে মনে উঠবে। এ কেবল স্লপক বাক্য মাত্র নয়, সূক্ষ্মদেহের ভরকের এ হলো বাণ্যব সত্য। নিজের মধ্যে সে অগ্নির উদ্ভাপও তুমি অনুভব করবে, সূক্ষ্মপৃষ্ঠিতে তার আলোকও তুমি দেখতে পাবে। তোমার প্রকৃতির মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে যা তোমার অগ্রপতির অন্তরায়, তাকেও সেই অগ্নিতে নিক্ষেপ করো, সে অগ্নির লিখা তাতে আরো বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

আর কিছু প্রশ্ন আছে ?

প্রশ্ন : যখন কষ্টপীড়া ভোগ করছি, তখন কেমন ক’রে আনন্দ বা বাহুব অনুভব করব ?

উত্তর যদি সে কষ্ট ভোগার ব্যক্তিগত অহংসম্প্রদায় হয় তাহলে তাকেও আহুতি দাও এই বিগ্ৰহীকরণে অধিকৃত, তাহলে তখনই কিছু পাবে এটিতে যাবার আনন্দ। আর যদি ঐকান্তিকভাবে প্রাণ কষ্টে পড়ো তাহলে দুঃখেরও সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের সময় উঠবে।

বস্তুত এতে দৃষ্টান্ত হয়ে কেউ করতে থাকার বললে এমনি কান্নাই করা উচিত। দুঃখকেও নিবেদন করে দিয়ে যদি তুমি ঐকান্তিকভাবে চাইতে থাকো রূপান্তর ও বিগ্ৰহীত তবে তাতেই যন্ত্রের গভীরে আনন্দ দেখা দেবে। সেই কষ্টদুঃখ যতই নৈতিক হোক, তথ্যনি এতে সাফল্য পাবে। তখন দেখবে যে দুঃখটা যতই কেন তীব্র হোক, তুমি আর পিছনে সরেছে এক দিবা আনন্দ।

(৫)

প্রশ্ন আমার মধ্যে চেতনভাবে কোনো গুহ্যশক্তি না থাকলেও কি আমি সুরক্ষিত কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য দিয়ে রক্ষা করতে পারি না? তার জন্য কিরূপ উপায় থাকতে পারে? চিন্তাশক্তির জোরে কতখানি কাজ হতে পারে?

উত্তর এখানে ওটা উপায়ের কথা কিছু বলতে চাইনে, যদিও বস্তুত অসুখ অগতির সব কিছুই ঘটে থাকে গুহ্যশক্তিতে। তবে এর পক্ষে দুটি উপায় আছে, সে দুটি পরস্পরের সহায়ক ও পসিপুরক, তাকে ভোগার মূল্যবত স্বভাবভাবেও কাজে লাগাতে পারো।

অথবা চিন্তার ক্ষেত্রে তার একটির পক্ষে নিজস্ব প্রয়োজনীয় অস্ত্রস্বরূপ। আরি ভোগনের অনেকবার বসন্ত যে চিন্তাকে যদি স্মৃতিশক্তি ও হৃদয়ভাবে প্রয়োগ করতে পারো, তাহলে তার দ্বারা একটি বিশিষ্ট নবোন্মেষ বস্তু রচিত হয়, যার সঙ্গে তার উদ্যোগের কোনো আর সম্পর্ক থাকে না, সে বস্তু তার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গ্রহণ করে নবোন্মেষ সত্তা আপন সার্থক ক্রিয়া করতে পারে (অথবা তাকে তুমি চোখে দেখবে না, কিন্তু দেখানে দিয়ে সে কাজ করবে তার স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে)।

কোনো এক মুহূর্তে উদ্দেশ্য নিয়ে যদি তুমি চিন্তার দ্বারা তেমন একটা জিনিস পড়ে জোলে, তাহলে তুমি পূর্ণোপরি তাতেই লেগে থাকবে সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে। স্বভাবতঃ যদি তুমি দূর থেকে কাউকে কিছু সাহায্য দিতে চাও, তাহলে দেখাবে যে ফল তুমি পেতে চাইছ সেই জিনিসটাকেই আপন মনের মধ্যে বিশেষ রূপ দিয়ে অত্যন্ত মুহূর্তে ও হৃদয় ভাবে পড়ে তুলতে হবে। তাতেই তেঁতার উদ্দেশ্য সফল হবে।

তবে তার কাজ জোরালো হবে কিনা সে কথা বলতে পারি না, কারণ নবোন্মেষ দ্বারা

এমন আরো অসংখ্য জিনিস পড়া হয়ে থাকতে পারে যা গুর বিরোধী, তাহলে তার ফিরার সঙ্গে ওর কাটাকাটি চলতে থাকবে, এবং বুটিন মধ্যে খোঁচ বনবান তারই জিৎ হবে।

কিন্তু তোমার ঐ বিশিষ্ট মানসিক পঠনকে যথেষ্ট শক্তি ও গতি দিতে পারে? তা হলো তোমার আবেগ ও ইচ্ছার প্রাধান্য। ঐ শুভ ইচ্ছার মধ্যে যদি তেমন তীব্রতা, প্রচণ্ড আবেগ, প্রেম ও প্রসাদের স্বতঃশীলা এবং বৈদ্যুতিক গতিবেগ আরোপ করতে পারে তাহলে বাড়ব সাফল্যের সম্ভাবনা যথেষ্টই থাকবে। এই হলো এক উপায়। এটি সকলেরই সাধারণ মধ্যে, যদি তুমি চিত্তায় তেমন জোর দিতে জানো ও ভালোবাসতে জানো। কিন্তু আগেই বলেছি, এর শক্তি সীমাবদ্ধ, আর বনোজপতে এর অনেক প্রতিরোধ ঘটতে পারে।

কিন্তু অপরপক্ষে চোনের দিকে ঘাটতি থাকলেও যদি কৃপার উপর তোমার শ্রদ্ধা বিশ্বাস থাকে, যদি তোমার মনে এ বিশ্বাস থাকে যে ভগবৎকৃপা বলে এমন কিছু আছে যা আত্মরিক প্রার্থনা ও আবেশন ও আশুহার ডাকে বাস্তবিক শক্তি দেয়,—তাহলে তোমার ঐ মানসিক শুভ ইচ্ছার জিনিসটিকে গড়ে তোমার সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে ভগবানের কৃপার কাছে সমর্পণ করে বলো যে তিনিই এর উপায় করুন; তোমার মনে যদি তখন এমন বিশ্বাস থাকে যে উপায় তিনি কিছু করবেনই, তাহলে প্রকৃত সাফল্যের সম্ভাবনা নিশ্চয় থাকবে।

এইভাবে চেষ্টা করে দেখো, ফল কিছু নিলবেই।

প্রশ্ন কিন্তু না, যদি কেবল কৃপার কাজের জন্যই ঐকান্তিক প্রার্থনা করি, তাহলে তারও তো কিছু হুনিচিহ্ন ফল হবে, নয় কি?

উত্তর না, কখনও হচ্ছে, তা নির্ভর করবে তোমার প্রার্থনার প্রকৃতির উপর।

ভগবৎকৃপাকে আহ্বান করে যদি তারই উপর সমস্ত ভার দিতে চাও, তাহলে সেখানে তোমার ইচ্ছানত ফলের প্রত্যাশা করতে পারে না। তেমন নির্দিষ্ট ফলটি পেতে হলে প্রার্থনার দ্বারা সেই জিনিসই তোমাকে চাইতে হবে। কৃপার জন্যই যদি তোমার জোর আশুহা থাকে, আর নির্দিষ্ট কোনো কিছু না চেয়ে যদি সেই কৃপাই কেবল চাইতে থাকো, তাহলে কৃপাই সেখানে স্বাধিকর্তব্য নির্ধারণ করবে, তুমি নয়।

প্রশ্ন তাই কি সব চেয়ে ভালো কাজ নয়?

উত্তর ও, তাহলে তা কিন্তু আলাদা কথা হয়ে যাচ্ছে। হয়তো খুব বড়ো কথাই হয়ে গেল। কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু ফল পেতে চাইলে সেটাই আগে তোমাকে গড়ে নিতে হবে। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যদি কৃপাকে আহ্বান করো, তাহলে সেই উদ্দেশ্যকে স্থপ্টি পঠন দিয়ে সেটিকে কৃপার শপুখে হস্তান্তর করতে হবে।

অবশ্য যদি তুমি পূর্ণ-সমর্পণের ভাব নিয়ে নিজেকে কৃপার কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন ক'রে দিয়ে বলতে পারো যে তার বেদন ইচ্ছা তাই হোক—তাহলে তা খুবই উত্তম কথা । কিন্তু সে ক্ষেত্রে তোমার আর কোনো সনাক্ষোচনা করা চলেবে না । তখন আর বলতে পারবে না, “আমি অসুখ ভিনিগটা আশা করেছিলাম ।” কারণ যদি তোমার ভেদন কিছু পাবার আশাই থাকে তাহলে আয়তনিক ও সরলভাবে সেই ইচ্ছাটিকে গঠন দেওয়াই ভালো । কৃপার ডরকের তখন কাজ হবে সেই ইচ্ছাকে সফল করা হবে কিনা তারই নির্ধারণ করা ; তোমার ডরকের কাজ সেটি শষ্ট ক'রে বলা । তাতে সোম নেই ।

সোম হয়ে ধাঁড়ায় সেইখানে যেখানে তোমার প্রার্থনার পূরণ না হওয়াতে তুমি বিরোধ প্রকাশ করো । সেটাই তুল করা হয় । সেখানে তোমার বোঝা উচিত যে তোমার ইচ্ছা বা আশুনা হরতো যথেষ্ট প্রফুল্লিত হয়নি, কিংবা যা তুমি চেয়েছিলে তা তোমার পক্ষে বহনের নয় । তখন তাই বুঝে তুমি বলবে, “বেশ তবে তোমার যা ইচ্ছা তাই হোক ।”

কিন্তু যখন তোমার অস্তরের মধ্যে একটা কিছু ধারণা এবং কাননা রয়েছে তখন তাকে শষ্ট ক'রে গড়ে তুলতে কোনো বাধা নেই, যেহেতু তাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । মনে করো যদি তুমি এমন কিছু গঠিত কাজ বা সোমের কাজ ক'রে থাকো বা তুমি যথার্থই আর করতে চাও না—তাহলে তা জানাতে কোনেই বাধা থাকতে পারে না । সেজন্যে যদি তুমি ঐকান্তিকভাবে সাহায্য চাও, তবে সে প্রার্থনা তোমার গ্রাহ্য হবে ।

ভগবান তোমার সঙ্গে পরীক্ষা করতে চান এ কথা যেন ভেবো না । তেমন বতসব তাঁর একেবারেই নেই : তবে কিসে তোমার ভালো হবে সে কথা তোমার চেয়ে তিনি জানোই বোঝেন, তোমার আশ্চর্য্যকে যেখানে বাধা দেওয়া অনিবার্য কেবল সেখানেই তিনি তা ক'রে থাকেন । নতুবা প্রার্থনা বহুর করতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত ।

আর কিছু জানবার আছে ? প্রশ্ন খিটে গেল তো !

(নীরব থেকে)

এখানে তিনটি উদ্ধৃতি দিয়ে আবারে তা ব্যাখ্যা ক'রে দিতে বলা হয়েছে । এর মধ্যে শেষেরটি আনাত্তের পূর্বানোচনার বিষয় নিয়ে । তাই এটিকেই ধরেই শুরু করা যোক ।

প্রশ্ন “কৃপার সঙ্গে যখন আমার বিলম্ব ঘটবে, সর্বত্রই যখন সেই কৃপাকে প্রত্যক্ষ করতে থাকব, তখন জীবনও হয়ে উঠবে বৃহৎ এবং তা হবে তেজে ও আনন্দে পরিপূর্ণ । তারই ফলে তখন ভগবৎ-উদ্ভিষ্ট কর্ণে সর্বোত্তম সহযোগিতা করা যাবে ।”

উত্তর : এর মধ্যে প্রথম কথাটির উপলব্ধিতে আসা সহজ কথা নয় । নিত্য সচেতন উন্মুক্তি প্রভাসের দ্বারা এবং নিত্য পর্ববেক্ষণ ও জীবনানুভূতির দ্বারাই তা হতে পারে ।

এ কথা তোমাদের বহুবার বলেছি,—যেমন জ্বিনিস জোমরা ইচ্ছা করো বা যেমন হলে ভালো হয় বলে জোমরা ভেবে থাকো, তার বিপরীত কিছু হতে দেখলেই জোমরা প্রায়

খুব দুঃখের সঙ্গে বলে থাকেন, “তার এমন না হয়ে যদি এমন হতো তাহলে যে কতই ভালো হতো।” তোমাদের ডোঁটো বড়ো সকল বিষয়েই এমনি অভিমত হয়। কিন্তু তার পরে কত বছর পার হয়ে যায়, কত ঘটনাবলী ঘটে যায়; ততদিনে নিজেদের অনেকটা উন্নতি ঘটে, আরো চেতনা পেয়ে সব কিছু আরো ভালো ক’রে বুঝতে শেখো, তখন একদিন হঠাৎ পিছনের দিগের দিকে ফিরে চেয়ে প্রথমটা অবাক হয়ে যাও,—তারপর হানিনুর্বেই স্বীকার করো যে আগেকার সেই স্নহবীর ঘটনাটি থাকে তুমি নিতান্ত অবাকিত ও পূর্তাগোয় বলে বনে করেছিলে, তাকেই এখন তোমার বর্তমান উন্নতির পক্ষে সব চেয়ে উপযুক্ত সৌভাগ্যের কাণ্ড বলে বোধ হচ্ছে। একটু কিছু বুদ্ধি থাকলে তখন তুমি বলবে, “তাই ঘটে, কৃপার কোনো সীমা নেই।”

এই ধরনের ব্যাপার যদি অনেকবারই হতে থাকে, তখন তুমি এই কথা বলতে শুরু করবে যে মানুষ যেনমই অন্ধ হয়ে থাক কিংবা ভুল বুঝুক, কৃপা তার কাজ করছে সর্বকথই এবং সর্বত্র, সর্বাপেক্ষা বা ভালো হতে পারে তাই সে করছে, আর এখনকার জগতের পক্ষে এর চেয়ে ভালো আর কিছুই হয় না।

আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, নিজেকেই নতাবত নিয়ে আনন্ডা অন্ধ, তাই আনন্ডা তা দেখতে বা ঠাণ্ডার করতে পারি না। কিন্তু যখন আনন্ডা চোখ খুলে দেখতে শুরু করি তখন এমন আশ্চর্য জগতের মধ্যে গিয়ে পড়ি যা সকল বর্ণনার অতীত।...তখন আপাতদৃষ্টে সব কিছুর পশ্চাতেই তোমরা দেখতে পাও সেই পরমাস্চর্য ও সর্বশক্তিমান অনন্ত কৃপার উপস্থিতি, যা সব কিছু কথায় জানতে ও সকল কিছুই বাধ্য করতে,—আনন্ডা কিছু জানতে চাই বা না-চাই, জানি বা না-জানি, আমাদের তা এগিয়ে নিয়ে চলেছে পরবর্তন লক্ষ্যের দিকে, দিবা জ্ঞান ও দিবা বিলনের দিকে।

সেই কৃপার নিত্য উপস্থিতি ও নিরলস তৎপরতা দেখে তখন তোমার জীবন ভরে উঠবে অপার আনন্দে ও বিস্ময়ে ও অপূর্ব এক শক্তিতে, তার উপর এমন এক অচঞ্চল অবস্থা তোমার মধ্যে গড়ে উঠবে যে তুমি কিছুতেই আর টনবে না।

আর এমনি পূর্ণ গ্রহিকৃতা ও সায়জাবোধ বহন ক্রমশ তোমার আসবে, তখন সেই অনুপাতে জগতের যত দিবাকর্য প্রতিক্রিয়ারে বাজাও তুমি করিয়ে আনতে পারবে। সুতরাং এইভাবে তুমি ভগবৎ ক্রিয়ার সর্বোত্তম সহযোগিতা করবে। তখন তুমি শষ্টই জানবে যে তিনি কোথায় কী চান আর পূর্ণ চেতনাতে তাঁরই ইচ্ছার অনুবর্তন করবে।

(৬)

শ্রুত: Trance বা স্নাবির অবস্থা দ্রাষ্ট হওয়া কি উন্নতির লক্ষণ?

উত্তর সবাধি অর্থে এমন এক অবস্থায় গিরে পড়া যার সম্বন্ধে জাগ্রত অবস্থাতে কোনো স্মৃতি থাকে না।

সবাধিকে আগেকার কালে খুবই উচ্চ স্থান দেওয়া হতো। এমন কি একে বলা হতো উচ্চতর সিদ্ধিলাভের এক লক্ষণ, তাই বাহ্য যোগ করতো বা সাধনা করতো তারা এইরূপ সবাধি প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করতো। এর সম্বন্ধে অনেকেই অনেক বহন চরকপ্রদ কথা বলে থাকে। এবং এ বিষয়ে যেমন ধুনি তাই বলা যায়, কারণ তখনকার প্রকৃত অবস্থার কথা কারোই স্বরণ থাকে না, সবাধির অবস্থাতে কী ঘরেছিল তা কেউই বলতে পারে না।

তথাকথিত অধ্যায় বিঘরক সাহিত্যগুলি আমি সব বকবই পড়ে দেখেছি, তাতে সবাধি অবস্থার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথার উল্লেখ আছে; কিন্তু সেসব কিছু আমার নিজের কখনো হয়নি। ওরূপ কিছু হওয়া নিরূপস্থার লক্ষণ কিনা তাও আমি জানতাম না। এখানে আমার পরে শ্রীঅরবিন্দকে প্রথমই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “সবাধির সম্বন্ধে আপনি কি বলেন, তার কথা কিছু স্বরণে থাকে না? হয়তো ওতে কোনো আনন্দ ভাব আসতে পারে, কিন্তু সে ভাব থেকে কিরে আমার পরে কেউই বলতে পারে না যে কিরূপ হটেছিল।” তিনি আমার দিকে চেয়ে প্রশ্নটা বুঝে নিলেন, তার পরে বললেন, “ওটি এক অচেতন অবস্থা।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “তার মানে?” তিনি বললেন, “হাঁ, তাই, যখন কেউ সবাধিতে প্রবেশ করে তখন সে তার সত্যার চেতন অংশ থেকে অচেতন অংশে গিয়ে পড়ে, অর্থাৎ যেখানে চেতনার ক্রিয়া কিছুনা নেই—চেতনার গুণী ছাড়িয়ে অচেতনার ক্ষেত্রে গিরে উপস্থিত হওয়া। সে এক নির্ব্যক্তিক অবস্থা। জর মানে তখন সে চেতনার রাজ্যের মধ্যে নেই; সেই কারণেই তখনকার কথা কিছু স্বরণ থাকে না, যেহেতু চেতনার কোনো অস্তিত্বই সেখানে ছিল না।” (এই লেখাটি ছাপবার সময় মা এতে এই মন্তব্যটুকু যোগ করে দেন—“অনেকের এমন সবাধিও হয় যাতে কিছু চেতনা থাকে, কিন্তু তথাপি তখনকার অবস্থা ও বাস্তবিক জাগ্রত অবস্থার মধ্যে একটা ফাঁক থেকে যায়; সেই ফাঁকের দ্বারগায়ে ব্যক্তিই তিনিসত্তা থাকে না তাই সে অবস্থা হতে এই অবস্থার আসবার সময় তখনকার কথার বিস্মৃতি হটে। ফাঁক থাকার কারণে তখনকার চেতনাকে এখনকার চেতনাতে টেনে আনা যায় না। তবে গুহ্যতত্ত্বের মধ্যে এমন প্রক্রিয়াও আছে যাতে ঐ ফাঁককে ভরাট করে দেওয়া যায়, তাতে পূর্বাবস্থার কথা স্বরণ থাকে।”) শ্রীঅরবিন্দের কথাগুলি শুনে আমি বনেছিলাম—“আবার কিন্তু ঐ অবস্থা কখনো হয়নি।” তিনি তাই শুনে বললেন—“আবারও না।” (দাস্য)

এর পর থেকে যখনই কেউ সবাধির পুনরুত্তর জেনে, আমি তাদের বলি : “আগে আপন অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিত্বকে পড়ে তোলো, তার পরে পূর্ণ চেতনা নিয়েই তাহলে ঐ সব রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে, সর্বোচ্চ স্তরে উঠে উপভোগ করতে পারবে সচেতন সাধুদ্বা, আর একটা শূন্য ঘোষের পরিবর্তে বাস্তব অনুভূতি নিয়ে সেখানে থেকে ক্ষিপ্তে পারবে।”

এই হলো তোমার প্রশ্নের ভাব। অচেতন অবস্থার না থিয়েই উপরে ওঠা প্রকৃত উন্মুক্তির লক্ষণ, যখন চেতনা নিরেই সোপানে উঠে যেতে পারবে।

(নীরব থেকে)

কিন্তু এখানে সম্ভাব্য নিয়ে একটু গুণগোল রয়েছে।

যখন সত্যের স্থল ভাগটা চেড়ে অর্থাৎ স্থলসেহ চেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ো (যেমন তোমার পূর্ণ চেতনাকে নিয়ে প্রাণবন্ত জগতে চলে গেলে), তখন তোমার দেহ পড়ে রইল একরূপ trance-এর দশায়, কিন্তু তা ঠিক "স্নানি" নয়। তাকে বলা যেতে পারে অগাধ বা অচছিন্নের অবস্থা। সে অবস্থা খুব গভীর হলে দেহ নিঃশাড়ে একেবারে নৃত্যবৎ হয়ে পড়ে থাকে, কারণ সত্যের যে অংশ তাকে প্রাণবন্ত রাখতো সেটাই গেছে বেরিয়ে, তাই দেহ তখন অর্ধমৃত হয়ে থাকে, অর্থাৎ দেহক্রিয়াগুলি যতদূর সম্ভব লোপ পেয়ে যায় ; জ্ঞান-সংশয় প্রায় পাওয়াই যায় না, শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়াও শব্দভাবে হতে দেখা যায় না। একে বলা যায় দশাপ্রাণি বা trance ; কিন্তু তুমি নিজে তখন প্রাণবন্ত জগতে পুরো চেতনা নিয়েই রয়েছ। এমন কি তখন লক্ষ্য এসে থাকলে (যদিও তা সহজ বা নিরাপদ নয়) তুমি এও করতে পারো যে তখন তোমার দেহে সামান্য কিছু চেতনা রেখে দিয়ে তার কাজ করার স্বাভাবিক শক্তি বজায় রেখে দিলে। তোমার দেহ তার মানুষী কাজ করতে লাগল, অর্থাৎ তুমি নিজেকে তার থেকে বের করে নিয়ে চলে গেলে। এমন কি সেই অবস্থার মধ্যে তুমি বলতেও পারবে যে তোমার দেহমুক্ত অংশ কোথায় গিয়ে কি কি দেখছে আর কি কি করছে। তবে যখনই উন্মুক্তি না হলে এটা সম্ভব নয়।

স্বাভাবিক জীবনেও এমন দৃষ্টান্ত আছে যেখানে আপনা হতেই কতকটা অনুরূপ ধরনের জিনিস হতে দেখা যায়। তাকে বলা যায় স্বপ্নচারিতা বা somnambulism। তাতে এই হয় যে, গভীর ঘুমের মধ্যে তুমি দেহ চেড়ে বেরিয়ে পড়ো, আর সেদিক তোমার দেহমুক্ত ইচ্ছাকে ও প্রাণবন্ত অংশের ক্রিয়াকে যথবৎ অনুসরণ করতে থাকে। কিন্তু এ কোনো ইচ্ছামূলক ব্যাপার নয়, কোনো সম্ভবত্ব ও স্ফুটনিত জিনিস নয়, অতএব এমন অবস্থা কার্য নয়, এতে সত্যের বিপত্তি ঘটতে পারে। এ একটা দৃষ্টান্তের কথা বললান, যেখানে সত্যের ভিন্ন ভাগ রয়েছে দুনিয়ায়, কিন্তু তৎসঙ্গেও সে চানিত হচ্ছে এক ভাগ দেহমুক্ত চেতনার নির্দেশে। এও একরূপ trance।

গোপকবি অনেকবারই তোমাদের বলেছি যে গুহ্যবিদ্যা (occult discipline) জানলে তোমরা স্থলসেহ থেকে বেরিয়ে প্রাণসত্যকে নিয়ে প্রাণবন্ত জগতে সচেতন প্রবেশ করতে পারো ; আবার প্রাণসত্যকে হৃদয় রেখে বনঃসত্যকে নিয়ে নবোন্মুক্ত জগতে সচেতন প্রবেশ করে সেখানকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারো, কারণ স্থলসত্যের যেমন সম্পর্ক রয়েছে স্থল জগতের সঙ্গে, বনঃসত্যও তেমনি সম্পর্ক রয়েছে নবোন্মুক্ত জগতের সঙ্গে। সমুচিত শিক্ষা থাকলে এমনভাবে আরো উত্তরোত্তর এগিয়ে যাওয়া যায়। আমি একজন

মহিলাকে জানি যিনি এই ভাবে সঙ্কতা অর্জন করতে করতে যতি আশ্রয় কন্যা নাম করে-
ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহে যেতে যেতে যাবার দক্ষ
ধাপ অতিক্রম করতে পারতেন, সুস্থ থেকে ক্রমশঃ সুস্থাতর দেহে যেতে যেতে তিনি শেষ
পর্যন্ত ব্যক্তিচেতনার এমন চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছতেন যেখানকার অবস্থাকে প্রায় নিরাকারের
কাজাকাছি বলা যায়। অথচ প্রত্যেক অবস্থার কথাই স্মরণ রেখে তিনি তার বিশদ বর্ণনা
করতে পারতেন। তিনি একজন ইংরেজ মহিলা; তাঁর একটি ইংরেজী বইও ছিল যাতে
ঐ সকল অবস্থার বর্ণনা দেওয়া ছিল, আমি তার অনুবাদও করেছি।

একে সত্য উপর আশ্রয় প্রভৃৎ এবং চেতনার খুব উচ্চ অবস্থায়ই বলতে হবে। কিন্তু
এ হলো চেতনা থেকে অচেতনার সন্নিবিষ্ট প্রবেশ করার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে আনন্দ
জিনিস আর এ আনন্দ জিনিস।

(নীরব থেকে)

এবার শোনো আমি তোমাদের কিছু উপদেশের কথা বলি।

আমরা শ্রীযদবিশ্বের “The Synthesis of Yoga” (“যোগ-সমন্বয়”)
থেকে পড়েও দেখছি, আর সম্ভ্রতি “The Life Divine” (“জীবা জীবন”) থেকে
কিছু তুলনা করেও তেনেছি—যেখানে দার্শনিকের তিনি বুঝিয়ে এবং উপদেশ দিয়ে বলেছেন
যে তারা যখন মনোভূতির জন্য কাননা করে তখন কোনো কোনো সময়ে দেখে মনোভূতি তাদের
চেতনার পক্ষে এতই বেশী তীব্র হয় যে তার ফলে কিছু পূর্তোৎ এসে পড়তে পারে।
এ সম্বন্ধে আমি কিছু উক্তি করায় আনাকে তা ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে। আমি
বলেছিলাম—“নিজের মনোভূতির চেয়েও নিজে থেকে বড়ো হতে হবে।” তার অর্থ এই:

তোমার মনোভূতিটি যতই কেন উজ্জ্বল ও বিস্ময়কর হোক, তার দ্বারা তুমি এমন
অভিভূত হয়ে পড়বে না যাতে তোমার গায়সামান্য মনই হয় আর বুদ্ধিঃশ হয়ে সৈর্য হারাতে হয়।
অর্থাৎ যখন তোমার অপেক্ষা কোনো বৃহত্তর শক্তির প্রভাব তোমার চেতনার মধ্যে প্রবেশ
করবে, তখন তার দ্বারা বিব্রাণ না হয়ে এই কথা স্মরণ রাখবে যে তা খুব সুস্থ হলেও সমগ্র
সমগ্রের মধ্যে একটি, তা চরম জিনিস নয় কিন্তু আপেক্ষিক নাত্র। তা যতই কেন জীবন্ত
ও আশ্রয় ও অসাধারণ হোক বা যতই কেন উচ্চ পর্যায়ের হোক, ভবিষ্যতে তার চেয়েও
বড়োতর ও উৎকৃষ্টতর মনোভূতি আসতে পারে। সত্যতাঃ ওতেই উন্নত হয়ে না উঠে
তাকে স্থান দেবে আয়োগ্যুতির একটা ধাপ হিসাবে, একটা আপেক্ষিক অভিজ্ঞতা হিসাবে।
তাহলে কোনো বিপদ হবে না। কিন্তু এর পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় কি? যে জানে তার পক্ষে
খুব সহজ, যে জানে না তার পক্ষে একটু গুণগোল। উপায় আছে একটিনাত্র।

উপবং কৃপার কাছে সম্পূর্ণ আত্মদান। একবারের জন্যও এটি করতে ভুলবে না।
কৃপা হয়ঃ ভগবানেরই অভিব্যক্তি। নিজে থেকে তার কাছে গুণে দেওয়া মানে নিজে থেকে
একবারেই তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়া, যিনি সকলের উপরে ও সকল স্রষ্টার পোড়ার তাঁরই

পারে নিজেকে পুরোপুরি বিনিয়োগ করে। এ ছাড়া কে-অনুভূতি হোনার নিবল, তাকে আপন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নিয়োগ না করে সেই স্থানকে কাজেই তাকেও নিবেদন করে দাও, যার থেকে এসেছে তাকেই এর ফলাফল সর্বাঙ্গ করে। এতে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ হবে।

আল কথ্য, কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, আত্মপ্রাণ নয়, গর্বভাব নয়। কেবল ঐকান্তিক আনন্দ, আত্মিক ধীনতা, এতেই ত্রোকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করবে। একেই আমি বলি নিজের অনুভূতির চেয়ে নিজে বড়ো হয়ে থাকা।

*

*

*

প্রশ্ন "The Synthesis of Yoga" I. VI. p. 194-95 ("যোগ-সমন্বয়")

থেকে—“সব কিছুর মূলে রয়ে গেছে অজ্ঞতা ও মূল জড়তা। সকলই আপন আপন দেহাত্মক প্রয়োজনাদি ও তারই মানাবিধ তুচ্ছ কারনা বাসনার বন্ধনে বাঁধা রয়েছে নিজেকে ছোঁচো বসের গভীর মধ্যে, তারই মধ্যে চলেছে যত কিছু আকর্ষণ ও চাহিদার কাজ, যত কিছু নিত্যকর্মের ও বাধ্য-বেশনার ও স্বপ্ন ভোগের তুচ্ছ পুনরাবৃত্তি, যার কেবল তাই চওড়া ভিন্ন পরিণতি বলতে কিছু নেই, যার আগাগোড়াই অজ্ঞানতা, কেন করছে আর কোন দিক পানে যাচ্ছে সে কথা কিছুই জানা নেই। এই দেহাত্মক জড়তাধীন বন তার পাখি দেহতাদের ছাড়া অন্য কোনো দেহতাকে মানে না ; সে বন হরভো চায় আরো বেশী স্বপ্ন, সন্ততি, শৃঙ্খলা, কিন্তু এর চেয়ে উচ্চতর কিছুর দিকে এবং আধ্যাত্মিক নুষ্টির দিকে তার আশ্রয় নেই। কেন্দ্রস্থলে হয়তো একটা প্রবল উজ্জ্বলপূর্ণ ভরকাল ধরনের জীবনসংকল্পের দাব্য বিলম্ব, কিন্তু সে যেন এক অল্প দানবের নভো, বিকৃত আত্মা হয়ে সে শুধু তার জীবনের অস্থির কর্মব্যস্ততা আর আনন্দবিজিত যত চটপটাকানো সবসময় নিয়েই উন্নত। শুধু একটা মানবীর বা দানবীর কামনাভরা সত্তা, ঐকড়ে বসে আছে তার যত ভালোমতো ও স্বপ্নঃখে ও আলো-অন্ধকারে ও আগমন-বেশনায় নিশ্চিত এক বাহ্য চটকের রঙীন খেলা নিয়ে, কিংবা তার বিকৃত কাব্যবিলাস বা মুঃখবিলাস বা ভাববোঝা নিয়ে। সকলে ওরা এই জিনিসকেই পছন্দ করে, এই জিনিসই আরো বেশী বেশী পেতে চায়, এমন কি কষ্টে পড়ে কাণ্ডাকাটি করতে থাকলেও এই ছাড়া অন্যরকম কিছু চায় না বা তাতে স্বপ্ন পায় না ; ওর চেয়ে উচ্চতর জিনিসের মান শুনলে তাকে ঘৃণা করে, তখন বিরোধী হয়ে বেগে ওঠে ; কোনো দিব্যশক্তি এসে যদি তার জীবনে বিতর্কিত এনে এবং তার মুখ থেকে ঐ সব আলাদারক নেশাগুলোকে কেড়ে নিয়ে জ্ঞানবীথি এনে তাকে প্রকৃত হুধী করতে চায়, তাহলে ওরা চাইবে তাকে কানড়ে ছিঁড়ে নষ্ট করে পা দিয়ে ধলতে। আরো এক রকমের জীবনসংকল্প আছে যা কিছু শাস্ত আশ্রয়কে বোঝে, তারই ভাবে সন্ততি, সৌন্দর্য, আলো এবং মহত্বের আশ্রয় গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়, কিন্তু প্রাপ্যতার অংশে সে তার ততটা স্থান পায় না, সেখানে নানা ভোলাভোলা এবং ভাবনিক প্রলোভনের চাপে তা সহজেই ঢাকা পড়ে যায় ; মনের চেয়ে উচ্চতর আশ্রানে সে গাড়া

হিতে পারে কেবল তখনই যখন প্রাপ্তবৃদ্ধি বৃদ্ধবৃদ্ধে তার সঙ্গে আপন দাবিগুলিকে ধাপ ধাইয়ে নেয়, যেমন আমরা বর্ষাশ্রমগুলির মধ্যে সাধারণত দেখতে পাই। আধ্যাত্মিক সাধক হতে গেলে ঐ সব শক্তিগুলির ক্রিয়াকে ভিতরে ভিতরে চিনে রাখতে হবে, যেগুলি সর্বজন পিছনে রেখে আছে তার বিরুদ্ধে অববর্তন বৃদ্ধ ক'রে তার বহুকালীন অভ্যাস দখল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে হবে, যে দখল মানব অস্তিত্বের রাজ্যে নিত্যই কায়েমী রয়েছে। এ খুব কঠিন কাজ কারণ সে দখল এতই মজবুত আর এতই দুর্ধর্ষ যে সেই কারণেই মানব-প্রকৃতির তুলনা করা হয়েছে কুকুরের লেঙ্গের সঙ্গে, যাকে কোনোমতেই সোজা করা যায় না। সে প্রকৃতিকে হতুই কেন নীতির, ধর্মের, বুদ্ধির বা অন্য কিছুর মোহাই দিয়ে সোজা ক'রে আনো, ছাড়া পেনেই সে আবার আগের মতো পাক খেয়ে বেঁকে বাবেই। আর সেই উত্তেজক জিনিসের বহুবল্লীর এমনই প্রভাপ, তার আবেগধারা এতই বিপজ্জনক যদিও তা অতি সুস্পষ্টভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তার আক্রমণ ও প্রতিবন্ধকতা এমনই অনিবার্যরূপে তোমাকে স্বপ্নধারের কাছ পর্যন্ত গিয়েও অনুসরণ করতে থাকে যে, যোগীরা এবং সাধুরা পর্যন্ত তাদের মুক্তি বিপত্তি বা আত্মজয় সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হতে পারে না।...”

উক্ত যেমন এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, ঐক্লপ দৃষ্টিতে যখন তুমি জীবনের সব কিছুকে দেখতে শুরু করবে, তখন নিশ্চিত জানবে যে তুমি সনাতনের কাছে পৌঁছে গেছ। সবচেয়ে শোখের কথা এই যে আমরা হুল বাস্তবকে মুখা বাস্তব বলে মনে করি, তাছাড়া অন্য সব কিছুকেই মনে করি গৌণ। আর এই হুল চেতনার জোরে জীবন নিয়ন্ত্রণ ও জীবন পরিচালনার অধিকারকে এতই বেশী ন্যায্য মনে করি যে, কেউ যদি এই পবিত্র অধিকারকে সম্বলনাত্মক করে তবে তাকে বলি অপ্ৰকৃতির কিংবা ভয়ঙ্কর ব্যক্তি। শ্রীঅরবিন্দ এখানে যে হুলপন্থী জীবনের নমুনা দিয়েছেন, তাকে ঠিক অবনি চোখে দেখতে হলে অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে হবে। ঐক্লপ দৃষ্টিতে যদি তোমরা জীবনকে দেখতে পাও কিংবা অনুভব করতে পারো, তাহলে ওর থেকে বুদ্ধিও খুব কাছাকাছি পৌঁছেতো এ আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি।

বিশিষ্ট পর্যায়ের কয়েকজন যারা উচ্চতর বাস্তবের ও দিব্যচেতনার কিছু স্পর্শ পেয়েছে, তারা ব্যতীত অন্যান্য প্রকৃতির পক্ষে পাণ্ডিত্য অস্তিত্বকে ঐভাবে দেখা খুবই কঠিন। কেউ যদি আপন বাহ্য চেতনার এই সব দৌর্বল্য ও নির্বেদিতা সম্বন্ধে পুরোনাত্মক সচেতন হতে পারে, তথাকথিত জ্ঞানবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য আইন-কানূনের কাঁকি সম্বন্ধে এবং তথাকথিত দৈনিক প্রয়োজনের “অনিবার্য দাবির” অনুলকতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে বৃদ্ধ হতে পারে যে তা কতখানি বিখ্যা, কতই দ্বন্দ্ব নীতিচিহ্ন, কতই অন্ধ দুর্ভানি, তাহলে সে তো হুল রহস্যভেদের খুব কাছেই গিয়ে পড়ল।

বইখানির ঐ ব্যর্থপাটি পড়ে আমার এইক্লপ ধারণাই হয়েছিল।

চতুর্দিক থেকে কত নোক আসে আমার কাছে তাদের আপনাপন আশা ওয়ায় নিয়ে : তুলনা ক'রে তা বেগে দেখলেই আমি বুঝতে পারি যে ঐক্য ধরনের সত্য পুষ্টি পেতে হলে প্রথমেই বতখানি উঁচুতে নিয়ে ওঠা দরকার, সেখানে উঠতে পারলেই তোমার মুক্তির দারপ্রাপ্তি নিশ্চয় হবে। খুব ভালোবাসা অনুভব করেই এ কথা বলছি।

ঐ ভায়গাটি যদি তোমরা আমার ভালো ক'রে পড়ে সেখ আর ওর নিম্নত সত্যতা সম্বন্ধে ক্ষমতা করে, তবে তাতেই অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবে।

(নীরব থেকে)

আর কারো কিছু প্রশ্ন করার নেই?...আবার কাছে কতকগুলি প্রশ্নের চিঠি এসেছে (পত্রগুলি দেখিয়ে), কিন্তু এ প্রশ্নগুলি অন্য ভঙ্গি সম্বন্ধে।

একজন সম্প্রতি জানতে চেয়েছে অভিব্যক্তি সম্বন্ধে, পৃথিবীর উপর তার কি ফল প্রত্যক্ষ করা হবে।...খুব সম্ভব তার প্রশ্নের ফল এই হবে যে এইমাত্র যে কথাগুলি তোমরা শুনেছ, ঠিক সেই ভাবেই তোমরা পাখির ব্যাপারগুলিকে দেখতে শুরু করবে।

আরও এক ভিজ্ঞানী রয়েছে, তার জ্ঞানও আমি নিয়ে থাকব। আমি বলছি যে অভিব্যক্তি আসার ফল সকলের পক্ষে খোলা চোখে দেখবার মতো হতে হয়তো হাজার হাজার বছর আগে যেতে পারে; কিন্তু স্বল্প পরমাণু নিয়ে মানুষের চেতনা তা শুনে খুশি হয় না, তারা অস্থির অধৈর্য হয়ে ওঠে। আমাকে তাই বার বার ভিজ্ঞানী করা হয় যে তারা চেতনার কাছে তার একটি প্রত্যক্ষ ফল দেখা যেতে আর কত বিলম্ব হবে।

কিন্তু সোটা নির্ভর করতে তোমাদেরই চেতনার অবস্থার উপরে এখন সাধারণ মানব-চেতনার যে অবস্থা তার পক্ষে যথেষ্ট বিলম্ব হতে পারে। এর চেয়ে একটি অন্যরকম চেতনার পক্ষে তা অপেক্ষাকৃত ত্রাতাতাড়ি হবে, তার চেয়েও অন্যরকম চেতনা যার রয়েছে তার কাছে তা ইতিমধ্যে ঘটেই গেছে। যা হবার ছিল তা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তা দেখতে চাইলে তোমার মূল চেতনা চেড়ে অন্যরকম চেতনার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ("The Synthesis of Yoga" থেকে আমি উদ্ধৃত করে তোমাদের পড়ে গিয়েছি) যে আমাদের মূল মন-প্রাণ-মেহের সঙ্গে সঙ্গে থাকে সূক্ষ্ম মন-প্রাণ-মেহ, আর কোনো কোনো অবস্থাতে তার সংস্পর্শও ঘনেন। আর তখনই আমরা দেখতে পাই যে আপাতদৃষ্ট জিনিসগুলির সঙ্গে আসল জিনিসের কতখানি তফাৎ।

তাই বলছি, বিকাশপ্রাপ্ত চেতনার কাছে অভিব্যক্তি ইতিমধ্যে কোথাও এসেই গেছে; সূক্ষ্মমেহের রাজ্যে তা রয়েছে, সেখানে তাকে বাস্তব রূপেই দেখা যাচ্ছে, তা কিছু বিশেষ আকারও নিচ্ছে এবং তার কাজও হচ্ছে। সেই রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যদি তার মধ্যে অবস্থান করতে পারো, তাহলে তার এমন সব অংশই লক্ষণগুলি তুমি দেখবে, যা ভগবৎকে একজোটা ক'রে তুমি সকলকে তা দেখিয়েও দিতে পারবে। অতএব তোমার আভ্যন্তরীণ অনুভূতিকেই বাড়ানো দরকার, যাতে তুমি এই স্বপূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি সত্যের সংস্পর্শে আসতে

পায়ো, যা তোমার নিজের মধ্যে কেবল উপস্থিত থাকবে যখন তুমি নিজের অভ্যন্তরে তুমি
কাছে আছো। আত্মতা হয়ে রয়েছে।

(নীরব থেকে)

এমনও হতে পারে, যা চৈতন্যবাহী স্বপ্ন দেখে তারা এখন এমন কিছু নতুন স্বপ্নের
স্বপ্ন দেখতে যাতে ঐ নতুন স্বপ্নের সঙ্গে তাদের সংস্পর্শ ঘটেছে। কারণ তাদের স্বপ্নের
ঐক্য অনুভবের যখন আছে তাদের পক্ষে সে স্বপ্নে প্রবেশ করা কঠিন নয়। এবং তার
প্রত্যয় বাহ্য সত্য আসবেই—যদি তাকে বাহ্য চৈতন্যেও নিতে প্রস্তুত থাকে।

আচ্ছা, আর যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে, তবে আর একটি ছাপ ক'রে থাকি।

ও, তুমি যদি কিছু বলতে চাও ? (একজন শিষ্যের দিকে চেয়ে) ঐ যে, ঐ প্রশ্নকারী,
পা বেন ওর পুনর্জন্ম করার আগমনের ওপর পড়েছে।

প্রশ্ন : আচ্ছা মা, এত সব কথা জেনেও তো আমরা সেই নিম্নতর বনের পোরে
গিয়ে সকল প্রশ্নের সমাধান করতে চাই :

উত্তর : দুইতে পেরেও সেই একই রাজ্য ধরো ? বুঝে বুঝে কথা।

প্রশ্ন : হী, তাই তো হয় দিনের পর দিন।

উত্তর : দিনের পর দিন ? আরো দুইয়ের কথা ! তবে এর উপায় ?

প্রশ্ন : তাই তো জানতে চাইছি।

উত্তর : ও, তুমি জানতে চাইছ ? কিন্তু আমি তো জানতাম যে তুমি কিছু সংজ্ঞা
ধাকলে, যখন দেখা যায় যে এ ধরনের কোনো মূল্য নেই, তখন কেউ আর তাকে আগের সঙ্গে
অতীত জানল দেখে না। তাহলে বলতে হয় যে তুমি নেহাৎ অসাড়, তাই ওর মূল্যহীনতা
জেনেও ওকে গ্রহণের মধ্যে আনো।

(নীরব থেকে)

হী, আরো একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে আমি আশ্চর্য হই। আমি বরাবর জানতাম যে
কোনো কিছুতে গ্রহণযোগ্য বোধ না করলে তাকে চেতনা ও প্রকৃতির ভিতর থেকে বর্জন
করা বুঝে সহজ ও স্বাভাবিক, আর এটা হলো মানুষের গোড়ার কথা। যেমন কোনো
জিনিসের স্বরূপ চিনে নিয়ে তাকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করলে, অর্থাৎ তাকে বাতিল ক'রে
সেইটা নিজের মধ্যে সহজ হয়ে পেল। তথাপি প্রায়ই দেখতে পাই—প্রায় সকলের

বেলাতেই—যে আমি যখন কোনো জিনিসকে চিনিয়ে দিলাম, লম্বা করে দেখিয়ে দিলাম যে কেমন অব্যাহিত অবস্থাকে তুমি পোষণ করছ, জানিয়ে দিলাম যে তোমার সে কাণ্ডের ফলটা কি ঝড়োছে, আমার অভিমত আমি খুব জোরের সঙ্গেই ব্যক্ত করলাম, তার প্রতিক্রিয়া কিন্তু হয়ে থাকে আলাদা রকম। কোপার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া থেকে সে বলবে, “ওঃ, ওটা এমন জিনিস, তা’লে আর আমি ও জিনিস চাই না।” তার বদলে সে নিমগ্ন হয়ে বলে, “কই, আপনি তো কিছু উৎসাহ দিলেন না।” তখন আমার মনে হয় বেন হাত পা গুলো কেটে দিলে। জিনিসটা কেমন তা তো দেখতেই পেলো, তাই কি ঝেঁপেই নয়? তাকে অব্যাহিত বলে জানলে, তাই কি ঝেঁপেই নয়? এতেই সান্ত্বিত বর্জনের নক্তি আসা উচিত, বেন আর তা না বলে।

কিন্তু তুমি কাঁচ কবচি এমনও সেই ভুল কাজই করতে থাকা, শেষ হচ্ছে মেনেও সেই মোঘটারই পুনরাবৃত্তি করা, এ জে আমার খুব অস্বস্ত লাগে! অনেক কালই রয়েছে এই পৃথিবীতে—সাধারণ মানুষের দিগায়ে অনেককালই বলতে হবে—তুমি এ রহস্য এখনও বুঝলান না। আমি তো ভাবি...মনে করি যে এটা অসম্ভব। তুমি চিন্তা করা, তুমি প্রবৃত্তি আসা, ভিতরে বিখ্যা আর বাইরে কদরতা ও মীনতা, এগুলোর তুমি নামে সোঝা যায় মতকণ তুমি রয়েছ অজ্ঞানের অবস্থাতে—আর জগতে তাই-ই হচ্ছে সর্বত্র—ততকণ বুঝি যে তুমি অভ্যাসের বলে তাই করছ, ও ছাড়া যে অন্যরকম কিছু হওয়া উচিত সে কথা তুমি জানো না। কিন্তু যখন জানতে পারলে, আলো পেয়ে যখন সব কিছু দেখতে পেলো, তখনও আমার কেমন ক’রে তাই কহো? এ আমি বুঝি না।

তা’লে তুমি কোন দাড়াতে থাড়া? শুধুই কি ছেঁড়া ন্যাকড়া? না টলটলারমান জিনেটিন? জানি না, এর কোনো অর্থ বুঝে পাই না। ভিতরে কি কোনো প্রাপবস্ত উৎস বলে, ইচ্ছা বলে কিছু নেই? আভ্যন্তরীণ পতিবেগ কিছু নেই?

প্রশ্ন : আমার চাই কপার দিকে!

উত্তর : হাঁ, পানকের নতো। কিন্তু কপা তো সব সবসেই উপস্থিত। কেবল তাকে একটু আনুকূল্য দিতে হয়—সেটুকুও যে সেওয়া হয় না...।

(নীরব থেকে)

আর কেবল এইরকম একটা মনোভাব, “ওঃ, আমি যে আর পারছি না!”...এতেই স্বপার কাছ ব্যাহত হয়ে ফিরে যায়।

তুমি যে সত্যি পারছ না তা কেমন ক’রে মনি? তুমি হয়তো কিছু জানো না—সে কথা হতে পারে—কিন্তু যখন জানলে তখন তো ওর শেষ হবে! (নীরব থেকে)
আচ্ছা তাহলে...*

* Bulletin of S. A. I. C. E. থেকে। অনুবাদক—পতঙ্গি ঝাঁজার

প্রশ্নোত্তর

("চিন্তাকলী ও সূত্রাবলী" Thoughts & Aphorisms সম্পর্কে)

৭৩

প্রশ্ন : "জ্ঞানের উদয় হলে তার প্রথম পাঠই হবে এই, 'জ্ঞান বলে কিছু নেই ;
যেটুকু আছে তা অনন্ত দেবতার কিছু খুলাও'টা মাত্র ।"

উত্তর : খুব ঠিক কথা । এ সম্বন্ধে প্রশ্ন নিম্নরোজন ।

৭৪

"ব্যবহারিক জ্ঞান আলাদা ; তা কাজে লাগার মতো বাস্তব জিনিস, কিন্তু কখনই
সম্পূর্ণ নয় । হুতরাং তাকে বিধিবদ্ধ করে স্থায়ী সংকলনের মধ্যে আনা প্রয়োজন হলেও তা
নাগাছক ।"

৭৫

"অবশ্য তাকে প্রণালীবদ্ধ করতেই হবে, কিন্তু তথাপি এই সত্যটিকে আঁকড়ে থাকতে
হবে যে, সকল নিয়মই অস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ ।"

উত্তর এ জিনিসটা আমি প্রায়ই লক্ষ্য করেছি । এমন কি একসময় আমি ভাবতাম
যে এই অজ্ঞাননয় বাঙালি খুল প্রকৃতির দ্বারা যে সব কাজ হতে দেখা যায় তার সবগুলি সম্বন্ধেই
আমরা পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন করতে পারি, আর সেই দ্বাধ্যায় দিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়তো মূল
সত্যকেও ফিরে পেতে পারি । কিন্তু আমার সাম্প্রতিক অনুভূতি আমার পরে সে কথা
আর বনে হয় না । (না এখানে বসেছেন ১৩ এপ্রিল ১৯৬২ তারিখে তাঁর সাম্প্রতিক
যোগানুভূতির কথা ।)

কথাটা বোঝাতে পারব কিনা জানি না...আগেকার কালে আমি প্রায়ই ভাবতাম
যে, বিজ্ঞান যখন তার সকল সম্ভাবনার চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছাবে (যদি কখনো তা সম্ভব হয়)

৫৬

তখন প্রকৃত জ্ঞানমূলে গিয়ে তার পুনর্দিলন হবে। বধা, ভড়বছর মূল উপাধান বিশ্লেষণ করতে করতে বিজ্ঞান এমন স্থানে গিয়ে পড়বে যেখানে দুই জ্ঞানই মিলে এক হয়ে যায়। বধন আনি শাশ্বত চেতনার অবস্থা থেকে এই অগন্ত-চেতনার অবস্থাতে ফিরে এলান তখন দেখলান যে তা হওয়া অসম্ভব। এমন জিজ্ঞাসা করলে বলব বিজ্ঞানকে তার চূড়ান্তে গিয়ে এক মহানিলনের সম্ভাব্যতা ব্যতীত জগতের সঙ্গে এক সত্যাকার সচেতন সংযোগ স্থাপনের সম্ভাব্যতা এই দুইই সমাধিষ্ট। ওর মাঝখানে আরো কিছু রয়ে গেছে।

আজকাল আমি উত্তরোত্তর ব্যাপারটি নতুন চোখে দেখছি, যা আগে দেখিনি।

সত্ত্বত দুই দিকের সত্যটি নিয়ে যার এমন এক তৃতীয় স্থানে—যেখানে আমি এখন গিয়ে পড়েছি—কিছু যাচাই করতে নয়—কিন্তু বোঝ করছি যে দুই সত্য কোনা তৃতীয় স্থানে গিয়ে মিলতে কিনা এবং সেটাই চরম জিনিস কিনা।

কিন্তু এ কথা ঠিক যে বিজ্ঞানের পক্ষে যদি কখনো তার জ্ঞানের সম্পূর্ণতায় ও সীমাত্তে গিয়ে পৌঁছান সম্ভব হয়, তাহলে তা চরম সত্যের দ্বারদেশে গিয়ে দাঁড়ির হবে। শ্রীঅরবিন্দ সেই কথাই বলেছেন। কেবল তিনি আরো বলেছেন যে তাকেই চরম সত্য বলে ধরে নিলে তা হবে মারাত্মক। কারণ যারা ঐ জ্ঞানের অনুগামী হবে তারা একেই ধরে নেবে শেষ কথা বলে, সত্যের অন্য দিকটা তারা বোটে দেখতেই পাবে না। সেখানেই তা হবে মারাত্মক।

কিন্তু আমি আমার আপন অনুভূতির দিক থেকে দেখতে পাচ্ছি এদিকে যারা কেবল আভ্যন্তরীণ অনুভূতির দ্বারা নিছক আধ্যাতিকের সত্যটিকেই চরম বলে মানবে, তাদের বোনা জাও হবে মারাত্মক। কারণ তারাও সত্যের কেবল একটা দিককেই দেখবে, সমগ্রকে দেখবে না। আমি বলি অপর দিকটাও সমান অপরিহার্য, কারণ চূড়ান্ত উপলব্ধির মধ্যে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়েও এটা আমি লক্ষ্য করলান যে অপরদিকের উপলব্ধিও অসম্ভাব্য রকমে অসম্ভব—যদিও তাকে বাহ্য এবং বাহ্য বলি, তবু তা সত্য বস্তুই, যদিও সৈবক্রমে হয়ে দাঁড়িয়েছে বিকারপ্রাপ্ত।

আমরা বুঝি মূল সত্যকেই। শুধু বোঝা নয়, বরতো গড়েও আনছি তাকে। তারই অভিব্যক্তিতে অংশগ্রহণ করতে আমরা নিযুক্ত রয়েছি। সে অভিব্যক্তি সকলেরই ধারণাতীত, কারণ ইতিপূর্বে তা কখনই ঘটেনি। যা অসাপত্ত তাই আসছে।

এই পর্যন্তই বলতে পারি।

(নীরব থেকে)

বস্তুত আমি এখন ইক্লপই এক চেতনার অবস্থার রয়েছি, এক শাশ্বত রহস্যের মুখোমুখি হয়ে, কিন্তু সম্পূর্ণ অনাজেব।

ঐ যে দুই শতাব্দী দিকের কথা বললাম, অর্থাৎ আধ্যাতিক বাগের দিক আর “বস্তুতাত্ত্বিক জ্ঞান” দিক (দুইই হলো একরোখা, সত্যকে পেতে কেবল আপন দিকটাই মানে, অপর

দিকটা নানে না) দুইট কিস্ত অসম্পূর্ণ, পরস্পরকে অস্বীকার করতে বলেনই শুধু নয়, দুই দিকই বেনে নিয়ে দুটিকে একত্রে মিলিয়ে দিলেও সমস্যার পুরো সমাধান ঘটবে না। আরো কিছু তৃতীয় ব্যাপার রয়েছে, যা কেবলই এই দুইয়ের বোণফল নয়, কিন্তু সেটি আবিস্কৃত হলেই সমগ্র সত্যের সিংহদার খুলে যাবে।

এমনি স্থানে আমি উপস্থিত হয়েছি। এর বেশী কিছু বলতে পারছি না।

প্রশ্ন কার্যতঃ কেমনভাবে বোণ বেওয়া যায় সেই—

উত্তর সেই আবিস্কারে ?

তা...তা হলো শেষ পর্যন্ত সেই একই কথা। আপনি সম্রাটকে জানো, যেখানে তার মূল সত্তা তারই সঙ্গে সচেতন সম্বন্ধযুক্ত হও,—যে কোনো উপারে বা যে কোনো রাজ্যভেদে হোক, তাই নিয়ে কিছু যায় আসে না—কিন্তু এই-ই হলো একমাত্র পন্থা। আমরা প্রত্যেকেই বহন করছি এক একটি সত্যকে, তারই সঙ্গে মিলিত হয়ে তারই মধ্যে বাস করতে হবে। প্রত্যেকে যে পথে সেই সত্যের সম্মানে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হবে, এবং তাকে জানবে, সেই পন্থাই তাকে পরম জ্ঞানের কাছাকাছি পৌঁছে দেবে। সেখানে দুই ভিনিসই একত্রে সংযুক্ত হবে—ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং জ্ঞান।

কে জানে, চরিত্রো এমনি বহুবেচিত্র্যের ভিতর দিয়েই সেই আসল গুণগ্রন্থসোর হৃদয় বিলবে, এবং তারই ভিতর দিয়ে রক্ত কষাট উন্মুক্ত হবে।

এখন আমার মনে হয় না যে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থাতে একজন কোনো একক ব্যক্তির দ্বারা, সে বড়ই কেন অসাধারণ হোক, তার চেতনা এবং সারসভা যতই কেন গাণ্ডনুদী হোক, —তার একার দ্বারা এই জগতের এবং এই স্বষ্টির সম্যক পরিবর্তন আসতে পারে, উচ্চতর সত্যের যে মনু জগৎ আসছে তা পূর্নসত্যের জগৎ না হলেও তার সমুচিত বিকাশ ঘটতে পারে। আমি মনে করি যে তার জন্য একাধিক ব্যক্তির অংশগ্রহণ করা অপরিহার্য (আপো-ক্ত সাময়িক পর্যায়ক্রমে হতে থাকলেও অতঃপর তা একযোগেই হতে পারে)। তবেই সে সত্য বাস্তবে বিকাশ পাবে। এ বিষয়ে আমি একরকম সন্নিহিত।

অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে যিনি যত বড়ই শক্তিমান অবতার হোন, তিনি একা করনো এ পৃথিবীতে অতিমানস জীবনের বিকাশ ঘটতে পারবেন না। সমগ্রমানুষী পরে পরে অনেকজন এনে, কিংবা একসঙ্গেই অনেকে ইতস্তত ভাবে দেখা দিলে—কার্য হরজো দুই রকমই সম্ভব—তবেই তার পূর্ণ বিকাশ ঘটবে। এদ্বয় আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

ব্যক্তিগত শক্তিতে হরজো কেউ প্রেরণা লাগাতে পারে, পথনির্দেশ দিতে পারে,—নিজেই সে পথে চলে আসে সিঁড়িলাভ, ক'রে সকলকে দেখিয়ে দিতে পারে,...কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞানতে পারে না। জা. নির্ভর করে কভক্ষণি সমষ্টিগত আইনের উপর—যা

স্বভাবতই শাশ্বতের ও অনন্তের একটা দিকের বিকাশ। সবই তো সেই একই সত্তা। আলাদা রকমের মানুষও নেই, আলাদা কোনো ব্যক্তিত্বও নেই, সত্তা সবই এক। একই দিককে ব্যক্ত করছে সবষ্টরূপে সম্ভাররূপে, বহুত্বের রূপে।

এই হলো বক্তব্য। আর কোনো প্রশ্ন আছে?

প্রশ্ন ১৩ এপ্রিলের অনুভূতি পরে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী কেন বললেন?

উত্তর আমার বলি।

বহুকাল পর্যন্ত আমার এই ধারণা ছিল যে বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিকতা দুইই যদি পরস্পরের চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছয়, আর দুটিকেই যদি একত্রে সম্পূর্ণ মিলিয়ে যেওয়া যায়, তাহলে যে সত্যের আনন্দা সম্ভাবন করছি তা সমগ্রই উদ্ঘাটিত হবে। কিন্তু যে দুটি অনুভূতি আমার মিলন—অর্থাৎ বাহ্যাজীবনের অনুভূতি (অর্থাৎ মূল মেহাশ্রিত অবস্থার বৈশিষ্ট্যময়তা ও নির্বাচনিকতার ও অন্যান্য যোগানুভূতি বোলা সম্ভব), আর আদি উৎসের সঙ্গে পূর্ণসাদৃশ্য ও অভিনুতার অনুভূতি—এই দুটির পরেও তা ছাড়া আরো কিছু জেনেছি—যা এখন বলতে পারছি না—তার ফলে এখন দেখছি যে ঐ দুই দিকের জ্ঞান পুরোপুরি হলো এবং দুটি একত্রে মিলে গেলেও তাতেই খেপেট হোনো; আরো কিছু তৃতীয় বস্তু রয়েছে যেখানে ঐ দুই প্রান্ত গিয়ে শেষ হচ্ছে, আর সেই তৃতীয় বস্তুই এখন প্রস্তুত হয়েছে বিকাশপ্রাপ্তির জন্য। সে মিলন এনেই তখন মিলবে চরম সত্যের চরম উপলব্ধি, যা আমরা চাইছি।

এবার কিছু পরিষ্কার হলো?

প্রশ্ন আমি অন্য কথা বলছিলাম...১৩ এপ্রিলের অনুভূতির পরে ঐ মূল ভগৎ-সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি বললেন বললেন, তা কোন দিক দিয়ে?

উত্তর চেতনার তেমন অবস্থার একটা বোটাটুকি আভাসই মাত্র দেওয়া যায়।

(নীরব থেকে)

বোগের মাধ্যমে আমি বাস্তব ভগৎকে জ্ঞানমান এক চতুর্ভাজিক (fourth dimension) বোগের দ্বারা (বোগেতে অসংখ্য রকমের মাজাবোধ বেনে)। চেতনার ঐক্যপ অবস্থার দৃষ্টিভঙ্গীকে আমি তখন প্রয়োগ করলাম বাস্তব ভগৎ ও অধ্যাত্ম ভগতের পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণের জন্য, ঐ আভ্যন্তরীণ মাজাবোধকে পূর্ণতায় এনে—এই ছিল আমার শেষ অনুভূতির পূর্বকার অনুভূতি।

অবশ্য বহুদিন ধাবং ত্রৈমাত্রিক বোগের কোনো প্রশ্নই ছিলনা—তা ছিল বিশ্বাসের মাজাভগতের কথা। কিন্তু এবার দেখছি ঐ চতুর্ভাজিক বোধকেও বনে হচ্ছে বাহ্য।

এখনকার অবস্থাতে তাও আর নজরে লাগছেনা। ঐত্বেষাত্রিক ভগ্ন২ তো পুরোপুরি কাঁকি ; এখন ওকেও মনে হচ্ছে না। বেন ষানিকটা মাত্র আভাস দেবার জন্য তাও এক স্বকন মাদুলী তর্জনা।

আমনে আসন কখনো কী ? তা বুদ্ধিসীমার এতই বাইরে যে আমি তাকে ভাষার মধ্যে বসতে পারছি না।

ভবে তারও করুণা মিলে যাবে, আমি জানি। তা আসবে বিশেষ কতকগুলি জীবন্ত অনুভূতির তিত্তর দিয়ে, যা এখনও বেলেনি।

(নীচের থেকে)

কিন্তু ঐগুলি আমার পক্ষে আসা খুবই দুরকার ছিল, আমার যোগে ওতে খুব সাহায্য করেছে। জড়ের সম্যক উপলব্ধি আমার পক্ষে ওগুলি ছিল পক্ষা, প্রণালী, ভাবাপি সেই আসন ভিনিসটি নয়।

এই হলো অবস্থা। আপাতত এই অবস্থাতেই আমি রয়েছি।

এর বেশী কিছু বনতে পারছি না।

২৪ মে, ১৯৬২

বসোরার উজীররা

শ্রীঅরবিন্দ

লেখক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

[শ্রীঅরবিন্দের বৌবনে বয়োবাবল-কালীন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সের রচনাগুলির মধ্যে "বসোরার উজীররা" এই রচনা নাটকটি অন্যতম বৃহৎ। তাছাড়া এই নাটকটির উপর তাঁর একটি বিশেষ লেখের দৃষ্টি ছিল। এই কথা তাঁর "Collected Poems and Plays" সংকলনে উল্লিখিত আছে। তাঁর শ্রুতবসুণের চকল রাজনৈতিক জীবনের ধ্বীপাকে অনেক কিছু দেখা গাণিরে যার, যেমন "বসোরার উজীররা" লেখদত্তের অনুবাদ, ইত্যাদি। তাগাচক্রে এই নাটকটির পাণ্ডুলিপি আলিপুর বড়বস্ত্র বাবলার কাগজপত্র ও মলিন লজ্জা-বেজের মধ্যে পাওয়া যার প্রায় পকাশ বছর পরে। —সম্পাদক]

পাত্রপাত্রী

চাকর	অল্ বসী	খলিফ
জাফর		তাঁর উজীর বা বস্ত্রী
সেই ইব্রাহিম্		খলিপের উদ্যানসকক
মুন্সুর		চাকরের লখা ও বস্ত্র
জেইনির মহম্মদ-বিন-মুদেনান		চাকরের পিতৃ-পুত্র ও বসোবাব সুলতান্
আলফজ্জল ইবন সরা		ঐ প্রধান উজীর
নুরুদ্দীন		আলফজ্জলের পুত্র
আলমুরেন-বিন-খাকন্		বসোরার দ্বিতীয় উজীর
ফরীদ		ঐ পুত্র
মানার		আলজেইনির বিশ্বস্ত অনুচর
মুরাদ		বসোরা সহরের পুলিশ বাহিনীর তুলীকাপেন
আজীব		আলমুরেনের দ্রাতৃপুত্র
সন্সার		বসোরা প্রাসাদের মহানবুন্দী
আজিচ্ }		
আবদুল্লা }		বসোরার ব্যবসারীপথ

মুগ্ধভীষ	দানাল
আজিম	আলফজুলনের গৃহরক্ষক
হাবকুশ্	ইবনুসরীর বাড়িতে ইথিওপিয়ান খোজা
করীম	বাগদাদের বংশাবাবদারী
দাসগণ, সৈনিকগণ এবং খাতকের দল	
আবিনা	আলফজুলনের স্ত্রী
মুনিরা	ঐ খাতুশুত্রী
এনিক্-আলজাবিস	পারস্যদেশীয় বাঁদী
খাইন	আলমুঘেনের স্ত্রী, আবিনার ভগিনী
বালকিস্ }	
বীমুনা }	ভগিনীয়ে—আজিবেবের ক্রীতদাসী
ক্রীতদাসীগণ	

প্রথম অঙ্ক

বসোরা

প্রথম দৃশ্য

(প্রাসাদের অভ্যন্তর-সংলগ্ন একটি কক্ষ)

মুগ্ধ, হুন্জার

মুগ্ধ

আমি বলছি তোমার পোনো, মহানুভবী, আমি আর শত্রু করতে পারছি না, আমি যাবো বাগদাদের স্বেচ্ছানীতিতে, একঘণ্টার মধ্যেই জানিয়ে দিয়ে আসবো যে আমার প্রতি কী অনায় হুচে, সন্যাসের দীর্ঘ জালিকা পেশ করবো ছতুরের কাছে—তিনি বেছে নিল, হয় আবার—বিধাতার আপনার হাতে তৈয়ারী একজন বাঁটি বেহবান, না হয় গরিব আর আবুদানে বিশ্রু বংশধর ঐ পতনকে—বাকে তিনি উজীর বলে পরিচয় দিয়ে বেড়ান।

হুন্জার

মোহ, অন্যান্য তোমার এক্ষর প্রতি হরনি, সমস্ত বসোরা আর দরবারের আর্থে লোক জর অভ্যাসের অভিযোগ করছে।

বুড়ান

বুড়ান হাতে নিচের চিহ্ন আঁকা আর আলো ত বেটাচেই, আবার কি না ছেনোটাকে ডিলে
ডিলে দিচ্ছে উজিরে—যেন একটা বানরছানা আর একটা বুড়োগাড়ী হনুবান্ ।

তৃনজার

বেটা বাচ্চাধামপ্রতি কী কন পরডান্—তাকে ছুড়োর স্বকতলা নিয়ে সিধে করতে হয় ।
কিন্তু কার অডোটা বুকের পাটা আছে—তাই বুড়ান্ ডাই, বীরে বড় বীরে । বাসনার কাছে
বলে কিছু স্ত্রীরা হবে বলে মনে হয় না—তিনি সোখগুপের অতীত,—তিনি আবার তাঁর
কালোবাণিকের নিশা সচা করতে পারেন না । বরং বড় উজীরের আলফজ্জল ইবন
সরীর কাছে নালিশ ঠুকলে কেমন হয় ?

বুড়ান্

ঐতো একটা মানুষের মত মানুষ,—আদা আলফজ্জল সাহেব বড়ো গয়াল্, ঐর জনাই
বঙ্গোয়াকে এখনও স্বকতকে মনে হয় ।

তৃনজার

এ কথা আমি বিশ্বাস করি । ঐর ভিতরে এমন একটা প্রকৃতিসত্ত্ব সত্যতা আর
গাছীর আছে যে ঐর ছাতসারে কোনো মানুষ বা জ্যোতো ভিনিষকে উনি আখাত করতে
পারেন না । আবার কী মনে হয় জানো যে আসলে সত্যিকার প্রত্যেকটি ভালো লোক
ঠান্ডের মত, তার পিচনে আছে একটা জ্যোতির মণ্ডল, আর ঠাণ্ডা বেবেব মল কারো অঙ্ক-
কারের পর্বা দিয়ে বা ক্রুর প্রকৃতির আবছা আবছাওয়ায় সেটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করছে ।
আবছা ঘরন তাদের কাছে যাট তরন এটা বুঝতে পারি ।

(ইবন সরীর প্রবেশ)

ইবন সরীর

(স্বপত)

বাঁলীর দলের বন্দিনী ঐ তপ্ত শিখা তব্বীকে
ধরবে ওগো কিসের জীকে মনে মনে ওনহিঁ যে,
ধাকডো যদি নুরুলীটা বেরেধরার জ্যাডো ব্যাধ
নাগবানির পুরুতমশাই, স্বন্দরীদেব আতো কঁদ,

মন ভেঁজানো কাজেতেই সে হাতপাকানে চিরটা কাল,
 ডাবছি আমি অপরীকে কেনন করে পেখাই চান ।
 অনাগ্রত পুশ্চ নত বেবতোগে যে হবে বলি
 যতক্ষণ না যক্ষত তাকে প্রভুর কাছে ধরে তুলি ।
 হুঁকি মাখার নিতেই হবে, কতো কুতুহি হানবে নোকে
 কোথায় গেলো বদনাইসটা পানালো নাকি নিজের পোকে ।
 দশটি হাজার নগদ কিন্তু করকরে সোনার শীনার
 গুনে দিনে তবেই পাবে অভ্যাশ্চর্য দেহের বিনার ;
 সস্তা হয়তো বনবে তবে অদল টাকা এমনি যাবে
 শাহনশাহী কপাল ভালো, বিলি বধুর স্বষ্টি পাবে ।
 নন্ ত তাঁরা জনসাধারণ কড়ই কাছে সদাই নগন্
 কিছুটা তাই আরেগ্ নাগেন্, স্নানবীণের সেবা যতন ;
 নতানহিনের প্রতিভু ধারা—সেবভাষার নিভা প্রিয়—
 কঠিন বিচার তাঁদেরই সাধন, শাস্ত শাসন দুটি শ্রেয় ।

স্বন্দর

সেদান আলেকুন্ন সেবা উজীর সাহেব, পরন শক্তিবান আপনার নগল কচ্চন, তাঁর শাস্তি
 নানুক আপনার নাখার 'পরে ।

নুরাৎ

শাস্তি আলফজ্জল ইবন্ সরাী ।

ইবন্ সরাী

শাস্তি, শাস্তি, কিন্তু তুমি এখানে কেন কোতোয়াল ? নগরপাল তুমি, কাজ নেই ?

নুরাৎ

আপনি ত শুণ্ উজীর নন্, আমার অভ্যন্ত আপন, আমি উজীর আলনুয়েন সাহেবের
 বিরুদ্ধে আমারে মদান প্রভুর কাছে নালিশ করতে চাই ।

ইবন্ সরাী

বলি সব, কিন্তু গুড়ায়ডো করে কিছু করতে গেলেই বিরক্তনোচিত কাজ হয়না

আলনুয়েনের আছে একটি কালো হৈস্তার নতুন বিপজ্জনক বন। তবু তার ভিতর কিছু কিছু স্ফুণ্ড আছে—যবশ্য সেগুলো সে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত নিমেষে। শাল্য কাছে ওর নামে নানিশ করলে ঠকবে নুহাশ্। তিনি তোমাকেই বিচার করতে বলবেন, ওজন করবেন তোমার আঁজির সঙ্গে তার ওপাবলী এবং তারপর তোমার উপরই অন্যতর হয়ে উঠবেন বুধে কিছু না বললেও।

নুহাশ্

আপনি যা উপদেশ দেবেন।

ইবন্ সগী

ঠিক আছে, গাঁচা তুর্কীর বাচ্ছা তুমি সব ঠিক হয়ে যাবে, দাবড়িছো না।

হুন্সজার

এই যে তিনি

(আলনুয়েনের প্রবেশ)

নুহাশ্

ধাকনতনর, আপনায় পাতি হোক্।

আলনুয়েন্

কাপ্তেন সাহেব, এ সব কী ওনচি, তোমার শাসনব্যবস্থা পানায়, তোমার ভাবভঙ্গীও সুবিধের নয়—তুলো না তুমি তুর্কী, তোমায় চিনি।

নুহাশ্

আনি বনোয়া শাসন করি, সমস্তভাবেই করি, অন্ততঃ আপনি যেমন রাজ্য চালান্ তার চেয়ে ভালো।

আলনুয়েন

আরে, তুর্কীমানটা ও বেছার স্ববেচ্ছাধী। ডাকবে না কি বরকন্দাশের।

ইবন্ সন্নী

না, না, ভাই আলমুয়েন, অতো চটলে কেন ?

আলমুয়েন

ঐ লোকটা কৃশাগন করে ।

ইবন্ সন্নী

কেন, কি হয়েছে তুমি ?

আলমুয়েন

বলছি, তুমি—কদিন আগে একসল ঠাণ্ডা আবার ছোট পাশ গোবেচারী ফরিসকে লাঠিসোটা দিয়ে বিনাকারণে বেঘন প্রহার দিলে । এই লোকটার গুহাখেকো পুনিশের দল, ওরই প্ররোচনায় কিছু ত করলেইনা, বরং যখন পূর্ণতরা ধরা পড়লো, তখন তাদের বিখ্যা কথায় বিশ্বাস কবে কাজীর কাছে হাছির করিয়ে দিলে আর কাজীও তেননি, একটি আশ্র বোকা ।

নুরাদ

আমাদের উজীরসাহেবের পুত্রটি একটি স্বয় বিশেষ । সারা সহর একথা জানে, যেমন বিকলাস চেহারা, তেননি ক্রুর নন । এমন খারাপ কাজ নেই এই নাগবকটি করেন না—সবস্ত্র সহরটা তাঁর নাগপেট অধির, জোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন সারাদিন পিতৃমেঘের প্রচণ্ড নানমহিনায় । যাহা তার পায়ে হাত ঘের তামা অন্যায় ত করেই না বরং অসহায় লোকদের রক্ষার ভার নিয়েছে তামা ।

আলমুয়েন

আনি তোমার চিনি, তুর্কী—

ইবন্ সন্নী

শোনো, শোনো, উত্তেজিত হবো না, বড়ভায়ের মতই বলছি আনি—নুরাদের কথা সত্যি । তোমার ফকীন্ তোমার কাছে কথা কর, মার দেয় যেন স্বয়ং সেবদুত এসে ধাঁড়িয়েছেন, আর বাইরে একেবারে আবাশরতানের প্রশয়বর্ধন । না, না উজীর ভাই, আমাদের এলাকার

কোন সহরে এ সব ঘটতে দেওয়া চলে না, অন্যত্র যাই হোক—বিশেষ করে বঙ্গোপসাগর। এটা সংস্কৃতির পাঠ্যস্থান, নাজিত রচিত দেশ। এ অভ্যাস বদলাতেই হবে।

আলমুয়েন

দাদা, জোবার নুরুদ্দীনের হালচালটা কিরকম? সেও কী একেবারে নির্দোষ—এসব বিষয়ে তারও খ্যাতি আছে শুনেছি।

ইবন্ সন্নী

হ্যাঁ, মুকুলিত যৌবনের প্রথম উদ্দাম প্রথমপর্বে মুগ্ধ সে—হরতো আত্মহারা। কিন্তু তার গতি ক্ষুরধার, তেজী ঝোড়ার মত। বনুগা দিলে তাকে সংযত রাখতে হয়, তবেই সে দুশুঁকি চলে চলেবে। তাড়াঝাড় তার ভিতর আছে একটা বলিষ্ঠ উপারতা। আমি ভারী খুশী হব যদি তোমার ফরীৎরুশী অশ্রুটি তার জৈববহতা কাটিয়ে উঠতে পারে—তাহলেই তো খাঁটি সোনা হয়ে যাবে।

আলমুয়েন

সে যা ভাই থাক্ কিন্তু সে নরীপুত্র এ কথাটা যেন মনে থাকে ঐ তুর্কীমানুখটার।

ইবন্ সন্নী

থাক্, থাক্, ও সব থাকে কথা থাক্। রাজা নাথার উপর আছেন তাঁর নীচে আনরা সবাই নবান। এই আনাদের শাহনবানর রীতি।

আলমুয়েন

আচ্ছা ভাই তুরকের মানুষ, তোমার কথা করলাম।

নুরাহ্

কহা—আচ্ছা, বহীনশাহদের সেলান্, শান্তি হোক—আমান্।

ইবন্ সন্নী

বাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে আসছি।

আলনুয়েন্

তুকাঁভাই, সেনান্ আলেকুন।

ইবন্ সরী

সেনান্ ভাই সেনান, দেখো ভাই, নজর রেখো।

(দুহাদের সহিত প্রস্থান)

আলনুয়েন্

ভাই, শান্তি, আদাব। এক বুসিতে ঐ নাক আর কান বুঝিয়ে দিতে পারি, স্বাত্ত্বপুনে ভগবৎ হয়ে তোনার ঐ নখমান লাড়িকিকে গোটা দুই মিষ্ট চান দিলে কেমন লাগে ? তব্বকখা শোনাচ্ছেন। ঈশ্বর যদি দিন মেন তবে একদিন চাবুকের তলায় বজ্রুজা করবো—সপানপু—
আর গলা ফাটিয়ে কাতা উপদেশ দেবে দিয়ে, যে সব কথা কেউ শোনেনি।

(সুনজারকে দেখে)

আরে এটা কে—তুনি ক বটরে—চপ্তচর, লুকিয়ে গুনছো সব এবং বড়কর্তার কানে লাগিয়ে বকুনী খাওয়াবে—আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার কথা মনে থাকবে।

সুনজার

না, চকুর বিশ্বাস করুন, আমার কোন বদনতলব নেই। আপনায় শাসানুশাস আমি।

আলনুয়েন্

কুত্জা, তোকে তিনি আমি—আমি পৃষ্ঠপুদর্শন করলেই তুই চোঁচাবি আর সামনে ভক্তি-
শ্রাবী পদলেচন, যা, যা, মনে থাকবে আমার (প্রস্থান)

সুনজার

ঐ যায় স্বাক্ষরপুত্র আলনুয়েন্। কুত্জা বলে আনাকে, নিজে যে তিনপুরুষ সারবৈষ্ণ-
বংশীয় তা জানে না। তোমার জন্ম হয়েছে গোবরের জুপে, নৃত্য ও অবধারিত সেইখানে।
(প্রস্থান)

[ক্রমশ]

দ্বিতীয়া

মিশিকান্ত

কালান্তরংপ্রাপ্তবুঝে সমাচরণু ভগৎ-অম্বরে,
ভগদ্বাত্রী। দিলে হুক্তি বৈভবস্ত্রী, দ্বিতীয়ার শশা :
অটলঅমূল্যবিন্দু ভব বহু-মুকুটিন-করে
অসীমঈশ্বর দীর্ঘ করি অতিদীর্ঘ জ্যোতির্বিম্ব অসি :

ভীষণ-তিবিকান্তর সে-আঘাতে আগে ভগদ্বন !
কীণচন্দ্রকলাবিন্দু তনু তার প্রনয়-প্রস্থানে
ধন্যে চলদমাল সেই তুচ্ছজ্যোতির অকর
নিশ্চিহ্ন করিতে চায়, অধিনের অদৃষ্ট-আকাশে

আপনার অধিকার নির্বাধ রাখিতে : তার বাধা
আপাত পৃষ্ঠিতে, তার কাছে কৃত্তবহিবিশুবৎ,
সে যে আলোকবিস্তোহী, অবিশ্রান্ত-অচ্ছতায় সাধা
শক্তি তার অছকারশিদ্ধ সব, সবগ্ন ভগৎ

প্রাসিয়াছে। তবু বনি, ঈশ্বরবিভববৈভবস্ত্রীবাণী
'হুক্তিদ্বিতীয়ার চক্রে হুক্তির পূর্ণিমা দিবে আনি'।

With Compliments of : —



INTER PROVINCIAL TRANSPORT Co.,
57, Radhabazar Street,
CALCUTTA—1.

(GARAGE : 41/9, Russa Road, CALCUTTA-33).

GARAGE PHONE :
46-1412.

OFFICE PHONE:
22-4972.

অব্যাহত গতি



একদা মহাবি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করি
ইহাৎ লিপিবদ্ধ করিবার জন্ম একজন লেখক
স্বয়ং করিতেছিলেন। কিন্তু কেহই এই
দারিত্র গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে
নারদী-তরঙ্গ গগন এই সাত রাজি হইলেন
ঈশ লেখকী মুহূর্ত্তর জন্যও ছাড়িলেন না।

আধুনিক যুগের লেখকরাও চান যে তাঁ
লেখার পতি কোনক্রমেই
ব্যাহত না হয়। আর এই
অব্যাহত গতির জন্যই
সুলেখা অর্থাৎ এত জরুরি



সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ, কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • লাহোর

With best compliments of
Russa Road Service Station

Authorised service agents for
Ambassador, Bedford, Chevrolet

Distributors :
Esso Standard Eastern Inc.

4/2 & 5 Russa Road, Calcutta-25
47-3467

শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্তের
★ কবির্মনাষী
★ রবীন্দ্রনাথ
(রবীন্দ্র শতবার্ষিকী স্মারক)

★
শ্রীমৎ অনিবার্ণের
দিব্যজীবন প্রসঙ্গ

শ্রী অরবিন্দ পাঠশালার—১২ বঙ্কিম চ্যাট্টো স্ট্রিট, কলিকাতা-১১
শ্রী অরবিন্দ আশ্রম—পলিগেট

It's *Spencer's*



at home or in a party this invigorating
and refreshing drink is sheer delight.

SPENCER AERATED WATER FACTORY PRIVATE LTD.
CALCUTTA-14



For your Electrical Services

CONSULT

FARADAY ELECTRICALS

79, DHARAMTALA STREET

Show Room: 9, Lower Circular Road

CALCUTTA-16.

PHONE-24-2012.



সরিষার তৈল



১, ২, ৪ ও ১৬০ কে. জি. টিন
এবং ৪০ কে. জি. কেটল বরা
ড্রামে পাওয়া যায়।

এখন চুইতে ৫০০ গ্রাম লাল
ককি বোতলও পাওয়া যায়।

গণেশ সরিষার তৈল

প্রাগ অয়েল মিলস · আলীগড়।

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বহুিক

1962

ঈশ্বরবিন্দেৰ আনন্দ এ বর্নন বিখরক ত্রৈমাসিক পত্রिका

श्रीअरविन्द मन्दिर प्रकाशना

बनकरुत ए साहाजिक अतिथिक	श्रीअरविन्द	१००
श्रीअरविन्देर् बोध ए अर्थनाम संग्रह	श्रीअरविन्द	१०
कविमन्त्रिका	श्रीअरविन्द	१००
रत्नप्रकाश (रत्नप्रकाशिका उपलब्ध)	श्रीअरविन्द	१००
सामान्य जीवन	श्रीअरविन्द	१०

: श्रीअरविन्द :

: श्रीमा :

विभिन्न रचना

उत्तम रचना

मूल बांग्लादेश लेख पुस्तकन बाङ्गलादेश

[एकत्रित नाटिका]

हृदयक संग्रहीत ए अर्थन मुद्रित

राजनीतिज्ञ, लेखक, चित्रकार, वैज्ञानिक,

मुद्रा १०

बाबसाही ए बाबासाही च'ननेर हृदय

भारतके नवजन्म

१००

आन्ध-काठिनी ए तार उपलब्ध

कविबोधि

१००

मुद्रा १०

भारतके नवजन्म

१०

भारतके नवजन्म

१००

भारतके नवजन्म

१०

भारतके नवजन्म

१००

भारतके नवजन्म

१०

भारतके नवजन्म

१००

भारतके नवजन्म

१०

भारतके नवजन्म

१००

विभा-जीवन (३३ वक्रे लम्बा) १० वक्रे १० ; २३ वक्रे १०

1. Loving Homage

Rs. 10/-

2. The Golden Book of The Mother

100/- (De Luxe Edn.)

60/- (Ord. Edn.)